মুখবন্ধ

এপ্রিল ১৯৪৯। প্যারিসের প্রকাণ্ড প্লেয়েল হলঘর। শান্তি সংরক্ষকদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমস্ত দেশের পতাকা দিয়ে মঞ্চ আচ্ছাদিত। প্রত্যেক পতাকার পেছনে রয়েছে দেশ ও জাতিসমূহ, মানুষের আশা ভরসা ও ভাগ্য।

আমাদের দেশের লাল পতাকাও রয়েছে—কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের দেশ। হাতুড়ি কাস্তে আঁকা,—শান্তিপূর্ণ শ্রমের প্রতীক এ চিহ্ন,—যারা খাটে, গড়ে, সৃষ্টি করে তাদেরই স্থায়ী ঐক্যের চিহ্ন। কতো অসংখ্য চোখ আজ তাকিয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে, কতো অসংখ্য হৃদয় আজ একান্ত আস্থা নিয়ে উন্মুখ হয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে—মেহনতী দুনিয়ার আশা ও ভরসার স্থল এই সোভিয়েত ইউনিয়ন।

কংগ্রেসের অন্যান্য সভ্যদের অনির্বাণ ভালোবাসার পরিচয় আমরা, সোভিয়েতের প্রতিনিধিদল, সব সময়ই অনুভব করেছি। কতো আন্তরিকতা নিয়ে, কতো আনন্দ নিয়েই না তাঁরা সাক্ষাৎ করেছেন আমাদের সঙ্গে, স্বাগত জানিয়েছেন আমাদের! প্রত্যেকটি দৃষ্টি, প্রত্যেকটি করমর্দন যেন মুখর হয়ে উঠেছে এই বলে ঃ "তোমাদের আমরা বিশ্বাস করি। তোমাদের ওপর আমরা ভরসা রাখছি। তোমরা যা করেছ তা আমরা কখনো ভুলব না।"

দুনিয়াটা কী বিরাট! এই প্রকাণ্ড হলঘরটায় বসে যখন তাকিয়ে দেখি অসংখ্য শ্বেত, পীত, বাদামী রঙের মুখ, যখন দেখি দুগ্ধ-ধবল থেকে শুরু করে নিকষ-কালো সমস্ত রকম মুখই জড়ো হয়েছে এখানে, তখন আর কিছুতেই না ভেবে পারা যায় না যে দুনিয়াটা কতো বড়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি কোণ থেকে দু হাজার নরনারী সমবেত হয়েছেন এখানে শান্তির সপক্ষে কথা বলবার জন্য, গণতন্ত্র ও সুখের সপক্ষে কথা বলবার জন্য।

হলঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। অনেক নারীও আছেন। ঐকান্তিক মনযোগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁদের মুখ। অবাক হবার তো কিছু নেই,—শান্তির আহ্বান এসেছে আজ পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে আর এই আহ্বানের মধ্যেই নিহিত আছে প্রতিটি বধূ, প্রতিটি মায়ের আশাভরসা।

ফ্যাসিজমকে পরাস্ত করবার জন্য জীবন বলি দেবার কতো কাহিনীই না শুনেছি ; অন্ধকারের ওপর আলোর জয়ে, হীনতার ওপর মহত্বের জয়ে অমানুষিকতার ওপর মনুষ্যত্বের জয়ে বিগত যুদ্ধের সফল পরিণতি ঘটুক এই কামনা করে কতো প্রাণ বিসর্জনের কাহিনীই না শুনেছি!

আমাদের সন্তানদের এই রক্তপাত ব্যথা হতে পারে না। আমাদের সন্তানদের রক্ত, আর আমাদের বিধবা-অনাথ-মায়েদের চোখের জলের মূল্য দিয়ে যে শান্তি আমরা অর্জন করেছি তা কখনো অন্যায়ের ঘৃণ্য শক্তি দ্বারা ধ্বংস হতে পারে না।

আমাদের প্রতিনিধি, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আলেক্সি মারেসিয়েভ, মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিপুল হর্ষধ্বনি অভিনন্দিত করছে তাকে। সমবেত সকলের কাছেই আজ আলেক্সি মারেসিয়েভ সোভিয়েত জনগণের জীবন্ত

প্রতিমূর্তি, তাদের সাহস ও সংকল্প, নিঃস্বার্থ শৌর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। সবাই আজ অনুভব করছে যে তাঁর বীরত্বের কাজ সোভিয়েত জনগণেরই মহৎ গুণের প্রকাশমাত্র, যে সোভিয়েত জনগণ একদিন পৃথিবী ও সভ্যতাকে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

আলেক্সি মারেসিয়েভের গলা গম্‌গম্‌ করে উঠছে হলঘরটার মধ্যে ঃ "আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজেকে প্রশ্ন করা—'শান্তির সপক্ষে আমি কী করছি?' আজকের দিনে শান্তির জন্য সংগ্রামের চেয়ে মহত্তর, সম্মানজনক, ও বিরাট কাজ আর কিছুই নেই। প্রত্যেকের কর্তব্য এই কাজ সম্পাদন করা।"

ওঁর কথা শুনে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি ঃ শান্তির জন্য আমি আজ কি করতে পারি? জবাবও পাই আমার মনের থেকেই ঃ হ্যাঁ আমিও আমার যথা-যোগ্য অংশ নিতে পারি। আমি আমার ছেলেমেয়েদের কাহিনী শোনাব। হ্যাঁ, আমার সন্তানরা তো জন্মেছিল সুখ, আনন্দ আর শান্তিপূর্ণ শ্রমের জন্যই, ওরা তো ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিল, জনগণের স্বাধীনতা, মুক্তি আর সুখের জন্যই জীবন দিয়েছিল ওরা। হ্যাঁ আমি ওদের কথাই বলব.....

জয়া কসমোদেমিয়ানস্কায়া
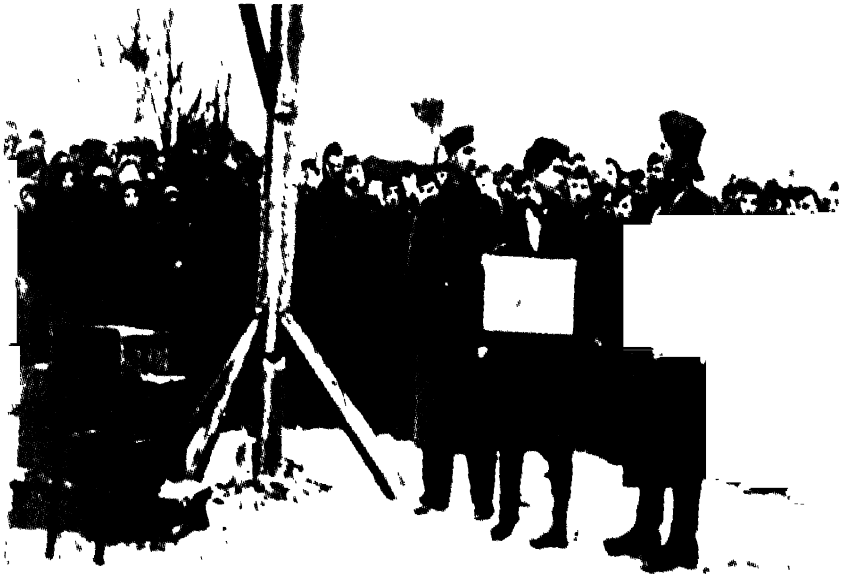
ফ্যাসিস্ট জল্লাদরা জয়াকে ফাঁসীর মঞ্চের নীচে এনে দাড় করিয়েছে

(জনৈক নাৎসী বন্দীর কাছে থেকে উদ্ধার করা ফটোগ্রাফ)

কান্নার পরে

আস্পেন বন

তামবোভ্ অঞ্চলের উত্তরে একটা গ্রাম, তার নাম "ওসিনোভিয়েগায়"—যে কথাটার মানে হলো আস্পেন বন। বুড়োবুড়িরা বলে, অনেক অনেক আগে নাকি ওখানে গভীর জংগল ছিল। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি চারদিকে মাইলের পর মাইল ধরে বনের চিহ্নমাত্র ছিল না। তার বদলে যতদূর চোখ যায়, খালি রাই, যব আর জনারের ক্ষেত। গাঁয়ের পাশের জমিটা নালায় ফালি ফালি হয়ে ছিল। প্রত্যেক বছর নালাগুলো চওড়ায় বড় হতো এবং সংখ্যায়ও বেড়ে যেত, আর মনে হতো গাঁয়ের সীমানার বাড়িগুলি যেন নালার উঁচুনীচু খাড়া পাড় বেয়ে এখনই পড়ে যাবে নীচে। শীতকালে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের হতে ভয় করত আমার, সবকিছু জমাট ঠাণ্ডা আর চুপচাপ ; চারদিকে কেবল তুষার আর তুষার ; অনেকদূরে নেকড়ের ডাক, সত্যিও হতে পারে অথবা মনের ভুল।

কিন্তু বসন্তকালে কী আশ্চর্যভাবেই না গ্রামের চেহারা বদলে যেত। ফুলভরা মাঠগুলো কোমল, ঝলমলে, সবুজে মোড়া ; চারদিকে টকটকে লাল নীল সোনালী ফুল ঝকমক করছে, দু'হাত ভরে যতো খুশি ডেইজী, কর্নফ্লাওয়ার, আর ব্লুবেল বাড়ি নিয়ে আসা যায়।

আমাদের গ্রামটা ছিল বেশ বড়, হাজার পাঁচেকের মতো বাসিন্দা ছিল তাতে। একফালি জমি থেকে তো আর গরিব চাষী পরিবারের খাওয়া চলে না, তাই প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কেউ না কেউ উপায়ের চেষ্টায় চলে যেত বিদেশে, তামবোভ্, পেন্‌সা কিংবা মস্কোতে।

আমি জন্মেছিলাম বেশ বড় এক সহৃদয় পরিবারে। আমার বাবা তিমোফি সেমিওনোভিচ্ চুরিকভ ছিলেন একজন গ্রাম্য কেরানি। তেমন কিছু বাঁধাধরা লেখাপড়া তাঁর হয় নি, কিন্তু তাঁর লেখার হাত ছিল, আর পড়াশোনাও ছিল বেশ। বই ভালোবাসতেন তিনি, যে সব বই তিনি পড়েছিলেন তার থেকে উদাহরণ দিতেন সর্বদাই কোন কিছুর আলোচনায়। তিনি বলতেন "তবে আমি একখানা বই পড়েছিলাম যাতে গ্রহ-নক্ষত্রদের বিষয়ে অন্য ধরনে আলোচনা করা হয়েছে।"

তিনবছর গ্রামের স্কুলে যাবার পর ১৯১০ সালের হেমন্তকালে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ছোট্ট কিরসানভ শহরের মেয়েদের হাইস্কুলে। তারপর যদিও চল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে তবু আমার এত পরিষ্কার মনে আছে যে মনে হয় কালই এগুলো ঘটেছিল।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম দোতলা বাড়িটার দিকে। আমাদের দেশের আস্পেন বনের সংগে এর কোথাও মিল নেই। বাবার হাতখানা বেশ শক্ত করে চেপে ধরে এগিয়ে গেলাম হলঘরে, তারপর কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে থেমে গেলাম। সব কিছুই এত অদ্ভুত আর অপরিচিত লাগছিল। বিরাট দরজা, পাথরের মেঝে, চওড়া লোহার রেলিং-দেওয়া সিঁড়ি। অনেক মেয়ে তাদের মা-বাবার সংগে

পড়তে এসেছিল, তাদের জন্যই আমি সবচেয়ে বেশি হতভম্ব হয়েছিলাম, চার-দিকের ঝকমকে সাজানো ভাব দেখেও আমি এত ঘাবড়ে যাই নি। কিরসানভ হলো মফস্বলের ব্যবসাদারদের শহর, কাজেই আমার মতো কৃষক-পরিবারের আর কোন ছেলে-মেয়েই হয়ত পরীক্ষা দিতে আসে নি। একটি মেয়ের কথা বেশ মনে আছে। সত্যিকারের ব্যবসাদারের মেয়ের মতোই দেখতে, গোলগাল, লাল টুকটুকে, বেণীতে গাঢ় লাল রঙ-এর সিল্কের ফিতে বাঁধা, আমার দিকে কেমন তাচ্ছিল্য করে তাকালো, একবার ঠোঁট উল্টিয়ে চলে গেল। আমি বাবাকে আরও জোরে চেপে ধরলাম, তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন "লজ্জা করিস নি মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে আমাদের ওরা সবাই ডেকে নিয়ে গেল একটা বড় ঘরে, সেখানে একটা টেবিলের পিছনে তিনজন পরীক্ষক বসে-ছিলেন। আমার মনে পড়ছে, আমি সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, আর তার-পর ভয় ভেঙে গেলে আমি পুশকিন-এর "দি ব্রোঞ্জ হর্সম্যান" থেকে খানিকটা আবৃত্তি করলাম।

বাবা আমার জন্য নিচের তলায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি তো আনন্দে ডগমগ হয়ে ছুটে ওর কাছে গেলাম, তিনিও খুশিতে উজ্জ্বল-মুখে লাফিয়ে উঠে আমাকে কোলে নিলেন।

এমনি করে আমার ছাত্রীজীবন শুরু হলো। সেইসব দিনগুলোর কথা মনে করলে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। আর্কাদি আনিসিমোভিচ বেলুসভ-এর কাছ থেকে আমরা অঙ্ক শিখতাম, তিনি খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বিষয়টায় আমাদের উৎসাহ জাগাতেন। আর তাঁর স্ত্রী এলিজাবেতা আফানাসিয়েভ্না শেখাতেন রুশভাষা আর সাহিত্য।

সবসময় হাসিমুখে তিনি ক্লাসে আসতেন, সেই হাসি সকলের মন জয় না করে ছাড়তো না, এত সুন্দর, তরুণ প্রাণভরা ছিল সে-হাসি। এলিজাবেতা আফানাসিয়েভনা টেবিলে বসে আমাদের দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েই ভূমিকা না করেই আরম্ভ করে দিতেন—

অরণ্য খসিয়ে ফেলছে তার বেগুনী পরিচ্ছদ...

সারাজীবন ধরে তার আবৃত্তি আমরা শুনে যেতে পারতাম। গল্প বলার তাঁর একটি বিশেষ ধরন ছিল, নিজের কথা আর সে-কথার মাধুর্যে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। রুশসাহিত্যের মর্মবাণী, তার শব্দসম্পদ, ভাবধারা আর প্রেরণা আমাদের কাছে মেলে ধরবার কৌশল তিনি জানতেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হতো পড়ানোর কাজটা একটা মহান আর্ট। সত্যিকারের ভালো শিক্ষক হতে হলে চাই দরদী হৃদয়, স্বচ্ছ মন আর শিশুর জন্য ভালোবাসা। এলিজাবেতা আফানাসিয়েভ্না আমাদের খুবই ভালোবাসতেন। তিনি আমাদের কখনও বলেন নি, কিন্তু তিনি যখন আমাদের দিকে তাকাতেন, সংযত স্নেহে তিনি যখন কোনো ছাত্রীর কাঁধে হাত রাখতেন, আমরা কেউ অকৃতকার্য হলে তিনি যেরকম করে দুঃখ করতেন—তাতেই আমরা আমাদের জন্য তার ভালোবাসা অনুভব করতাম। আর আমরা তাঁর তারুণ্য, তাঁর সুন্দর ভাবগম্ভীর মুখশ্রী, তাঁর খোলাখুলি ব্যবহার আর কর্মনিষ্ঠা সবই ভালোবাসতাম। অনেক পরে আমার নিজের সন্তান মানুষ করার সময় আমার প্রিয় শিক্ষয়িত্রীর কথা

খুব মনে পড়ত, কোনো মুস্কিলের সময় তিনি কিরকম পরামর্শ দিতেন, কি বলতেন এ-সব ভাবতাম।

আরও এক কারণে কিরসানভ স্কুলের কথা মনে পড়ে। আমাদের ড্রয়িং শিক্ষয়িত্রী বুঝতে পারলেন যে আমার আঁকার হাত আছে। আঁকতে আমি খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু আমি আর্টিস্ট হতে চাই একথা নিজের কাছে স্বীকার করতেও আমার ভয় করতো। সার্জি সেমিওনাভিচ্ পোমাৎসভ একদিন আমাকে বললেন—তোমাকে শিখতেই হবে—এর আর কিন্তু নেই...তোমার বেশ ক্ষমতা আছে...

এলিজাবেতা আফানাসিয়েভ্‌নার মতো তিনিও তাঁর পড়ানোর বিষয় খুব ভালোবাসতেন. তাঁর কাছে আমরা কেবল রঙ আঁকজোক আর মাত্রা হিসাব করতেই শিখি নি। আর্ট-এর যা মূলমন্ত্র, প্রাণ, কি করে মানুষ জীবনকে ভালোবাসতে পারে, কি করে সর্বত্রই এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়, জীবনের প্রতি-ক্ষেত্রেই শিল্পের সম্ভাবনা যে দেখা দিতে পারে তাও আমরা তাঁর কাছেই শিখি। সার্জি সেমিওনোভিচই প্রথম আমাদের বাস্তববাদী শিল্পী রেপিন, সুরীকভ আর লেভিতান-এর অপূর্ব শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাঁর ছবির সংগ্রহে অনেক ছবির অনুকৃতি ছিল, সেগুলো দেখেই আমার মনে আর একটা আশা কুঁড়ি মেলতে থাকে, জীবনে একবার মস্কো গিয়ে ত্রেতিয়াকভ পিকচার গ্যালারি দেখবো।

হাইস্কুল শেষ করে আমার আরও পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের আয় তেমন না থাকায় তা আর সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে বাবার সাহায্যের জন্য স্কুলের পড়া শেষ করে আমি আস্পেন বন-এ ফিরে এলাম।

নতুন জীবন

কিরসানভ-এ থাকতে থাকতেই আমি অক্টোবর বিপ্লবের খবর পেয়েছিলাম। স্বীকার করছি তখন ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। শুধু মনে আছে আমাদের সবারই বেশ আনন্দ হয়েছিল, সবাই ছুটির দিনটাকে বেশ উপভোগ করলাম। গোটা শহরটা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল, হাওয়াতে লাল নিশানগুলো উড়তে লাগল। সাধারণ মানুষ, সৈন্য, মজুর সবাই মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে লাগল। দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত নূতন নূতন কথা—বলশেভিক পার্টি, সোভিয়েত, কমিউনিজম, ইত্যাদি শোনা যেতে লাগল।

আমাদের গাঁয়ে যখন ফিরে এলাম, আমার ছেলেবেলার বন্ধু আর সাথী আমার দাদা সার্জি এসে বললো—লিউবা, এক আশ্চর্য নূতন জীবন শুরু হচ্ছে ; আমি লালফৌজে যোগ দিতে যাচ্ছি, এসময় এরকম চুপ করে বসে থাকা যায় না।

সার্জি তো আমার চেয়ে মোটে দু'বছরের বড়ো, কিন্তু জ্ঞানে আমি তার কাছে শিশুমাত্র। কি হচ্ছে না হচ্ছে তার সম্বন্ধে ওর ধারণা ছিল অনেক বেশি। আমার মনে হলো ও যে স্থির সংকল্প নিয়েছে তার আর নড়চড় হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা সার্জি আমি কি করবো ?"

দাদা একমুহূর্তও না ভেবে বলল—"কেন লেখাপড়া শেখানোর কাজে লেগে যা। এখন তো ব্যাঙের ছাতার মতো যেখানে সেখানে স্কুল গজিয়ে উঠবে। তুই কি ভেবেছিস আমাদের এই আস্পেন বনের পাঁচ হাজার বাসিন্দার জন্য এখন দুটো স্কুলেই চলবে? লোকে আর না পড়ে থাকতে চাইবে?"

আমার আসার দু'দিন পরই দাদা লালফৌজে চলে গেল, আমিও আর কালবিলম্ব না করে গণশিক্ষাবিভাগে এসে হাজির হলাম কাজের সন্ধানে। তক্ষুনি সোলোভিয়েংকা গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষিকা হিসাবে আমি কাজে নিযুক্ত হয়ে গেলাম।

আস্পেন বন থেকে তিন রশি দূরেই হলো সোলোভিয়েংকা গ্রাম। খুব নোংরা আর কুশ্রী, খড়োঘরের অঞ্চল সেটা। তবে স্কুলবাড়িটা দেখে কিছু সান্ত্বনা পেলাম। গ্রামের একপাশে এককালের জমিদারবাড়ি ঘনগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতাগুলো হলদে হয়ে গিয়েছে, তবুও দূর থেকে স্কুল-বাড়ির জানলার উপর ঝুলে-পড়া আমলকিগাছের ডালগুলো হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছিল। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাড়িটায় বেশ জায়গা ছিল আর বেশ ভালো অবস্থায় ছিল। একটা রান্নাঘর, দালান, আর দুটো ঘর। তার মধ্যে লোহার খড়খড়িওয়ালা ছোটটা হলো আমার। আসবার সময় আমি সংগে করে নোটবই, প্রথমভাগ, খাতা, পেন্সিল, কলম, নিব সবই এনেছিলাম, সেগুলো টেবিলের উপর রেখে গ্রামের স্কুলে পড়ার যোগ্য ছেলেমেয়েদের নামধামগুলো জোগাড় করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

এক এক করে সবগুলো বাড়িতে গিয়েই খোঁজ নিলাম। আমার আসার উদ্দেশ্য যখন জানতে পারল, তখন গ্রামবাসীরা সবাই বেশ আগ্রহের সংগে এগিয়ে এলো।

লম্বা রোগা এক বুড়ি ভুরুগুলো এত মোটা যে মনে হয় রাগে কুঁচকে আছে। এগিয়ে এসে আমাকে বললো—"তুমি তাহলে মাস্টারনী? বেশ, বেশ—শিখিয়ে যাও, কিন্তু মেয়েগুলোর নাম লিখে সময় নষ্ট করছ কি জন্যে? খালি সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু হবে না, খাবে দাবে, তাঁত বুনবে, সুতো কাটবে, তারপর বিয়ে হবে ওদের—লেখাপড়া শেখার দরকারটা কি?"

আমি কিন্তু বেশ শক্ত হয়ে রইলাম। আমার দাদা সার্জির কথাগুলো আউড়ে বললাম—"আগেকার দিনকাল আর নেই। একেবারে নূতন জীবন শুরু হচ্ছে—সবাইকেই পড়াশোনা করতে হবে।"

পরের দিন ক্লাসঘরে আর তিল ধরবার জায়গা নেই—আগের দিন যে তিরিশটা ছেলেমেয়ের নাম লিখে এনেছিলাম তারা সবাই এসেছে।

জানালার পাশে সবার পেছনের সারিতে বসেছিল শিশুরা, মাঝের সারিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীরা, দেয়ালের পাশে ছিল সবার বড়োরা—চৌদ্দ বছরের ওরা, মোটে ওরা চারজন। আমার সামনে বেঞ্চে বসেছিল দুটি ছোট মেয়ে, সোনালী চুল, নীল চোখ, গায়ে তিলের মতন দাগ, একই রকমের জামা, ওরা হলো সবার থেকে ছোট, নাম ওদের লীদা আর মারুসিয়া গ্লেবোভা। দেয়ালের ধারের চারটি ছেলে দাঁড়িয়ে আমাকে নমস্কার করতেই অন্যরাও দাঁড়াল "নমস্কার লিউবোভ তিমোফিয়েভ্না, সোলোভিয়েংকায় স্বাগত!"—ওদের সমবেত গলার সুর শোনা গেল।

আমি বললাম—"নমস্কার, ধন্যবাদ।"

এমনি করে আমার প্রথমদিনের পড়ানো শুরু হলো। এমনি করে দিনও কেটে যেতে লাগল। তিনটি ক্লাস একসঙ্গে চালানো আমার পক্ষে বেশ কষ্টের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। বাচ্চারা পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে শিখত, বড়রা করতো অংক, আমি তখন মাঝারিদের বলতাম কি করে, কেন দিনরাত হয়। তারপর ওদের ব্যাকরণ লিখতে দিয়ে বড়োদের অংকগুলো মিলিয়ে দেখতাম। এর মধ্যে আবার বাচ্চারা দাগ বুলিয়ে বুলিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কাজেই ওদের দিকে চাইবার সময় হতো, ওরা প্রাণপণে চেঁচিয়ে শব্দগুলো বানান করে করে পড়তে আরম্ভ করতো।

কাজের মধ্যে আমি একেবারে ডুবে গেলাম, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকতে আমার বেশ আনন্দ আর তৃপ্তি হতো। দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। পাশের গ্রাম থেকে একজন শিক্ষক কয়েকবার আমার স্কুলে এসেছিলেন। আমার তখনকার জ্ঞানবুদ্ধিমতো তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিরাট। তিন বছরের অভিজ্ঞতা, বাপরে! তিনি আমার পড়ানোর সময়ে বসে শুনতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন আর যাবার সময় বলে যেতেন, "বেশ ভালো চলছে। আর তাছাড়া সব-চেয়ে বড় কথা বাচ্চারা আপনাকে বেশ পছন্দ করে।"

প্রত্যাগমন

একটার্ম ধরে আমি সোলোভিয়েৎকা স্কুলে পড়ালাম, নূতন বছরে আস্পেন বনে আমাকে বদলী করা হলো। ওখানকার বাচ্চাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলে ছাড়তে কষ্ট হলেও আস্পেন বনে এসে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। আবার বাড়িতে, নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরে আসতে বেশ ভালোই লাগলো।

এবার আস্পেন বন-এ ফিরে এসে তোলিয়া কসমোদেমিয়ানস্কি নামে আমার ছেলেবেলার খেলার সাথীর সঙ্গে দেখা হলো। ও আমার সমবয়সী হলেও বুদ্ধিতে আমার থেকে অনেক বড়। আমার তো ওর তুলনায় সাংসারিক জ্ঞান আর ভারিক্কী ভাব অনেক কম। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ এক বছর লাল-ফৌজে কাজ করে এখন আস্পেন বনের লাইব্রেরী আর পাঠাগারের ভার পেয়েছে।

লাইব্রেরিঘরে অভিনয়ের রিহার্সাল দিতে সবাই জড়ো হতো। অস্ত্রভ্স্কির নাটক "দারিদ্র্য পাপ নয়" অভিনয় করার জন্য এ গাঁ আর পাশের গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা আর মাস্টাররা জড়ো হতো। আমি সাজলাম লিওবোভ গর্দেইয়েভনা— আর আনাতোলি পেত্রোভিচ্ হলো লির্উবিম তর্ত্সব। ও ছিল আমাদের দলপতি আর ম্যানেজার. সবকিছু ভারী সুন্দর করে আর উৎসাহ নিয়ে ও বুঝিয়ে দিতো। কেউ যদি তার পার্ট গুলিয়ে ফেলতো বা হঠাৎ ভাবের উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চোখ ঘুরিয়ে অভিনয় করতো আনাতোলি পেত্রোভিচ্ রাগ না করে এমন মজার সঙ্গে তার অনুকরণ করতো যে বেচারী অভিনেতার মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বাগাড়ম্বর করার রোগ সেরে যেতো। ওর উচ্চহাসি ছিল

প্রাণখোলা, আর কারোকে এমন সরল আর সুখের হাসি হাসতে আমি জীবনে কোনদিন শুনি নি।

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ আর আমি শীগগিরই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কসমোদেমিয়ানস্কি পরিবারে চলে এলাম। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ তার মা লিদিয়া ফিওদোরাভ্না আর ছোট ভাই ফেদিয়ার সংগে থাকতো। ওর বড়ো ভাই আলেক্সি লালফৌজে যোগ দিয়েছে। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ আর আমি বেশ সুখেই ছিলাম। ও ছিল বেশ শান্ত প্রকৃতির, মিষ্টি কথা খুব বেশি না বললেও, ওর প্রত্যেক কথায়, চোখের প্রতিটি ভঙ্গিতে, প্রতিটি কাজে আমার জন্য ওর সযত্ন মনযোগ প্রকাশ পেত, ইঙ্গিতমাত্রেই আমরা দুজনের মনের কথা বুঝতে পারতাম। আমাদের প্রথম সন্তানের আগমন সম্ভাবনায় আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আমরা ঠিক করলাম—নিশ্চয়ই আমাদের প্রথম সন্তান হবে ছেলে—এবার আমরা তার নামধাম ভবিষ্যত নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম।

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ কল্পনায় দেখতো—একটি শিশুকে প্রথম সূর্য, তারা, পশুপাখির সংগে পরিচিত করানো কি আশ্চর্য ব্যাপার। প্রথমবার তাকে গাছপালা দেখাবো, নদীসাগর চেনাবো, পাহাড়পর্বতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবো, কি চমৎকারই না হবে...

তারপর আমাদের শিশু হলো।

আমার শুশ্রূষাকারিণী বৃদ্ধা বলল—তোমার মেয়ে হয়েছে বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি—ঐ শোন সে নিজেই চেঁচিয়ে জানাচ্ছে।

কান্নার শব্দ ঘরের দেয়াল ভেদ করেও যেন শোনা যাচ্ছিল। আমি হাত বাড়াতেই একটি ছোট্ট ফরসা-রং, কালো চুল আর নীল চোখওয়ালা মেয়ে আমাকে দেখাল। সেই মুহূর্তে আমার তো মনেই পড়ল না যে আমি ছেলে চেয়েছিলাম, মনে হলো সারাজীবন ধরে আমি এই বাচ্চা মেয়েটিরই আশাপথ চেয়েছিলাম।

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বলল—"ওর নাম রাখা যাক জয়া।"

আমি সায় দিলাম।

সেদিনটা ছিল ১৯২৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর।

খুকুরানী

যাদের কখনও ছেলেপুলে হয় নি, তারা মনে করে সব বাচ্চারাই বুঝি একই রকম ; কিচ্ছু বোঝে না, খালি পারে কাঁদতে, চেঁচাতে আর বড়োদের কাজে বাগড়া দিতে। আসলে কিন্তু তা নয়। আমি তো ঠিক হাজারটা বাচ্চার মাঝখান থেকে আমার খুকুকে চিনে বার করতে পারতাম, ওর মুখের চেহারা অন্যদের থেকে অনেক অন্য রকম, ওর চোখের বিশেষ একটা ধরন, এমন কি গলার স্বরেও অন্যদের থেকে অনেক তফাত। আমার যদি সময় থাকতো আমার ইচ্ছা করতো ঘন্টার পর ঘন্টা বসে দেখি ও কি করে ঘুমায়, কি করে ঘুমের মধ্যে কম্বলে-মোড়া হাতখানা টেনে বার করে, কি করে জেগে উঠে লম্বা লম্বা চোখের পাতার ভিতর থেকে টানা চোখ দুটো খুলে সোজা তাকিয়ে দেখে।

আর কি চমৎকার সে অভিজ্ঞতা! প্রত্যেকদিনই নূতন নূতন জিনিস

আবিষ্কার করতাম, আর মনে হতো বাচ্চা যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ছে—দিনে দিনে ও বদলাচ্ছে। এখন ও প্রাণপণে চেঁচাতে থাকলেও হঠাৎ কারোর গলা শুনলে থেমে যায়। এমন কি খুব আস্তে আস্তে শব্দ করলেও বুঝতে পারে। ঘাড়টা ফিরিয়ে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনে। থেকে থেকে ওর বাবার কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাবে ওর ঠাকুমার দিকে, না হয় ফেদিয়া কাকুর দিকে। (জয়া জন্মাবার পর থেকেই আনাতোলি পেত্রোভিচ্-এর ১২ বছরের ভাইকে আমরা কাকু বলে ডাকতে শুরু করেছি)। এবার সেইদিন এলো যেদিন আমার খুকুমণি আমাকে প্রথম চিনতে পারলো। সেদিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমার সে এক স্মরণীয় দিন। আমি দোলনার উপর ঝুঁকে পড়তেই জয়া আমার দিকে একটুখানি চেয়ে বেশ মন দিয়ে কি যেন ভাবল আর হঠাৎ হেসে ফেলল। সবাই মিলে আমাকে বোঝাল যে ঐটুকু বাচ্চা বিনা কারণেই সবার দিকে তাকিয়ে অমনি হাসে, কিন্তু আমি ঠিক জানি সে-কথাটা সত্যি নয়।

জয়া খুব ছোট্ট ছিল দেখতে। গ্রামের লোকেরা বলত বেশি করে স্নান করালে শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই আমি ওকে প্রায়ই স্নান করাতাম। বাইরের খোলা হাওয়ায় রেখে দিতাম অনেকক্ষণ ধরে, শীত এসে গেলেও ওর মুখটা খোলা রেখে বাইরেই ঘুমোত। আমার মা আর শ্বাশুড়ীর পরামর্শমতো ওকে আমরা বিনা কারণে কখনও যখন তখন কোলে নিতাম না। আর এজন্যই বোধ হয় রাত্রে একবারও না কেঁদে জয়া নিশ্চিন্তে বেশ ঘুমাতো। বেশ শান্ত-শিষ্ট আর লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে গেল জয়া—মাঝে মাঝে অবশ্য ফেদিয়া কাকু এসে ডাকতো—জয়া, লক্ষ্মীসোনা—বলতো—কাকু, আচ্ছা বল মা—মা, বাবা...ওর ছাত্রীটি কিন্তু মাড়ি দেখিয়ে মুখে গর্-র্-র্ করে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলতে চাইত. কিন্তু কিছুদিন পর ও সত্যিই নকল করতে শিখল—আস্তে আস্তে ডাক ফুটল —বাবা, মা-মা—আর মনে পড়ছে তারপরই ও একটা অদ্ভুত কথা বলতো—সেটা হচ্ছে—অপ্...ছোট্ট সোনামণি মেঝের উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দুইহাত উঁচু করে চেঁচিয়ে উঠতো—অপ্—পরে অবিশ্যি বুঝেছিলাম সেটার মানে হলো—"এবার আমায় কোলে নাও"।

দুরন্ত শীত

বুড়ো লোকেরাও সেবার বলেছিল এমন দুরন্ত শীত তারাও দেখে নি কখনও। আর এর উপর যখন লেনিনের মৃত্যুর খবর পেলাম পৃথিবীর সেই শীতার্ত চেহারাটা যেন আমার কাছে বিষণ্ণ অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি যে কেবলই একজন নেতা বা অসাধারণ মানুষ ছিলেন তা নয়, আমাদের সবারই কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় বন্ধু আর উপদেষ্টা। আমরা সবাই জানতাম—আমাদের গ্রামের, বা বাড়ির যা কিছু উন্নতি, যা কিছু অগ্রগতি সবই তাঁর চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। আগে আমাদের ছিল মোটে দুটো স্কুল, এখন হয়েছে দশটা—এর মূলে লেনিন। আগেকার দিনে সাধারণ লোকেরা ছিল দুর্বল আর গরিব—আর এখন তারা সুস্থ সবল জীবনযাপন করছে—এর জন্যেও ধন্যবাদ লেনিনেরই প্রাপ্য। আজকাল আমরা ছবি দেখতে পাই, ডাক্তার, শিক্ষক,

সমাজসেবী সবাই কৃষকদের শেখাতে ব্যস্ত, সাধারণ পাঠাগার আর লাইব্রেরী আজ জমজমাট, গ্রাম্যজীবন সম্প্রসারিত হচ্ছে, জীবনে এসেছে উজ্জ্বলতা আর আনন্দের জোয়ার, নিরক্ষররা লেখাপড়া শিখছে, যারা হাইস্কুল শেষ করেছে তারা উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখছে—এসব কার জন্য সম্ভব হলো? এ নবজীবনের আলোক আমরা পেলাম কোথায়—এ প্রশ্নের জবাব চাইলে একটিমাত্র প্রিয় আর মহান নামই শুনবে—সে নাম হলো লেনিন।

তারপর হঠাৎ তিনি নেই—মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। প্রতিটি সন্ধ্যায় আনাতোলি পেত্রোভিচ্-এর বৈঠকখানায় এসে কৃষকরা তাদের মহত্তম দুঃখের ভার কিছুটা লাঘব করতে চাইত।

বুড়ো স্তিপান কোরেত্‌স্ বললো—"এমন লোকেরও মৃত্যু হয়? খুশি হতাম একশ বছর যদি বাঁচতেন—কিন্তু তিনি আর নেই।"

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আস্পেন বনে সারা ইউনিয়ন সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমরেড স্তালিনের বক্তৃতাসম্বলিত একখণ্ড 'প্রাভদা' এলো। গ্রামের সাধারণ পাঠাগারে আনাতোলি পেত্রোভিচ্ সবাইকে সেটা পড়ে শোনালো। জনতায় ভরতি সেই পাঠাগারের প্রত্যেকটি লোকের হৃদয়ে স্তালিনের বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা গভীর সাড়া জাগালো।

আনাতোলি পেত্রোভিচ্-এর পড়া শেষ হলে, হলের সবাই সে কাগজখানা একবার নিজের চোখে দেখে ও স্পর্শ করে জেনে নিল লেনিনের প্রতিজ্ঞা আর আদর্শ কি করে রূপ পাবে সে সম্বন্ধে স্তালিনের বলিষ্ঠ আর নির্ভীক বাণী।

কয়েকদিন পর এককালে গ্রামের রাখাল এবং এখন শ্রমিক স্তেপান জাবাবুরিন আস্পেন বনে এসে বিবৃত করল কি করে দলে দলে দেশের সব জায়গা থেকে লোকে লেনিনকে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল—"তুষারপাতে নিঃশ্বাস পর্যন্ত জমিয়ে দেবার উপক্রম করে রাত্রি এলো, তবুও লোকের আসার বিরাম নেই, তারা তাঁকে শেষ দেখা দেখবে বলে তাদের ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে এসেছে।"

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বিষণ্ণভাবে বলল, "কিন্তু আমরা তো তাঁকে দেখতে পাবো না, জয়াও পাবে না।" সে সময় আমরা তো আর জানতাম না যে শাশ্বত ক্রেমলিন দেয়ালের পাশে সমাধি তৈরি করা হবে আর সবাই তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।

স্তালিনের প্রতিজ্ঞাপত্রটি আমি যত্ন করে রেখে দিলাম, মনে মনে ভাবলাম, "আমাদের মেয়ে বড়ো হয়ে পড়বে।"

খোকন

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ জয়াকে হাঁটুর উপর নিয়ে টেবিলে বসতে ভালো বাসত। সাধারণত ও খাবার-টেবিলে পড়তে ভালোবাসত, আর জয়াও ওর মাথাটি বাবার কাঁধে রেখে চুপচাপ বসে থাকত, একটুও বিরক্ত করত না।

জয়া কিন্তু এখনও বেশ হাল্কা আর ছোট। কিন্তু ও হাঁটতে শিখল এগারো মাসেই। বেশ হাসিখুশি এবং মিশুক বলে সবাই ওকে খুব ভালোবাসত।

বাড়ির বাইরে গেলেই ও সবার দিকে তাকিয়ে হাসত, কেউ যদি ঠাট্টা করেও বলতো, "এসো আমার সঙ্গে দেখা করে যাও," বেশ খুশি হয়েই ও হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে চলে যেতো।

দু'বছর বয়স হতেই জয়া বেশ কথা বলতে শিখল—বাইরে থেকে বেড়িয়ে এলে যা যা দেখেছে সব সে বলতে ভালোবাসতো।

'কোথায় গিয়েছিলাম জানো? পেত্রোভনার বাড়ি। তুমি ওকে চেন? ওদের বাড়িতে আছে গালিয়া, সানিয়া, মিশা, কাসানিয়া আর আছে বুড়ো ঠাকুর্দা। একটা গরুও আছে। আবার ভেড়াও আছে। আচ্ছা ভেড়ারা লাফায়?'

ওর দু'বছর হবার আগেই ওর ভাই শুরা জন্মাল। প্রাণপণে চেঁচিয়ে সে তার আসার খবর ঘোষণা করলো—সে চিৎকার গম্ভীর গম্ভীর গলার—জয়ার থেকে চেহারায় আর ওজন ওর অনেকখানি বেশী; কিন্তু উজ্জ্বল চোখ আর চুলের কালো রং জয়ারই মতো।

শুরা জন্মাবার পর থেকেই আমরা জয়াকে বলতাম—এবার তুমি বেশ বড় হয়েছ, তুমি যে এখন দিদি। বড়দের সঙ্গে একটা বেশ উঁচু চেয়ারে ও খাবার টেবিলে বসত। শুরার সঙ্গে জয়া বেশ মুরুব্বীর মতো ব্যবহার করত। চুষি-কাঠিটা ফেলে দিলে তুলে দিত, জেগে গেলে ঘরে কেউ না থাকলে দোলনাটা দুলিয়ে দিত। আমিও এখন ওকে আমার অনেক কাজে সাহায্য করতে ডাকি।

'জয়া একটা হাত মোছার রুমাল এনে দাও তো', 'একটা কাপ এনে দাও না'—'ও জয়া আমার ঘর গোছানোয় একটু সাহায্য করো না—বইটা সরিয়ে দাও, চেয়ারটা ঠিকমতো রাখ তো...'

বেশ খুশি হয়েই ও সব করতো, করা হয়ে গেলে আবার জিজ্ঞেস করতো—"আর কিছু করার আছে?"

ওর যখন মোটে তিনবছর বয়স, আর শুরা সবে দুই বছরে পা দিয়েছে তখন একহাতে শুরার হাত ধরে আর একহাতে দুধের বোতল নিয়ে ঠাকুরমাকে দেখতে গিয়েছিল।

একদিন আমি গরু দোয়াচ্ছিলাম, শুরা কাছেই হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে আর জয়া একহাতে কাপ নিয়ে টাটকা দুধ নেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ গরুর গায়ে মাছি বসতেই লেজটা দুলিয়ে তাড়াতে গিয়ে আমার গায় লাগিয়ে দিল। জয়া তাড়াতাড়ি কাপটা মাটিতে রেখে একহাতে ধরল গরুর লেজটা, আর এক হাতে একটা ছোট ডাল নিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে বললো—"তুমি মাকে মারছ—আর কখনও যেন মেরো না।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো—"আমি তোমাকে সাহায্য করছি।"

দু'জনের মধ্যে কি তফাৎ—জয়া ছোট, আর ছিপছিপে, শুরা হলো গোল-গাল আর ভারি গড়ন।

সারা গ্রামে শুরার সম্বন্ধে আলোচনা হতো—আমাদের দিদিমণির ছেলেটি যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। দাঁড়িয়ে থাকলে যতোখানি উঁচু হয় শুয়ে থাকলেও প্রায় ততোখানিই।

আর সত্যি বলতে শুরা বেশ ভারী, আঠারো মাস বয়সেই ও গায়ের জোরে জয়াকে হারিয়ে দিত, অবশ্য তার জন্য শুরার খবরদারী করা, বা দরকারমতো তাকে ধমকানোতে জয়া মোটেই পিছপাও হতো না।

জয়া তো প্রথম থেকেই বেশ পরিষ্কার কথা বলতো, কিন্তু শুরা তিন বছর বয়স পর্যন্ত "র" বলতে পারতো না, জয়া এর জন্যে খুব দুঃখ পেতো।

জয়া বলতো—"রেন"

শুরা বলতো—"লেন"

"ওরকম নয়—বলো 'রে'"

"লে"

"লে নয় 'রে'। কি বোকা ছেলেরে বাবা। আবার বলো রান্"

"লান্"

"পরিজ"

"পলিজ"

একবার জয়া ধৈর্য হারিয়ে ভাইয়ের কপালে একটা চড় মেরেছিল। কিন্তু চার বছরের মাস্টারমশাইর চাইতে দু'বছরের ছাত্রের জোর অনেক বেশি। সে ধাক্কা দিয়ে জয়াকে ফেলে দিয়ে রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলো—"থামাও বলছি মারামারি।"

জয়া অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে চোখের জল লুকিয়ে ফেললো।

খানিক পরে আবার শুনলাম—"বল—চড়ুই"

শুরাও বাধ্য ছেলের মতো জবাব দিল—"চলুই"

জানিনা শুরা কি করে বুঝলো যে ও আমাদের ছোট ছেলে, কিন্তু প্রথম থেকেই এটা ও কাজে লাগলো, নিজের সাফাই-এর জন্য, ও বলতে শুরু করলো—'আমি ছোট', 'আমি ছোট্ট'। যা চাইল তা না পেলেই ও চেঁচাতে থাকবে "আমি ছোট্ট যে!" মনে হতো ওর এই বিশেষ দাবিটার সম্বন্ধে ও বেশ ওয়াকিবহাল, আর সে দাবি খাটানো সম্বন্ধেও ও পুরোপুরি সজাগ। আমরা যে ওকে ভালোবাসি তা বুঝতে পারতো বলেই আমি, জয়া, বাবা আর ঠাকুরমা সবাই যাতে ওর কথা শুনি তাই ওর লক্ষ্য ছিল।

কাঁদতে আরম্ভ করলেই শোনা যেতো ঠাকুমার গলা "কে আমার শুরা মণিকে কাঁদাচ্ছে? এসো তো দাদু, তোমার জন্য কি এনেছি দেখবে এসো"—বাস, শুরা এরই জন্য অপেক্ষা করেছিল—একদৌড়ে দুষ্টুহাসি হেসে ও গিয়ে ঠাকুরমার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজলো।

কিছু না দিলে মাটিতে শুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে কানে তালা লাগিয়ে দেবে, পা আছড়ে এমন কান্ড করবে যে দেখলেই মনে হবে ও বলতে চাইছে—"দেখ আমি ছোট্ট শুরা, আমায় কেউ ভালোবাসে না, আমার জন্য কারো একটুও কষ্ট নেই।"

একদিন খাবার সময় হবার আগেই শুরা জেলি খাবার জন্যে চেঁচাতে লাগলো। আমি আর আনাতোলি পেত্রোভিচ্ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। প্রথমটায় ও বুঝতে পারেনি ঘরে যে কেউ নেই, তাই থেকে থেকে বলতে লাগলো—"জেলী চাই, জেলি দাও।" তারপরে বোধ হয় অনর্থক এতো পরিশ্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মনে করে শুধু বলতে লাগলো—"চাই" "দাও"।—ঘরটা চুপচাপ দেখে ওর কি মনে হতেই মাথা তুলে দেখল ঘরে কেউ নেই—ভেবে দেখল কেউ যদি নাই শুনলো তবে চেঁচিয়ে কি হবে—তাই থেমে গেলো, একটুখানি কি ভেবে নিয়ে গাছের ডালপাতা নিয়ে খেলা করতে বসলো।

এবার আমি আর আনাতোলি পেত্রোভিচ্ ঘরে ঢুকতেই ও আবার চেঁচাতে শুরু করলো, কিন্তু আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বললো. "আবার যদি কাঁদতে

আরম্ভ করো, তাহলে আমরা তোমাকে একলা রেখে চলে যাবো, তোমার সঙ্গে আমরা আর থাকবো না বুঝতে পেরেছো?"

শুরা থেমে গেলো।

আর একবার ও কাঁদতে আরম্ভ করে ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুপি চুপি দেখতে লাগলো ওর জন্য আমরা ভাবছি কিনা। কিন্তু আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বই পড়ে যাচ্ছিলেন আর আমি নোটবইয়ে দাগ দেওয়া না থামিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিলাম, আমাদের কাজের কোন ব্যাঘাত হয়নি। তখন ও আর কি করে, চেষ্টা-চরিত্র করে আমার কোলে এসে উঠলো যেন কিছুই হয়নি। আমি ওর চুলগুলো একটু টেনে দিয়ে কোল থেকে নামিয়ে দিলাম। আবার আমার কাজ চলতে থাকলো। শুরা আর আমাকে বিরক্ত করেনি। এই দুটো ঘটনায়ই ওর স্বভাব বদলে গেলো—আমরা ওকে প্রশ্রয় দেওয়া থামাতেই ওর দুষ্টুমি আর চেঁচানি একদম বন্ধ হয়ে গেলো।

জয়া শুরাকে খুব ভালবাসতো। প্রায়ই ও বুড়োমানুষদের মতো গম্ভীর মুখ করে যা শুনতো তাই বলতো—"ছেলেটার মাথাটা খেয়ে তো কোন লাভ নেই, কাঁদুক না, কাঁদলে আর এমন কি ক্ষতি হবে?" ওর মুখ থেকে শুনতে ভারী মজা লাগতো। কিন্তু ও যখন ভাইকে আগলে রাখতো, তখন ভারী আদর করতো ওকে। শুরা যদি পড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলতো তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ওর মোটাসোটা ভাইটাকে হাত ধরে কোলে নিতে চাইতো। জামার নিচ দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলতো—"কেঁদো না, কেঁদো না লক্ষ্মীসোনা, ভালো ছেলে। এসো আমরা ইঁট দিয়ে রেলগাড়ি তৈরি করি। এসো এই বইটা থেকে ছবি দেখি। এই যে দেখো—"

মজার ব্যাপার কি জানো—যদি এমন কোন কিছু থাকতো যা জয়া জানে না, তাহলে সহজেই স্বীকার করত, কিন্তু শুরা কিছুতেই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করত না—"আমি জানি না"। পাছে স্বীকার করতে হয়—যে ও জানে না তাই নানা রকম চালাকি করে রেহাই পাবার চেষ্টা করত। মনে পড়ছে একবার আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বেশ সুন্দর একখানা ছেলেদের ছবির বই এনেছিল। আমরা সবাই ওটার মধ্যে সুন্দর জন্তুজানোয়ার, জিনিসপত্র আর লোকজনদের ছবিগুলো দেখতে ভালোবাসতাম। আমি ছবিগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে শুরাকে জিজ্ঞেস করতাম—বলো খুকু এটা কি? ও যা জানতো তার জবাব খুব চটপট দিতো কিন্তু যেটা জানতো না, সেটা জানি না বলতে হবে বলে কত ফন্দিই না আবিষ্কার করতো! রেলের ইঞ্জিনের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—"ওটা কি?"

শুরা একটুক্ষণ চিন্তা করলো—একটা নিঃশ্বাস ফেললো—তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বেশ ধূর্তের মতো বললো—"তুমি আগে বলো দেখি?"

"আর এটা?"

"মুরগীর বাচ্চা"—এবার খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

"ঠিক বলেছ—আচ্ছা এটা?"

এটা কিন্তু নূতন ধরনের আশ্চর্য একটা জন্তু—একটা উট।

শুরা বললো—"মা, পাতা উল্টিয়ে আমাকে আর কিছু দেখাও না—"

আরও কি ছল ও বের করতে পারে দেখার জন্য আমি পাতা উল্টিয়ে, বেশ ঝুঝিনি ভাব করে একটা হিপোপটেমাস দেখিয়ে বললাম—"এটা কি?"

মুখের চকোলেটটা চিবোতে চিবোতে শুরা বললো—"দাঁড়াও খেয়েনি তারপর বলবো" বলে সে এমনভাবে সেটা চিবোতে লাগলো যেন কোনকালে আর সেটা শেষ হবে না।

তারপর একটা নীল গাউন আর সাদা ব্লাউজ পরা মেয়ের হাসিমুখ দেখিয়ে বললাম—"বলো তো এই মেয়েটার নাম কি?"

মুখে চতুর হাসি ফুটিয়ে শুরা বললো—"তুমি জিজ্ঞেস করো না ওকে!"

দিদিমা

বাচ্চাদের দিদিমা মাত্রা মিখাইলোভ্‌নার বাড়ি যেতে ভারী উৎসাহ। তিনি তাদের ডেকে আদর করে দুধ আর পিঠে খেতে দিয়ে ওদের নিয়ে "বিট্ তোলা" খেলা খেলতে লেগে যেতেন।

বেশ চিন্তিত সুরে দিদিমা বলে চলেছেন—"দাদু তো শালগম পুঁতে তাকে বলছেন—খুব বড়, শক্ত আর মিষ্টি হয়ে গোল হয়ে বেড়ে ওঠো। শালগমও খুব বড়, আর শক্ত, আর মিষ্টি, আর গোল আর হলদে হয়ে বড় হলো। তারপর তো দিদিমা তাকে তুলতে গেলেন—টান্‌ছেন, টান্‌ছেন, আর টান্‌ছেন—কিন্তু তুলতে পারছেন না—বেশ নীচু হয়ে দিদিমা অবাধ্য শালগমটাকে জোর করে তোলার ভাণ করছেন), কি আর করেন, দিদিমা তখন নাতনী জয়াকে ডাকলেন তাঁকে সাহায্য করতে (জয়া এসে দিদিমার স্কার্ট ধরে টানছে), জয়া টানছে দিদিমাকে, আর দিদিমা টানছেন শালগমকে—টান্‌ছেন, টানছেন, আর টানছেন, তবুও পারছেন না। জয়া এবার শুরাকে ডাকলো (শুরা এসে জয়াকে আঁকড়ে ধরলো), শুরা টানছে জয়াকে, জয়া টানছে দিদিমাকে, দিদিমা টানছেন শালগমকে —সবাই মিলে টান্‌ছেই আর টানছেই (এবার বাচ্চাদের মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো)...টানছেই—এবার...শালগম বাছা উঠে এলো।"

তারপর দিদিমা যেন আকাশ থেকে পেড়ে আনতেন হয় আপেল, নয় মিঠাই, আর না হয় তো সত্যিকারের শালগম—আর যায় কোথায়—ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে হেসে বাড়ি মাথায় করে দিদিমাকে অস্থির করে দিতো।

শুরা তো বাড়ির দরজায় পা দিতে না দিতেই চেঁচিয়ে উঠত, "দিদিমা এসো আমরা 'শালগম তোলা, শালগম তোলা' খেলি।" বছর দুয়েক পর কেউ যদি গল্প বলার জন্য "দাদু বিট্ পুঁতলেন" বলে আরম্ভ করতো তক্ষুনি তারা বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতো, "দাদু নয় দিদিমা, দিদিমা পুঁতেছিলেন।"

আমার মা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটতেন। বাড়ির কাজকর্ম, মাঠের কাজ, ছয়টি ছেলেকে দেখাশোনা, জামা পরানো, হাতমুখ ধোয়ানো, খাওয়ানো, সবই তো তাঁকে একলা হাতে করতে হতো। ছেলেমেয়েই হোক আর নাতি-নাতনীই হোক্ সবারই উপর তিনি খুব ভালো ব্যবহার করতেন, খালি "বড়োদের শ্রদ্ধা করো" বলেই তিনি আমাদের শেখাতেন না, উদাহরণ দিয়ে আমাদের মনের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করতেন, হয়তো বললেন—"যেমন ধরো এই বাড়িটা, বুড়োরা তৈরি করেছে এটা; পেত্রোভিচ্ তৈরি করেছেন এই উনুনটা। তিনি গরিব হলে হবে কি, হাতদুটো যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো। তাঁকে ভক্তি না করো

কেউ পারে কি?" মায়ের মনটা ছিল বড় নরম। আমাদের ছেলেবেলায় অনেক ভিখারী আশ্রয়হীন ভবঘুরে ছিল, তাদের কারোকে দেখলেই মা তাদের বাড়িতে এনে খাইয়ে দাইয়ে জামাকাপড় দিয়ে বিদায় করতেন।

একদিন বাবা তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে অনেকক্ষণ ধরে কি খুঁজলেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁগো আমার নীল সার্টটা কোথায়?"

মা একটু অপ্রস্তুতের মতো বললেন—"ওটা আমি স্তেপানিচকে দিয়েছি, তুমি যেন রাগ কোরো না।" এক বুড়ো গরিব কৃষকের নাম ছিল স্তেপানিচ, তিনকুলে তার কেউ ছিল না, মা তাকে নানারকমে সাহায্য করতেন। বাবাও কিছু বলতেন না।

বহুদিন পরে আজ আমি বুঝতে পারছি আমার মা কি পরিশ্রমী, সহনশীলা আর ধৈর্যশীলাই না ছিলেন। কৃষক পরিবারের পক্ষে গরু হারানো যে কী সাংঘাতিক তা কেবল ভুক্তভোগীমাত্রই জানে। আমাদের গরুটা যখন চুরি যায়, মা একটি কথাও বলেননি, বা একফোঁটা চোখের জলও ফেলেননি। আর একবার আগুন লেগে গোটা বাড়িটাই পুড়ে যায়, বাবার পক্ষে সেটা খুবই মর্মান্তিক হয়েছিল, তিনি একটা পোড়া গাছের গোড়ায় হাতদুটো কোলের উপর নিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসেছিলেন, মা তাঁর পাশে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন—ভেবো না তুমি, আমরা আবার সামলে উঠবো। আবার আমরা সব নূতন করে গড়ে তুলবো।

মা একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কিছুই শিখতে পারেননি, কিন্তু তাঁর কাছে পড়াশোনা আর বিদ্যার মূল্য ছিল অনেকখানি। তাঁরই চেষ্টায় ও যত্নে আমরা শিক্ষা পেয়েছি। আমাদের পাঠশালা শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি করার জন্য তাঁর সে কি চেষ্টা! আজ যে আমরা শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে পারছি সে কেবল তাঁরই দয়ায়।

আমাদের পরিবারের অভাব ছিল অনেক, তার উপর যখন জিনিসপত্রের দর সমানে চড়তে লাগলো বাবা ঠিক করলেন আমার ভাই সার্জিকে সপ্তমশ্রেণী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন। কিন্তু মা তা কিছুতেই হতে দেবেন না, ছেলেকে পড়াশোনা শেখাবার জন্য প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে সরকারী খরচে পড়াবার কথা বললেন। দয়াভিক্ষা করে হীনতা স্বীকার করতেও পিছপা হননি।

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন—"তুমি তো নিজে পড়তে পার না একবর্ণও, কিন্তু মানিয়ে নিচ্ছ তো বেশ।"

মা তর্ক না করলেও নিজের যুক্তি ছাড়লেন না। তিনি বারেবারে বলতে লাগলেন—"যারা বলে জ্ঞানই হলো আলো, আর অজ্ঞানতাই অন্ধকার তারা ঠিক কথাই বলে।" তার নিজের অভিজ্ঞতাই তাঁকে বুঝিয়ে দিতো জ্ঞানের অভাবে কিরকম অন্ধকার জীবন কাটাতে হয়।

জয়া আর শুরাকে তিনি বলতেন—স্কুলে গিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করবে, তাহলে তোমাদের বুদ্ধি বাড়বে, জ্ঞান বাড়বে—নিজের আর তোমার দেশের অনেক উপকারে আসবে তাহলে।

দিদিমা এতো ভালো গল্প বলতে পারতেন যে কাজ থেকে মুখ না তুলেই তিনি বলে যেতেন। বুনতে বুনতে, আলু ছাড়াতে ছাড়াতে, ময়দা ঠাসতে ঠাসতে, ভাণ্ডার উজাড় করে—আপন মনে বলে যেতেন—

একটা শেয়াল বনে গিয়ে গাছের উপর কাঠঠোক্‌রাকে দেখতে পেলো। শেয়াল বললো—কাঠঠোকরা ভাই, কাঠঠোকরা ভাই আমি যে গেছলাম শহরে।

চাক্‌ চাক্‌ চাক্‌ চাক্‌...তাতো দেখতেই পেলাম।

কাঠঠোকরা ভাই, কাঠঠোক্‌রা ভাই তোমার শমন নিয়ে এসেছি।

চক্‌ চক্‌ চক্‌ চক্‌...বটে বটে বটে।

কাঠঠোক্‌রারা আর গাছে বসতে পারবে না, মাঠে মাঠে লাফিয়ে বেড়াবে...

জয়া আর শুরা নীচু বেঞ্চিতে বসে দিদিমার উপর থেকে আর চোখ ফেরাত না, দিদিমাও তেমনি একটার পর একটা গল্প বলে যেতেন, প্রথমে ছাই-রঙের নেকড়ে, তারপর মিষ্টি দাঁতওয়ালা ভালুক, ভীতু খরগোশ, তারপর আবার ধূর্ত শেয়াল।

ভাইবোন

জয়া আর শুরা ভাইবোন বাড়ির ভিতরেই খেলতে হতো, বেড়া ডিঙিয়ে যেতে দিতাম না, মাঠে চড়তে আসা গরুঘোড়ারা শুরাকে জখম করতে পারে, এই ভয়টা তো ছিলই। কিন্তু মানিয়া বা তাসিয়ার মতো বড়ো মেয়েদের সঙ্গে জয়া অনেক দূর অবধি বেড়াতে যেতো, কখনও বা মাঠে, কখনও বা গাঁয়ের পাশের ছোট্ট নদীটিতে, সারাদিন ধরে স্নান করলেও তাতে ডুবে যাবার আশঙ্কা ছিল না।

জয়া একটা ছোট জাল নিয়ে সারাদিন ধরে প্রজাপতি ধরে আর ফুল তুলে বেড়াতো, তারপর নদীতে স্নান করে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে তার জামা ধুয়ে শুকিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে আসতো। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেলতো—"দেখো তো মা, আমি কেমন সুন্দর করে ধুয়ে এনেছি, তুমি রাগ করনি তো মা?"

এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পাঁচ বছরের ছোট একখানি রোদেপোড়া কচি মুখ, চকচক করছে দুটি ধূসর কটা চোখের চাউনি। গ্রীষ্মের এক পশলা বৃষ্টির পর আবার সূর্যের মুখ দেখা দিয়েছে, আকাশ থেকে শেষ মেঘের টুকরাটাকেও বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ দূরে দিকচক্রবালের ওপারে পার করে দিয়ে এসেছে, বড় বড় গাছ থেকে টুপটাপ করে দু এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, অল্প অল্প গরম জল জমছে ছোটখাট গর্তে ; জয়া তার মাঝ দিয়ে এগিয়ে এসে আমার কাছে হেসে হেসে দেখাচ্ছে তার জামাটা কি রকম ভিজে গিয়েছে।

চোখের সামনে ভেসে আসছে মাঠের ওপার থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ করা এক পুরনো গরুর গাড়ি বোঝাই খড়ের উপর বসে জয়া গাঁয়ের দিকে আসছে। বড়োদের সঙ্গে খড়গুলো নাড়াচাড়া করে বিছিয়ে মিষ্টি গন্ধওয়ালা খড়গুলোকে গোলাবাড়ির পিছনে শুকোতে দিতো। ঢেউখেলানো সেই খড়ের উপর গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে জয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে তারই উপর ঘুমিয়ে পড়তো।

আর গাছে চড়তেই বা কি মজা ছিল। এতো উঁচুতে গিয়ে দাঁড়াবে যে নীচের দিকে তাকাতেও ভয় করবে। গাছের সরু মগডালে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে তোমার বুকের কাঁপুনি বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তারপর আস্তে আস্তে নেমে

আসা, পায়ের আঙুলে ডালগুলো চেপে ধরাও চাই, আবার জামাকাপড়ও যেন ছেঁড়ে না।

আর তারও চেয়ে মজার ব্যাপার হলো গোলাবাড়ির ছাদ কিম্বা ঘন্টাঘরের চূড়ায় উঠে চারদিকে নজর রাখা—গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের মনের মতো জায়গা এটা --গোটা গ্রামটাই যেন হাতের মুঠোয় এসে যায়, ওপারে মাঠ, "মাঠের পরে মাঠ —মাঠের পরে শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে গিয়ে মেশে—" আর তারপর... তারপর ওদিকে কি?

বাড়ি এসে জয়া জিজ্ঞেস করতো, "মা, আমাদের এই আস্পেন বনের ওপারে কি আছে মা?"

"শান্তির বাড়ি নামে একটা গ্রাম।"

"গ্রামের পর কি আছে?"

"সলোভিয়েঙ্কা।"

"সলোভিয়েঙ্কার ওপারে?"

"পাভলোভ্‌কা, আলেক্সান্দ্রোভ্‌কা, প্রভৃতি।"

"তারপর? কিরমানভের ওপারে কি? মস্কো কি তামবোভ-এর ওপারে? যেতে যে আমার কি ইচ্ছে করে!"

বাবার যখন হাতে কোন কাজ থাকতো না, জয়া তার হাঁটুর উপর চড়ে বসে যত রাজ্যের প্রশ্ন করতে থাকতো। পৃথিবীর সব ব্যাপার স্যাপার, যেমন, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, অরণ্য, শহর, লোকজন এইসব সম্বন্ধে ও এরকম মন দিয়ে শুনতো যেন রূপকথার রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরকম সময় জয়া আধখানা হাঁ করে, কান খাড়া করে, চকচকে চোখে তাকিয়ে থাকতো, দেখলে মনে হতো, ও যেন নিঃশবাস নিতেও ভুলে গিয়েছে। অবশেষে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে ও বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়তো।

চার বছরের শুরা সারাক্ষণই কিছু না কিছু ব্যাপারে ব্যস্ত ঃ জয়া হয়তো অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"জয়ার পকেটটা নড়ছে"—আর সত্যি নড়ছিলও।

"কি আছে রে পকেটে?"

আছে গোটাকতক গুবরে পোকা, ওরা চড়বড় করে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু শুরার হাতের চাপে ভবলীলা সাঙ্গ বেচারাদের।

ওর পকেট থেকে সন্ধেবেলা কি না বেরোতো! গুলতি, টিন, না হয় কাঁচের টুকরো, হুক, পাথর, নিষিদ্ধ দেশলাইকাঠি, আরও যে কতো কি? সর্বদাই হয় ওর কপালে ব্যথা, না হয় হাত-পা ছড়ে যাওয়া, না হয় হাঁটু কেটে গিয়েছে। চুপ করে বসে থাকার মতো শাস্তি ওর আর কিছুতে নয়। রাত্রে খেয়ে ঘুমাবার আগে পর্যন্ত শুরা লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, দৌড়ে বেড়াতো। বৃষ্টির পরে প্রায়ই দেখতে পেতাম, হাতে একটা লাঠি নিয়ে খানা ডোবাগুলিকে বাড়ি মারতে মারতে খেলছে। ঝরণা থেকে ছিটিয়ে পড়া ঝক্‌ঝকে জলের কণার মতো ওর মাথায় জল ছিট্‌কে উঠতো তাতে ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ও আরও জোরে ঘা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তো। নিজের রচনা গানের দু'একটি কলি গুণ গুণ করে গাইতো। সে গানের কোন কথা বুঝতে পারতাম না, খালি শুনতাম—তাইরে নাইরে নাইরে না তার মানে ওর মনে সূর্যের আলো, গাছপালা, বৃষ্টির ফোঁটায় যে আনন্দের ধারা বইছে তার ছোঁয়াচ দিতে হবে সবাইকে।

জয়া ছিল শুরার সারাক্ষণের খেলার সাথী, ওরই সঙ্গে চেঁচিয়ে, দৌড়ে,

গান করে বাড়ি মাথায় করে রাখতো। কিন্তু জয়া চুপচাপ বসে থাকতেও জানতো, ও যখন চুপ করে বসে শুনতো, ওর চোখগুলো কেমন চকচক করতো আর কালো ভুরু দুটো কুঁচকে আরও ঘন হয়ে উঠতো। কখনও বা আমি হয়তো দেখতাম বাড়ির কাছেই ভেঙে পড়া একটা বার্চগাছের পাশে বসে ও গালে হাত দিয়ে দূরে আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে কি ভাবছে। আমি জিজ্ঞেস করতাম—"কি করছো এখানে?"

জয়া জবাব দিতো—আমি ভাবছি।

বিগত দিনের মুছে যাওয়া অনেক ঘটনার মধ্যে একটার কথা আমার বেশ মনে আছে। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ আর আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমরা আসামাত্রই ঠাকুর্দা তিমোফি সেমিওনোভিচ্ জয়াকে নিয়ে পড়লেন—"তবে রে দুষ্টু মেয়ে—কালকে আমায় ফাঁকি দিয়েছিলি কেন?"

"কিসের ফাঁকি?"

"আমি তোকে জিজ্ঞেস করলুম না আমার চশমাজোড়া কোথায়, আর তুই যে বললি জানি না. একটু পরে তো আমি বেঞ্চের তলায়ই পেলাম, তুই না হলে কে লুকিয়ে রাখবে?"

জয়া একটুখানি ভুরু কুঁচকালো শুধু, কিছু বললো না, একটু পরে যখন খেতে ডাকলো, জয়া বললো, 'আমি আসবো না, তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো, আমি খাবো না।'

'হয়েছে হয়েছে, ও সব ভুলে গিয়ে খেতে বসো দেখি।'

'না আমি খাবো না।'

আর সত্যিই সে খেলোও না। বেশ দেখতে পেলাম পাঁচ বছরের নাতনীর সামনে বসে ঠাকুরদা বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। ফেরার পথে আমি জয়াকে খানিকটা বকলাম, কিন্তু ও কান্নাধরা গলায় শুধু বললো—"আমি কখনও দাদুর চশমায় হাতও দিইনি, এতো করে বললাম তবু দাদু বিশ্বাস করলেন না।" বেশ বোঝা গেলো ও খুব দুঃখিত হয়েছে।

জয়ার বাবার সঙ্গে ছিল জয়ার বেজায় ভাব। তিনি ব্যস্ত থাকলেও জয়া তার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করতো। আর তিনি কি করছেন তার উপর নজর রাখতো।

একদিন শুরাকে বললো—"দেখ, বাবা সব করতে পারে" আর সত্যিই তাই, যারা ওকে জানতো তারাই স্বীকার করতো যে আনাতোলি পেত্রোভিচ্ সব কাজই করতে পারে। বাড়ির বড়ছেলে, তার উপর ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়ে জমির যতো কাজ সবই তাকে করতে হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামের সাধারণ পাঠাগার আর লাইব্রেরীর সমস্ত ভার ছিল তার উপর। গ্রামের লোকদেরও ছিল ওর ওপর অখণ্ড শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। পারিবারিক বা সামাজিক সব ব্যাপারেই ওর সাহায্য না হলে চলতো না, আর কোন বিচার বা কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে ওরা বলতো, আনাতোলি পেত্রোভিচ্ই হলো উপযুক্ত লোক। ব্যাপারটার একেবারে গোড়া পর্যন্ত গিয়ে তিনি বিষয়টির ঠিক মীমাংসা করে দিতেন।

আর তার অবিসংবাদিত সততার জন্যও লোকে তার প্রতি আকৃষ্ট হতো। কোন অন্যায়কারী এলে বলে দিতো স্পষ্টই—তুমি অন্যায় করেছ—তোমার পক্ষ আমি নিতে পারবো না।
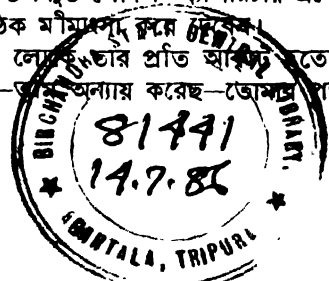
তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো এমনি পাকামাথা বৃদ্ধও তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে আসতো। নানারকমের বহু লোককে বলতে শুনেছি, আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বিবেকের সঙ্গে কখনও ছলনা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কোনদিন গর্ব ছিল না। বিনয়ই ছিল তার অলঙ্কার।

যে কোন ব্যাপারে ওর পরামর্শ চাইলে সঠিক জবাব পাওয়া যেতো। পড়াশোনাও ছিল তার প্রচুর আর পরিষ্কার করে তা বোঝানোর ক্ষমতাও তার ছিল। সাধারণ পাঠাগারে বসে খবরের কাগজ পড়ে কৃষকদের শোনানো, দেশের নানা ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা, গৃহযুদ্ধের ঘটনা, লেনিনের কথা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার সময় জয়া বসে বসে শুনতো। শ্রোতারা আনাতোলি পেত্রোভিচ্‌কে প্রশ্নের জ্বালায় ব্যস্ত করে তুলতো।

"আনাতোলি পেত্রোভিচ্, তুমি যা সব বলছো, শুনতে বেশ লাগলো। ইলেকট্রিসিটির কথা তো বেশ, কিন্তু ট্রাকটারের কথা আরও ভালো। এতবড়ো একটা যন্ত্র আমাদের ছোট ছোট জমিতে কি করে ঘুরবে ফিরবে বলো দেখি, ভালো কথা এমন কোন মেশিন কি সত্যিই আছে যা দিয়ে ফসল কাটা, ঝাড়া, থলিতে বোঝাই করা যায়?"

একদিন জয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা মা, বাবাকে সবাই এতো ভালোবাসে কেন?"

"তুমি বলো দেখি?"

ও চুপ করে রইলো, কিন্তু সন্ধ্যায় যখন ওকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলাম, আমার কানে কানে বললো, "বাবা যে খুব চালাক, সব জানে, আর খুব দয়ালু।"

দুনিয়া দেখা

জয়া তখন ছয় বছরের—আমি ও আমার স্বামী ঠিক করলাম সাইবেরিয়ায় যাবো। "পৃথিবীটা একটু দেখার জন্য", আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বললো।

গাড়ি করে স্টেশনে যেতে ছেলেমেয়েদের কি উৎসাহ। জীবনে প্রথম রেলগাড়ি চড়ে তার জানালায় বসে দেখা। বাড়িঘর, মাঠ, গরুর পাল, গাছপালা সবাই ছুটে চলেছে পিছন দিকে। বনজঙ্গল নদীনালা আর তারপর বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি চারদিকে ছড়িয়ে পাক খেতে খেতে ধাওয়া করেছে। আর গাড়ির মেঝের নীচে চাকার অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দ—যেন ভ্রমণ ও দুঃসাহসিক অভিযানের গান গেয়ে চলেছে উদ্দামভাবে।

সাইবেরিয়া পৌঁছুতে আমাদের লেগেছিল সাতদিন, আর এই সাতদিনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্যও ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের বিরাম ছিল না। "এটা কি? ওটা কি? ওটা কেন হলো? ওটা কি জন্য, কেন এমন হলো, কি করে হলো?" এইসব। সাধারণতঃ লোকে রাস্তায় বেশ ঘুমায়, কিন্তু ছেলেমেয়ের মন ভরপুর ছিল যা কিছু দেখেছে ও দেখছে তাই দিয়ে; দিনের বেলায় ওদের ঘুমপাড়ানো একরকম অসম্ভব ছিল। শুরা রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো, কিন্তু জয়াকে জানালার কাছ থেকে টেনে আনাই যেতো না, জানালা যখন গভীর নীল হয়ে উঠত

রাত্রির অন্ধকারে, কেবলমাত্র তখনই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে জয়া উঠে আসতো। "আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, খালি আলোগুলো..." বলে শুয়ে পড়তো।

সাতদিনের দিন য়েনিসি অঞ্চলে কান্সক্ শহরে পেঁছিলাম। রাস্তার এক-তলা বাড়িগুলো এমন কি রাস্তাগুলোও সব কাঠের তৈরি। ছেলেমেয়েদের একটা হোটেলে রেখে আমরা দুজন বেরোলাম শিক্ষাদপ্তরের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে আমরা চাইলাম এমন গ্রামে যেতে যেখানে আমরা দুজনেই একই স্কুলে পড়াতে পারবো। সিৎকিনো গ্রামে কাজ পেয়ে গেলাম, আমরা ঠিক করলাম আর দেরি না করে আজই বেরিয়ে পড়া যাক্। হোটেলে ফিরে এসে দেখি শুরা তার ইঁটকাঠ নিয়ে বাড়ি বানাবার কাজে ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করলাম—"জয়া কোথায়?"

"জয়া আমাকে বললো—এখানে বসো, আমি বাজার থেকে মোম কিনে আনি। এখানে সবাই মোম খায় কিনা তাই।" আমি তো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ছোট্ট শহর, বন থেকে রশিটাক দূরে হবে—আচ্ছা জয়া যদি ঘুরতে ঘুরতে বনের মধ্যে চলে গিয়ে থাকে তাহলে কি হবে?

আনাতোলি আর আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, বাজারে গিয়ে খোঁজ করলাম কিন্তু জয়ার কোন সন্ধান নেই।

শেষে আনাতোলি আমাকে বললো, "তুমি হোটেলে ফিরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, শুরার উপর নজর রেখো, আমি ততক্ষণ সেনাদপ্তর থেকে খোঁজ নিয়ে আসি।" আমি হোটেলে ফিরে শুরাকে কোলে নিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এলাম, ঘরে বসে অপেক্ষা করা আমার সাধ্য ছিল না। এদিক সেদিক চেয়ে আধঘন্টার উপর আমরা কাটিয়ে দিলাম, এমন সময় শুরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—"ঐ যে বাবা আসছে জয়াকে নিয়ে।"

আমি দৌড়ে জয়াকে দেখতে গেলাম। বেচারার মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে, একটু ভয়ও পেয়েছে, আর অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে, হাতে তার একটা মোমের ডেলা।

যেন একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছে এমনি গলার সুরে সে বললো, "এই যে মোম, খেতে মোটেই ভাল না।"

জানা গেল, ও বাজারে গিয়ে মোম কিনে ফেরার সময় দেখলো যে রাস্তা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু কি করে জিজ্ঞেস করবে তাতো জানে না। পথ ভুলে চলতে চলতে ও প্রায় বনের কাছে চলে গিয়েছিল আর কি! এমন সময় একজন পথিক (জয়ার ভাষায়—শাল গায়ে মস্ত একজন মহিলা) ওকে দেখতে পেয়ে হাত ধরে সেনাদপ্তরে জমা দিয়ে আসে, সেখান থেকেই আনাতোলি পেত্রোভিচ্ ওকে নিয়ে আসে। সেখানে মান্যগণ্য অতিথির মতো টেবিলে বসে চা খেতে খেতে বেশ গম্ভীরভাবে জয়া সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল, তার নাম কি, কোত্থেকে, কার সঙ্গে এসেছে, বাবার নাম কি, মার নাম কি, ভাইয়ের নাম কি? ভাইয়ের কথা উঠতেই জয়া তক্ষুনি বলে উঠলো, তার ভাই খুব ছোট্ট, ওর কাছে এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

আমি একটু বকলাম—"কি করে তুমি শুরাকে একলা রেখে গেলে, তুমি এতবড়ো হয়েছ, তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম আমরা।" জয়া বাবার পাশে দাঁড়িয়ে একবার তার বাবার আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো—"ভেবে-

ছিলাম তক্ষুনি ফিরে আসবো। মনে করেছিলাম আস্পেন বনের মতো সব কিছুই বুঝি এখানে খুঁজে পাবো। রাগ করবার কোন কারণ নেই—আমি আর কখনো করবো না।"

আনাতোলি হাসি চেপে বললো—"বেশ, প্রথমবার বলে এবার তোমাকে মাপ করা গেল, না বলে আর কখনও চলে যেও না, দেখছ না তোমার মা কিরকম ভয় পেয়েছেন?"

সাইবেরিয়ায়

সিংকিনোয় আমাদের বাড়িটা বেশ চওড়া খরস্রোতা একটা নদীর উঁচু পাড়ের উপর। নদীর দিকে তাকালে মাথা ঘুরতে থাকে, মনে হয় জলের স্রোতে ভেসে চলেছি দূরে, বহুদূরে। কয়েক পা এগোলেই বন, আর সে বনই বা কি রকম। মস্ত লম্বা লম্বা সিডার গাছের সারি, পিঠ বেঁকিয়ে ঘাড় উঁচু করেও তাদের মাথা দেখা যায় না; ঘন ঝোপওয়ালা ফার, স্প্রুস এবং লার্চ গাছ এতো ঘন সন্নিবিষ্ট যে তলাটা গুহার মতো রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা। চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, সে স্তব্ধতা ভেঙে পায়ের তলায় মচমচ শব্দে হয়তো একটুক্ষণের জন্য একটা-দুটো পাখি সচকিত হয়ে ডেকে উঠবে--তারপরই আবার সেই সীমাহীন মায়াপুরীর প্রগাঢ় সুপ্তি।

বনে বেড়ানোর প্রথম দিনটির কথা বেশ মনে আছে। আমরা চারজনে চলতে চলতে একটা ঘন ঝোপের কাছে এলাম। শুরা একটা প্রকাণ্ড ঘন দেবদারু গাছের কাছে দাঁড়িয়ে, আমরা একটু এগিয়ে ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না। আমরা ঘুরে দেখি ও তখনও সেই বিরাট গাছটির তলায় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে একলা; যেন বনের মর্মর ধ্বনি শুনছে। বনের মায়া ওকে অভিভূত করেছে। এর আগে তো ও কোনদিন এতগুলো গাছ একসঙ্গে দেখে নি, আস্পেন বনের গাছগুলো তো ওর আঙুলে গোণা যেতো। সেদিন ওকে ফিরিয়ে আনলাম বটে, কিন্তু এর পরে যখনই আমরা বনে গিয়েছি, ও খুব শান্তশিষ্ট হয়ে চুপ করে থাকতো, বন ওকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। সেরাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে জানালার ভিতর দিয়ে বনের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে, —ওর বাবা বললেন—"কি ব্যাপার শুরা, ঘুমোতে যাচ্ছো না কেন?"

শুরা বিড়বিড় করে বললো—"বনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি যে।"

জয়াও বনকে ভালবেসে ফেললো। বনের মধ্যে বেড়ানো, খেলা করা ওর সবথেকে ভাল লাগতো। একটা ঝুড়ি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে ও জাম কুড়োতে যেতো।

আমি বলে দিতাম—"বেশি দূরে যেও না যেন, সবাই কি বলেছে শুনেছো তো? বনে বাঘ ভালুক আছে।" সত্যিই বনে জাম কুড়োতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়, ঝোপেঝাড়ে ধারালো দাঁতওয়ালা ভালুকের দেখা পাওয়াটা মোটেই আশ্চর্য নয়। তবে মিষ্টি আর রসালো জামের লোভে লোকেরা দল বেঁধে বনে যেতো, তাদের কারো হাতে থাকতো একআধটা বন্দুক, যদিইবা ভালুকবাবাজী অথবা বাঘভায়ার সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায়। সাইবেরিয়ার লোকেরা আমলকী,

চেরী, ব্যাঙের ছাতা—এইসব কুড়িয়ে সারা শীতকালের জন্য জমিয়ে রাখত, জয়াও ওদের সঙ্গে ফিরতো তার ঝুড়িটা ভর্তি করে।

আবার দুজনে মিলে নদীতে যেতো জল আনতে, তাতেও ওদের প্রচণ্ড উৎসাহ। বেশ স্বচ্ছন্দভাবে জয়া তার কলসী জলে ভরে নিয়ে দ্রুত বয়ে যাওয়া ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো, বাড়ি ফিরে পরেও হয়তো জানালা দিয়ে চেয়ে থাকতো ঐ নদীর দিকে।

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ একবার জয়াকে সাঁতার শেখাতে মনস্থ করে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন নদীতে। তীর থেকে বেশ অনেকটা সঙ্গে করে জয়াকে নিয়ে তিনি হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিলেন। জয়া ডুবে গেলো, আবার উপরে ভেসে উঠলো—তারপর আবার ডুবে গেল...

তীরে দাঁড়িয়ে আমার তো নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ সত্যিকারের ভাল সাঁতারু, তিনি ওর পাশে পাশে আছেন কাজেই জয়ার ডুবে যাওয়ার ভয় নেই, একথাও খুব সত্যি। তবু ওকে নিশ্বাস নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে, বারে বারে ডুবতে দেখে খুব ভয় করছিল বইকি! কিন্তু আমার বেশ মনে আছে ও একবারও কাঁদে নি, হাত পা ছুঁড়ে, জল ছিটিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছিল। শেষকালে ওর বাবা ওকে ধরে ডাঙ্গায় নিয়ে এলেন। বেশ জোর দিয়েই তিনি বললেন—"লক্ষ্মী মেয়ে আর বার দু'য়েক চেষ্টা করলেই শিখে ফেলবে।"

ওর গা মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম—"ভয় পেয়েছিলে?"

ও স্বীকার করলো।

ওর বাবা দুষ্টুমি করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আবার যাবে নাকি?"
জয়া বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললো—"চলো!"

শীতকাল

সাইবেরিয়ায় শীত এলো। নদী জমে বরফ, তুষারের তাপমাত্রা শূন্যের নীচে ৫৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কিন্তু ঝড়বাতাস না থাকায় ছেলেমেয়েরা বেশ সহজেই শীত সহ্য করে নিলো।

প্রথমদিন তুষার-মানব বানিয়ে তাদের সেকি ফূর্তি! বরফের বল তৈরি করে খেলায় ওদের ক্লান্তি নেই—কি সুন্দর গড়াগড়ি দিচ্ছিলো ওরা বাড়ির চারদিকে জমে ওঠা তুলার মতো নরম বরফের উপর; একবার ওরা জয়ার চেয়েও বড় একটা তুষার-মানব তৈরি করলো। ওদের খাবার জন্য ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না, অবশেষে উত্তেজনায় টকটকে লাল গাল নিয়ে ওরা এসে একেবারে বুভুক্ষুর মতো পরিজ, দুধ আর রুটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ছেলেমেয়েদের আমরা সাইবেরিয়াবাসীদের মতো বরফের জুতা কিনে দিয়েছিলাম। আনাতোলি পেত্রোভিচ একটা সুন্দর স্লেজগাড়ি বানিয়ে দিলো। জয়া আর শুরা তো একেবারে বেপরোয়া বেগে চালিয়ে দিতো পাহাড় বেয়ে নীচের দিকে; ঘন্টার পর ঘন্টা এই করতো। এই দেখি জয়া বসেছে শুরা টানছে,

এই দেখি দুজনে মিলে বসেছে, জয়া সামনে আর শুরা পিছন থেকে ওর লাল দস্তানাপরা মোটা মোটা হাত দুখানা দিয়ে জয়ার গলাটা জড়িয়ে ধরে আছে।

আমি আর আমার স্বামী সারাদিন ব্যস্ত থাকতাম। সকাল বেলা বেরুবার সময় জয়াকে বলে যেতাম, "ভুলো না যেন উনুনের উপর পরিজ আর বাটিতে দুধ আছে। শুরা যেন ভালভাবে চলে দেখো—ও যেন টেবিলের উপর চড়ে বসে না, তাহলে পড়ে গিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। লক্ষ্মী হয়ে থেকো, দুজনে মিলে খেলা করো, ঝগড়া কোরো না যেন।"

সন্ধ্যাবেলা আমরা ফিরে এলে জয়া আমাদের অভ্যর্থনা করতো—"মা সব ঠিক আছে—আমরা খুব লক্ষ্মী হয়ে ছিলাম।"

ঘরের জিনিসপত্র সব ওলোট পালোট, কিন্তু বাচ্চাদের মুখগুলো এমন হাসি হাসি, আর তারা এতো খুশি যে তাদের বকতে মন চায় না। দেখা গেল চেয়ার টেবিল উপর উপর সাজিয়ে একটা দোতলা বাড়ি করে তাকে আবার কম্বল দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। যেখানে যে জিনিসটা থাকবার কথা নয় সেখানেই সেটিকে পাওয়া যাচ্ছে। আমি তো আর একটু হলেই আমার স্বামীর দাড়ি কামাবার আয়নাখানা মাড়িয়ে ফেলেছিলাম, পর মুহূর্তেই অবিশ্যি তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একটা ওল্টানো সস্‌প্যানের উপর। ঘরের মাঝখানে যতো সব কাপ আর প্লেটের সঙ্গে জড়ো করে রাখা হয়েছে ওদের সব খেলনা-পত্র। কি নেই তাতে! একটা টিনের সেপাই, চাকাওয়ালা ঘোড়া, তার আবার কেশরগুলো উপড়ানো, একটা একঠেঙে পুতুল, কাগজপত্র, চুলের ফিতে, কাঠের টুকরো।

জয়া খবর দিলো, "আজকে আমরা কিন্তু কিছু ভাঙিনি, অবিশ্যি শুরা মানিয়ার দুই গালেই আঁচড়ে দিয়েছে। ও একটু কেঁদেছিল, তবে আমি তাকে খানিকটা জ্যাম দিলে থেমে যায়। মাগো, শুরাকে বলে দাওনা যেন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে না, তাহলে ওর সঙ্গে আর খেলবো না আমরা।"

শুরা সত্যিই একটি ক্ষুদে ডাকাত হয়ে উঠছিল, ও অপরাধীর মতো আমার দিকে তাকাল, অপরাধীভাবে বললো—"আমি আর করবো না, আমি ইচ্ছে করে আঁচড়াইনি।"

গনগনে আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে সন্ধেবেলাটা বেশ আনন্দের সঙ্গেই কাটিয়ে দিতাম। বেশ ভালভাবেই কাটতো সময়টা। তবে আমাদের, বিশেষ করে আনাতোলি পেত্রোভিচের প্রায়ই কাজ থাকতো হাতে, ছেলেমেয়ের দিকে পুরোপুরি মন দেবার সময় বিশেষ থাকতো না। ওরা বেশ ছোটবেলা থেকেই কাজ কথাটার মানে বুঝতে শিখল। "চুপ্ চুপ্...মা যে কাজ করছে...চুপ্—বাবা কাজ করছে যে!" তার মানে ঝগড়া, মারামারি, শব্দ করা সব বন্ধ! হয়তো বা হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের তলায় বসে চুপচাপ খেলা করতে লাগলো—নিঃশব্দে কেটে গেল ঘন্টার পর ঘন্টা! একবার সলোভিয়াঙ্কাতে তুষারবৃষ্টি হয়েছিল—নিঃশব্দে বাড়ির পাশে বেড়ে ওঠা ঝাউগাছের পাতায় পাতায় হু হু শব্দে বাতাস বয়ে গিয়েছিল। চিমনির ভিতর দিয়ে সেই করুণ বিষাদের সুর ভেসে আসছিল, সেখানে অবশ্য আমি ছিলাম একলা, এখানে ঐতো আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বসে ছাত্রদের খাতা দেখছে, বাচ্চারা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে আমাদের আশে-পাশে। সত্যি বেশ সুখে আছি আমরা।

অনেক বছর পরেও, ছেলেমেয়ে যখন স্কুলে পড়ে তখনও সেই দূর সাইবে-

রিয়ার গ্রামের কথা ওরা বলতো। সিংকিনোতে যখন ছিলাম আমরা তখন শুরা বেশ ছোট, মোটে সাড়ে চার বছরের ছিল। সেই সময়ের কথা ওর ভাবতে ভালো লাগলেও ওর স্মৃতিতে সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। জয়ার কিন্তু বেশ স্পষ্ট মনে ছিল সেই মধুর সন্ধ্যাগুলো।

আমার হাতের কাজ শেষ করে, হয়তো বা সরিয়ে রেখে ছেলেমেয়ের কাছে সরে গিয়ে ওদের নিয়ে একটু গল্প করতাম। ওদের তখন ঘুমোবার সময় হয়েছে, ওরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। ওরা বলত, "একটা গল্প বলো না..."

"আর কি গল্প বলবো, তোমরা তো সবই জানো!"

"তাতে কি হলো? আবারও বলো!"

তখন শুরু হতো আমাদের গল্প—ধূসর ভালুক, রাজপুত্র ইভান, বোন আলিউসকা, আর ভাই ইভানুস্কা—আরও সব শীতের সন্ধ্যায় একে একে এসে ভিড় জমাতো আমাদের সামনে। ওদের সবচেয়ে মনের মতো ছিল সুন্দরী ভাসিলিসার কাহিনী—

"অনেক...অনেক দিন আগে..." কতবার যে বলা হলো তার লেখাজোখা নেই, তবুও আরম্ভ করলে জয়া আর শুরা এমনভাবে শুনতো যেন এই সবে প্রথমবার শুনছে।

কখনও বা আনাতোলি পেত্রোভিচ্ কাজটাজ ফেলে রেখে এসে আমাদের সংগে যোগ দিতো। তাঁর গল্প ওরা বিশেষ আগ্রহ করে শুনতো। এ ব্যাপারটা ঘটতো খুব কদাচিৎ, আর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। ওরা হয়তো আমাদের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে নিজেদের ব্যাপারে মশগুল—হঠাৎ আনাতোলি বই-টই সব সরিয়ে রেখে আগুনের পাশে নিচু বেঞ্চটার উপর বসে এক হাঁটুর উপর জয়াকে, আর এক হাঁটুর উপর শুরাকে রেখে শুরু করল, "আর তখন কি হয়েছিল জানো?..." বাচ্চাদের মুখগুলো অজানার আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। না জানি বাবা আজ কি গল্পই বলবেন!

একবারের কথা মনে পড়ে। বসন্তকালের বন্যার কথা বাচ্চারা জানে, ওরা অনেক শুনেছে। এদিকে বন্যা মানে বাড়িঘর, গরুবাছুর ভাসিয়ে গ্রামকে গ্রাম ডুবিয়ে দেয়। একেবারে খেলার কথা নয়, এখানে নূতন এলেও আমরা শুনেছি। এসব শুনে শুরা জয়াকে একদিন জিজ্ঞেস করলো—"আমরা তাহলে কি করবো?"

"একটা নৌকো নিয়ে আমরা তাতে চড়ে বেড়াব, আর না হয়তো পাহাড়ে চলে যাবো।"

মিনিটখানেক ধরে কি ভেবে জয়া বললো—"জল এসে আমাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, আচ্ছা শুরা তোর ভয় করছে না?"

"তোর?"

"মোটেই না।"

"তাহলে আমারও করছে না—"

শুরা দাঁড়িয়ে উঠে বাবার মতন করে পায়চারী করতে করতে বললো—"আসুক না বন্যা, আমি কি তাতে ভয় পাই! আমার কিছুতেই ভয় করে না।"

আর ঠিক এই সময়ই আনাতোলি পেত্রোভিচ্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুরে বললেন—"জানো একবার কি হয়েছিল? কতকগুলো চড়ুই একটা গাছের ডালে

বসে খুব চেঁচামেচি করে আলোচনা করছিল—বনের কোন্ জন্তু সব থেকে বিপজ্জনক...

ল্যাজকাটা এক চড়ুই বললো, 'বাদামী বেড়াল হলো সব থেকে বিপজ্জনক।' কারণ গত শরৎকালে ঐ বেড়ালটা ওকে প্রায় ধরে ফেলেছিল আর কি। ও অবশ্য উড়ে পালিয়ে আসে। তবে বেচারার লেজটি খোওয়া যায়।

'ছোট ছেলেগুলো আরও দুষ্টু, ওরা আমাদের বাসা ভেঙে, গুল্‌তি মেরে অস্থির করে তোলে'—বল্‌লে আর এক চড়ুই।...আবার আর একটি বল্‌লে—'ছোট ছেলেদের কাছ থেকে তো ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু কালো চিল ...তার কথা ভেবেছ কি? যেখানেই যাও না কেন, তার হাত থেকে নিস্তার নেই কিছুতেই।'

আর ঠিক সে-সময়—একটা হল্‌দে ঠোঁটওয়ালা ছোট্ট বাচ্চা চড়ুই বললো—(আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বেশ নিচু গলায় বলতে লাগলেন)—'আমি কিছুতেই ভয় পাই না, কারোকেই ডরাই না—হোক্ না সে বেড়াল, না হয় বাচ্চা ছেলে—হলো বা কালো চিল, আমি সবাইকে ধরে খেয়ে ফেলবো।'

ও তো বলছিল বেশ জোরেই—ঠিক এমনি সময় একটা মস্ত বড় পাখি ঐ গাছের ডালের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে বেশ জোরেই ডেকে উঠলো। আর যায় কোথায়, চড়ুইদের তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। কেউ বা জোরসে উড়ে পালাল, কেউ বা পাতার আড়ালে লুকালো, আর সেই ছোট্ট বীরপুরুষ চড়ুইটা হতবুদ্ধি হয়ে গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘাসের উপর দিয়ে লাফাতে লাগলো, আর সেই বড় পাখিটা ঠোঁট খাড়া করে তীরবেগে নেমে আসতে লাগলো ওকে ধরবার জন্য—সে বেচারা এমন ছুটতে লাগলো যে ভয়ে ভয়ে শেষে এই ইঁদুরের গর্তে গিয়ে ঢুকে দম নিল খানিকক্ষণ। আর সেই গর্তে এক বুড়ো মেঠো ইঁদুর কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, চড়ুইটা আরও ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু কি ভাবল জানো? 'আমি যদি ওকে আগে না খাই তাহলে ওই আমাকে খেয়ে ফেলবে' এই না ভেবে দিল ইঁদুরের নাকে এক খোঁচা। বেচারা ইঁদুর তো অবাক্, সে অনেক কষ্টে তার একচোখ খুলে জিজ্ঞেস করলো—'কি ব্যাপার! আরে আরে তুমি'...(আনাতোলি এইসময় চোখ কুঁচকে, হাই তুলে বেশ ভারি মোটা গলায় বলতে লাগলেন) 'ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি! এই যে এক কামড় দানা খাও!'

বেচারা চড়ুই তো ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়ে বলে ফেললো—'কালো চিল আমায় খেয়ে ফেলতে চায় যে!'

ইঁদুর বললো—'আবার সেই হতভাগা এসেছে বুঝি—চল তো তার সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।'

মেঠো ইঁদুর গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগলো, আর বাচ্চা চড়ুই লাফাতে লাফাতে আসতে লাগলো ইঁদুরের পিছনে। ওর তো খুব ভয়, দুঃখ আর বিরক্তি হতে লাগলো, কি জন্য তাহলে ও এতো বড়াই করেছিল? মেঠো ইঁদুর গর্তের বাইরে এলে ক্ষুদে চড়ুই মহাভয়ে আস্তে আস্তে ওর পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখে কি—একটা মস্ত বড়ো কালো পাখি ওকে ভয় দেখাচ্ছে—ও তো ভয়ে একেবারে কেঁপে উঠল—এইবার ধরে আর কি? কিন্তু যেই না পাখিটা ডেকে উঠলো—আর সব চড়ুইবা হেসে গড়িয়ে পড়লো কারণ ওতো চিল নয় মোটেই, ও হলো..."

জয়া আর শুরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—"কাকখুড়ী"

"কাক তো বটেই—এবার ইঁদুরমশাই বললো ক্ষুদে চড়ুইকে—'তোমার বড়াই-এর জন্য কিছু শাস্তি পাওয়া দরকার। যাকগে ছাই আমার বেজায় শীত করছে কিছু শস্যকণা আর আমার লোমের কোটটা এনে দাও দেখি।'

ইঁদুরমশাই কোট পরে শিস দিতে দিতে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, খালি বেচারা চড়ুইখোকার মনে সোয়াস্তি নেই, লজ্জায় সে বেচারা সবচেয়ে ঘন ঝোপের ভিতরে ঢুকে পড়লো।"

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ একটু থেমে বললো—"আমার কথাটি ফুরুলো—আচ্ছা এবার দুধ খেয়ে লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোতে যাও দেখি!"

শুরা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললো—"গল্পটা কি আমায় নিয়ে?" বাবা হাসি চেপে বললেন—"গল্পটা একটা চড়ুইকে নিয়ে।"

অনেকদিন পরে আলেক্সি তলস্তয়-এর বই পড়তে পড়তে আমি গল্পটা পাই। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বোধহয় ছোটদের কোন মাসিকপত্র থেকে গল্পটা পড়ে মনে রেখেছিল।

অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা

একদিন জয়া বললো—"আচ্ছা মা, বার্মাকিনদের এত বড়ো বাড়ি, এত ভেড়া আর এত ঘোড়া আছে। একজনের এতসব থাকবে কেন? আর রুজেনস্তভদের এত ছেলেমেয়ে—ঠাকুরদা, ঠাকুরমা সব নিয়ে একটা ভাঙা কুঁড়েঘরে থাকে কেন? ওদের কেন একটাও ঘোড়া, একটাও ভেড়া নেই?"

জয়ার সঙ্গে দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য, ন্যায় আর অন্যায় নিয়ে সেই আমার প্রথম আলোচনা: ছয় বছরের মেয়েকে এসব কথা বোঝানো বেশ শক্ত, কারণ এই প্রশ্নের উত্তরে যেসব কথা বলতে হবে তার অনেকগুলোর মানে ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমরা শীঘ্রই সেই প্রশ্নের অবতারণা করতে বাধ্য হলাম।

১৯২৯ সালে আমাদের জেলার সাতজন কমিউনিস্টকে কুলাকরা মেরে ফেলে। সিৎকিনো গ্রামেও খবরটা শীগ্গিরই ছড়িয়ে পড়ল। মৃতদেহ সাতটা যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমি তখন আমাদের বাড়ির সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। কফিনগুলোর পিছনে আসছিল রুদ্রগম্ভীর বিপ্লবী শোক-সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে ব্যান্ডপার্টি। তাদের পিছনে এলো রাগ এবং দুঃখে জর্জর বন্যার স্রোতের মতো গ্রামবাসীর দল।

জানালার দিকে তাকিয়ে আমার নজরে পড়লো জয়ার ভীতিবিহ্বল, বিবর্ণ মুখের চেহারা। মুহূর্ত পরেই সে দৌড়ে আমার পাশে এসে আমাকে আঁকড়ে ধরে অনেকক্ষণ ঐ শোকযাত্রার দিকে তাকিয়ে রইল।

"কেন ওদের মেরে ফেললো? কুলাক কাদের বলে? তুমিও কি কমিউনিস্ট, বাবাও কি কমিউনিস্ট? ওরা কি তোমাদেরও মেরে ফেলবে? যারা ওদের মেরেছে ধরা পড়েছে কি?"

জয়া আর শুরা দুজনেই প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে

তুললো। সাতজন কমিউনিস্টের মৃতদেহ আমাদের মনে দৃঢ় ছাপ রেখে গেল।

আরও একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ছে।

গ্রামের ক্লাবে প্রায়ই ছবি দেখানো হতো। শুরা আর জয়াকে নিয়ে আমি সেখানে যেতাম, কিন্তু আমাদের আকর্ষণ ছিল ছবি ছাড়া অন্য কিছু। সভাঘর লোকে ভর্তি হয়ে গেলেই যে কোন একজন সাইবেরিয় টানে অ-টাকে জোর দিয়ে বলে উঠবে, "একটা গান হ-অ-ক্।" আর অমনি কয়েকজনের গলা শোনা যাবে একসঙ্গে "শুরু কর"।

আর কি চমৎকার সেই গান! পুরোনো সাইবেরিয় গ্রাম্যসংগীত, গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলী নিয়ে গাঁথা গান, যেন মূর্ত হয়ে উঠত। গভীর নিখাদ সুরের সঙ্গে উঁচু সুরের গলা মিলে অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করত, সে সুরলহরী শ্রোতাকে অভিভূত করে তার চোখে এনে দিতো আনন্দের, সহানুভূতির অশ্রু।

জয়া আর শুরাও গানে যোগ দিতো। বিশেষ করে একটা গান আমাব খুব ভাল লাগতো। সবটা মনে না থাকলেও শেষ চার লাইন আমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে থাকবে...

"অবসান হ'ল নিশি...শান্ত সমীরণ বহে ধীরে
বসন্তের আগমনী বারতা নিয়ে।
নির্মল, সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে
শান্তি সেনানী রহে মৃত্যু প্রতীক্ষায়..."

পুরুষ কণ্ঠের গভীর গুঞ্জন শোনা যায়...

"নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে
শান্তি সেনানী রহে মৃত্যু প্রতীক্ষায়।"

প্রথম বিদায়

একটা বছর কেটে গেল। এবারের বসন্তে বন্যা হয় নি. ছেলেমেয়েরা শুনল যে ওদের পালিয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে না। শুনে ওরা নিরাশ হলো। কারণ মনে মনে ওরা খুবই আশা করেছিল. নদীর দুইকূল ছাপিয়ে জল উঠবে. আর ওরা ছোট্ট একটা নৌকা করে পাহাড়ের দিকে ছুটবে কিংবা অসম্ভবের অভিযানে বেরোবে।

পৃথিবী আবার সবুজরঙে সাজল, সবুজ ঘাসের উপর রঙীন ফুলের অপরূপ সমারোহ শুরু হলো। সে মাসে দাদা আর দিদির কাছ থেকে চিঠি পেলাম. তারা মস্কো থেকে লিখেছেন—"তুমি এখানে এসো। এখনকার মতো আমাদের সঙ্গে থেকে তুমি মস্কোতে কাজ আর থাকবার জায়গা জুটিয়ে নিতে পারবে। তোমার জন্য আমাদের বড়ো মন কেমন করে. তোমাকে আমরা আসবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

আমরাও আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্য. আমাদের নিজের এলাকায় ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই স্কুলের টার্ম শেষ হতে হতেই আমরা সাইবেরিয়া ছাড়লাম। আমরা ঠিক করলাম ছেলেমেয়েরা কিছুদিনের জন্য আস্পেন বনে গিয়ে দিদিমা দাদামশায়ের সঙ্গে কাটিয়ে আসবে।

আবার আমরা সর্ষেক্ষেতের ধারে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। গ্রামের পাশের খাঁড়িগুলো, বাগানের ধারে ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা নির্জন উইলো গাছের সারি, লাইলাকঝোপের পাশ দিয়ে বার্চএর তলায় আমার বাবার বাড়ি আবার চোখে পড়লো। আমার এতো পরিচিত এতো আপনার এই দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে বুঝলাম ছেলেমেয়ের জীবনে একটা বছরে কতো না পরিবর্তন হতে পারে। এই বাড়িঘর, পাড়াপড়শী, জানালার ধারের ঐ সবুজ মাঠ, নিশ্চয়ই ওদের মন থেকে এতোদিনে মুছে গিয়েছে, আবার তাদের সঙ্গে নুতন করে পরিচয় করে নিতে হবে ওদের।

দিদিমা বলতে লাগলেন বারে বারেই—"ওরা কতো বড়ো হয়ে গিয়েছে। ওহে সাইবেরিয়া ভূতেরা, আমাকে মনে পড়ে?" ওরা আমাকে আঁকড়ে ধরে—অনিশ্চিতভাবে বললো—"হ্যাঁ দিদা, আছে বইকি।"

শুরা অবিশ্যি খুব শীগগিরই দলে ভিড়ে গেলো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ও বেশ জমিয়ে তুললো।

জয়ার লজ্জা কিন্তু অতো সহজে গেলোনা, আমার পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলো। গরমের ছুটির শেষের দিকে আমরা মস্কো যাবার তোড়জোড় করতে লাগলাম। জয়া তো অবাক হয়ে দুঃখ করে অনুযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করলে—"আমাদের বাদ দিয়ে?"

বিদায় নিতে সবারই খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু উপায় নেই। আমরা ঠিক করেছিলাম, মস্কোতে গিয়ে একটা বাড়ি ভাড়া করে স্থিতি না হওয়া পর্যন্ত ওদের নিয়ে যাবো না। প্রথম বিচ্ছেদ এই আসছে জীবনে, মেনে নিতেই হলো।

এক বছর পরে

খুব চেনা গলায় উৎসাহের সঙ্গে বলছে শোনা গেলো, "জয়া, শুরা কোথায় গেলি তোরা ভাই, শীগগির আয়। মা এসেছে যে!"

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দিদিমা মাভ্রা মিখাইলোভনা বললেন—"তোমাকে আবার কোনদিন দেখতে পাবো সে আশা আমরা যে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েরা তোমাদের জন্য মনমরা হয়ে থাকে। জয়া তো বেশ বড় হয়েছে—তুমি চিনতেই পারবে না। ওরই তোমার জন্য বেশি ভাবনা। ও বলে তুমি হয়তো আর আসবে না।"

আমার দিকে আর মাল নামাচ্ছিলো যে গাড়োয়ান তার দিকে চেয়ে বাবা বললেন—"রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নি তো?"

"না বিশেষ নয়, তবে বৃষ্টি পড়ছিলো, আমি যথাসাধ্য জোরেই ঘোড়াটা চালিয়ে আসছিলাম, আপনার মেয়ে—লিউবভ তিমোফিয়েভনা একটু ভিজেছিল। আচ্ছা—তিমোফি সেমিওনোভিচ, চাঙ্গা হবার জন্য আমাকে একটু কিছু দিতে হবে কিন্তু।"

গাড়োয়ান মালপত্র নামাচ্ছিল। কাছেই দাঁড়িয়েছিল পাড়ারই কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তাদের একজন গেলো জয়া আর শুরাকে ধরে আনতে, দিদিমা চা গরম করে টেবিলে সাজাতে লেগে গেলেন। আর বাকিরা ইতিমধ্যে গাঁময় রাষ্ট্র

করে দিলো, তিমোফি সেমিওনোভিচ্-এর মেয়ে আমাদের গ্রামের স্কুলে যে পড়াতো, মস্কো থেকে এসেছে এইমাত্র। দলে দলে পড়শীরা এসে ভিড় করতে লাগলো।

"আচ্ছা, মস্কোতে কেমন লাগছে? ওখানকার হালচাল কেমন? তোমাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালো আছে? আনাতোলি পেত্রোভিচ্ কেমন আছে? জানো আমরা আজকাল সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করি। আগের মতো নিজের ক্ষেত খামারওয়ালা কৃষক আর বেশি নেই, আমরা প্রায় সবাই এখন সমবায় কৃষি-সমিতি ভুক্ত।"

"কি রকম চলছে?"

"বেশ ভালোই। সকলে মিলে কাজ করলে আমাদের অবস্থা আগের মতো খারাপ হবে না নিশ্চয়।"

এতোসব অবাককাণ্ড ঘটে গেছে যে নূতন করে আর প্রত্যেকটার বেলায় অবাক হবার আর উপায় নেই। সবকিছুই বদলে গিয়েছে। বাড়িতে ঢুকবার আগেই এতো নূতন কথা সব শুনলাম! আস্পেন বনে ট্রাক্টারের কথা এই সেদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র আলোচনাই হতো, আর আজ ট্রাক্টার, এমন কি কম্বাইন পর্যন্ত এসে পেঁাচেছে। প্রথম যেদিন ঐ আশ্চর্য নূতন যন্ত্রগুলো এসে পেঁাছে সেদিন গোটা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিলো দেখার জন্য।

শুনে যাচ্ছিলাম—"কি করে ওরা কাজ করছিল তা দেখবার মতো, ভেবে দেখো দেখি, গোটা মাঠটাকে একদিনে পরিষ্কার করে ফেললো।"

বাবা যেন একটু ঈর্ষার সঙ্গে বললেন—"আরে তোমরা মেয়েটাকে আগে একটু বিশ্রাম করতেই দাও।"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে একজন বললো—"সত্যি তুমি একটু বিশ্রাম করো—লিউবোভ তিমোফিয়েভ্না পরে এসে তোমাকে সব শুনিয়ে যাবো।"

সত্যি কথা বলতে গেলে, আমার এইসব অত্যাশ্চর্য ঘটনার উপর বিশেষ মনযোগ ছিল না। আমি খালি ভাবছিলাম, ছেলেমেয়েরা গেলো কোথায়? এতক্ষণ ধরেও ওদের দেখছি না কেন?

বাগানে গিয়ে দেখলাম এখনও গাছের শাখাগুলো হাওয়ায় কাঁপছে আর সেই কম্পনে ঝরে পড়ছে দুই একটা বৃষ্টিবিন্দু। স্মৃতির গভীরে ডুবে গেলাম আমি—

পুরোনো বাড়িটা ১৯১৭ সালে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর তৈরি এই নূতন বাড়িটাই ছিল গ্রামের সবচেয়ে সেরা। বাইরের কাঠের দেয়ালের গাঢ় রং—জানালার কার্নিশে, ভিতরে গায়ে কুঁদে তোলা নক্শাগুলো, বাড়িটাকে অপরূপ করে তুলেছে। একটা টিলার উপরে বলে বাড়িটাকে বেশ উঁচু বলে মনে হয়, আর সত্যি করে বলতে গেলে দশবারোটা সিঁড়ি উঠলে তবে আমাদের বাড়ির দরজায় পেঁাছানো যায়। গত কয়েক বছরে সামনের বাগানটা এতো সুন্দর বেড়ে উঠেছে যে লাইলাক আর একেসিয়া ঝোপের ভিতর দিয়ে প্রায় ফিকে হয়ে আসা দালানটা নজরেই আসে না। আমার অতি আদরের পপ্লার আর বার্চগুলো আরও লম্বা হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিতে ধুয়ে তাদের চেহারাগুলো আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সূর্য একবার দু'বার উঁকি দিচ্ছেন, তার রামধনুর রাঙা আলো বৃষ্টিবিন্দুর গায়ে পড়ে ঝলমল করে উঠ্ছে।

বছর তেরো আগে আমি নিজে হাতে ঐ লাইলাক আর একেসিয়া ঝোপ-

গুলো জল দিয়ে বাঁচিয়েছিলাম, আর আজ তাদের দেখলে কে বলবে এরাই তারা, কতো বড় হয়েছে. চারদিকে ঘন দেওয়ালের মতো করে বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে, আমিও আর সে আমি নেই. দুই সন্তানের মা আমিও বড় হয়েছি।

আচ্ছা আমার ছেলেমেয়ে গেলো কোথায়? এই যে ওরা! একদল ছেলে রাস্তাটা মাতিয়ে চলেছে তাদের নেতা হলো জয়া, আর বেচারা শুরা পেছনের ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে আনতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

জয়াই প্রথমে আমাকে দেখলো। "মা এসেছে রে! মা এসেছে! বলতে বলতে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমিও ধরলাম খুব জোরে বুকের সঙ্গে পিষে।

এবার শুরার দিকে তাকিয়ে দেখি. একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখে চোখ মিলতেই একটা চারাগাছ ধরে ও প্রাণপণে নাড়া দিতে লাগলো। ডাল থেকে বৃষ্টির ফোঁটা আমাদের মাথায় ঝরে পড়তেই শুরা অপ্রস্তুত হয়ে দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কোলে মুখ লুকালো।

রোদে পোড়া তামাটে রংএর একপাল ছেলেমেয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো, চুলগুলো তাদের কালো কালো. সারা গায়ে আঁচড়ের দাগ। দেখেই বোঝা যায় বেশ শক্তসমর্থ তারা. গাছে উঠতে. সাঁতার কাটতে. দৌড়াতে বেশ অভ্যস্ত। এরা পাড়ারই ছেলেমেয়ে—শুরা পাসিমভ. সানিয়া আর ভলোদিয়া ফিলাতোভ. শুরা কোঝারিনোভা. ওর ছোট ভাই ভাসিয়া য়েঝিক আর ভানিয়া পলিয়ানস্কি সবাই মিলে বেশ সলজ্জ দৃষ্টিতে উৎসুক. প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো।

জয়া বেশ গম্ভীরভাবে বলে দিলো—"মা এসেছে কিনা তাই আমি আর খেলবোনা আজ।"

বাচ্চারা বাগানের গেটের দিকে পা বাড়ালো। জয়া শুরাকে দুই হাতে ধরে বাড়ির ভিতর দিকে গেলাম। দিদিমা আর দাদু খাবার সাজিয়ে বসে আছেন আমাদের জন্য।

ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ যাদের কাছে থাকে তারা ওদের পরিবর্তনটা সহজে বুঝতে পারে না। কিন্তু অনেকদিন পরে দেখার দরুন ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে হলো ওদের কতো পরিবর্তন হয়েছে. সবই যেন নতুন দেখছি. ওদেরও।

জয়া অনেক বড় হয়েছে. বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওর ধূসর রংয়ের চোখগুলো বাদামী মুখে যেন জ্বলজ্বল করছে। শুরা যদিও লম্বায় বেড়ে গায়ে একটু কমেছে, ওর ছয় বছর বয়সের তুলনায় ওর বেশ জোর হয়েছে. কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলতে ওর একটুও কষ্ট হয় না, দিদিমার কাচা কাপড়-ভরা বালতিটাকে ও নদীতে নিয়ে যেতে পারে।

দিদিমা তো শুরার দিকে বেশ গর্বের সঙ্গে তাকিয়ে বললেন—"শুরা তো রীতিমতো ব্যাটাছেলে হয়ে উঠেছে।"

ওরা সারাক্ষণ পিছন পিছন ঘুরে একমুহূর্তেও আমাকে চোখের আড় হ'তে দিল না। আমার দিকে ভর্ৎসার ভংগীতে চেয়ে বলতে লাগলো "আমরা তোমার সঙ্গে যাবো তো? আমাদের আর রেখে যাবে না?"

"বড্ড খারাপ লাগছে বুঝি এখানে?"

"না! কিন্তু তুমি আর বাবা এখানে নেই বড় মন কেমন করে। আমাদের আর এখানে রেখে যেও না মা। বলো রেখে যাবে না—নিয়ে যাবে বলো না?"

শীতকালে জয়া আর শুরার স্কার্লেট জ্বর হয়েছিল। তিন মাস ধরে কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশতে ওদের দেওয়া হয় নি। খালি দিদিমা আর দাদুর সঙ্গে থাকতো, আর কিরকম সব বুড়োদের মতো কথা বলতে শিখেছে? বুড়োদের মতো বিজ্ঞভাবে জয়াকে কথা বলতে শুনলে কি মজাই না লাগতো। পাশের বাড়িতে ছেলেদের গম্ভীরভাবে জয়া বললো—"ছোট ছেলেদের সিগারেট খেতে নেই। বাড়িতে আগুন না লাগিয়ে তোমাদের আশ মিটছে না বুঝি?"

আর একবার তার বন্ধুকে বলছে শুনতে পেলাম—"পারানিয়া, গেঁয়ো লোকদের মতো কথা বলছো কেন? বড়োদের মতো কথা বলতে শেখনি বুঝি?"

শুরা একটা কাপ ভেঙে ফেলে একবার স্বীকার করে নি। জয়া তো ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে উঠলো, "সত্যি কথা বলছো না কেন? মিথ্যে কথা কখনও বলা উচিত নয়।" তার আট বছরের জীবনের যতোটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই দিয়ে শুরাকে বকে দিল।

গ্রীষ্মকালটা আমরা একসঙ্গে কাটালাম। মাঠে বেড়াতে যেতাম একসঙ্গে, ছোট নদী থেকে জল এনে দিদিমার কাজে সাহায্য করতাম, ঘুমাতাম পাশাপাশি, তবুও আমাদের সমস্ত কথা যেন বলা হলো না। জয়া জিজ্ঞেস করলো, "এবার শরৎকালে আমি মস্কোর স্কুলে ভর্তি হবো বুঝি? আমার বাজে পড়া নিয়ে ঠাট্টা করবে না তো? ওরা ক্ষ্যাপাবে না—দেখ দেখ একটা গেঁয়ো ভূত এসেছে, শোনো শোনো কিরকম করে পড়ছে। তুমি কিন্তু মা ওদের বলে দিও, গোটা শীতকালটা ধরে আমি অসুখে ভুগেছি, ভুলো না যেন? কেমন?"

শুরা বললো—"আমিও স্কুলে যাবো। আমি একলা থাকবো কেন? আমি জয়ার সংগে যাবো।"

ওদের বন্ধুত্ব যেন আরও দৃঢ় হয়েছে। আগেও অবিশ্যি একজনের বিরুদ্ধে আর একজন নালিশ করতো না এখন তাদের সব ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে একজন আর একজনকে সাহায্য করতে সর্বদাই তৈরি।

দিদিমা আমায় গল্পটা বলেছিলেন—আমি আসবার অল্প কয়েকদিন আগে ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌদি আস্পেন বনে বেড়াতে এসেছিলেন। দিনগুলো ছিল যেমনি গরম, রাতগুলো তেমনি গুমোট। ব্যবস্থা হলো আনা ভ্লাদিমিরোভনা আর তার ছেলেমেয়েরা খড়ের চালের তলায় ঘুমাবেন। জয়া আর শুরাও ওদের সঙ্গে ঘুমাতে গেল। হঠাৎ শুরার মনে হলো অতিথিদের ভয় দেখালে বেশ মজা হয়! ও ধারে ঘুমাচ্ছিল, কাজেই মাথাটা ঢেকে চুপিচুপি খড়ের গাদার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভংগ করে বিস্ময়জনক এক হিস্ হিস্ শব্দ শোনা গেল—নীনা ভয় পেয়ে চুপি চুপি বললো—"মা শুনতে পাচ্ছো? সাপ ডাকছে?"

"কি বাজে বক্‌ছো? কক্ষনো না!"

শুরা তো সশব্দে হেসে উঠলো—তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শব্দ করে উঠলো। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আনিয়ামামী বলে দিলেন কঠিনভাবে—"শুরা আমাদের ঘুমোতে দিচ্ছ না—তোমার ঘরে চলে যাও, সেখানে গিয়ে যতো খুশি হিস্ হিস্ করোগে।"

শুরা লক্ষ্মীছেলের মতো তার কথা শুনে বাড়ি চলে গেল, জয়াও উঠে পড়লো।

"জয়া, কোথায় যাচ্ছো? তুমি এখানে থাকো।"

"না, শুরাকে আপনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমিও আর থাকবো না এখানে—" জয়া জবাব দিল।

সর্বদাই এরকম চলতো। একজন আর একজনের পক্ষে দাঁড়াতে সবসময়ই প্রস্তুত। তাতে কিন্তু জয়া বকলে শুরাও প্রাণপণে চেঁচিয়ে জয়াকে বকতে কোন বাধা ছিল না—"চলে যাও এখান থেকে—আমাকে একলা থাকতে দাও। আমার যা খুশি তাই করবো!"

"না তা হবে না। আমি তা করতে দেব না"—জয়া বেশ শান্তভাবেই জবাব দিত।

পুনর্মিলন

আগস্টের শেষে আমরা মস্কো পেঁছলাম। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ স্টেশনে দেখা করতে এলেন। গাড়ি থামতেই ওরা সবার আগে লাফিয়ে পড়ে ওদের বাবার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মাঝপথে, বাবাকে ওরা পুরো একবৎসর দেখে নি, কাজেই ওদের লজ্জা করছিল।

স্বভাবতই তিনি সংযত, কিন্তু আনাতোলি ওদের অবস্থাটা বুঝলেন, ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে, চুলে হাত বুলিয়ে যেন কালকেই ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে এমনি সুরে বলতে লাগলেন—"আচ্ছা এইবার আমি তোমাদের মস্কো দেখাবো, দেখি আমাদের আস্পেন বনের চেয়ে এটা ভালো কি মন্দ।"

আমরা একটা ট্রামে উঠে পড়লাম, কি চমৎকার অভিজ্ঞতা। ট্রামে করে আমরা মস্কোর রাজপথ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলাম। উঁচু উঁচু বাড়ি, কত মোটর গাড়ি, তাড়াতাড়ি হেঁটে চলা পথিকের দল, সবাইকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম। জানালার ভিতর দিয়ে নাক গলিয়ে শিশুরা সবকিছু দেখছিল, এতো লোক দেখে শুরা তো বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব। ও চেঁচিয়ে উঠলো, "ওরা সবাই কোথায় যাচ্ছে? কোথায় ওরা থাকে? এতো লোক কোথেকে এলো?" ট্রামযাত্রীরা মৃদু মৃদু হাসছিল। জয়া চুপচাপ থাকলেও ওর মুখেও অধীর আগ্রহের ভাব ফুটে উঠছিল ঃ তাড়াতাড়িই আমরা সব শিখে ফেলবো। এই নূতন আর বিরাট শহরটি সম্বন্ধে সবকিছু জানতে হবে!

অবশেষে আমরা মস্কোর শহরতলীতে এসে পেঁছলাম। তিমিরিয়াজেভ কৃষি কলেজের কাছেই একটা ছোট বাড়ির তিনতলায় একটা ছোট ঘরে এসে আমরা ঢুকলাম। ঘরে একটা টেবিল, বিছানাপত্র, একটা ছোট জানালা—এই আমাদের বাড়ি।

...মানুষের জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির মধ্যে সন্তানকে প্রথম স্কুলে নিয়ে যাওয়ার দিনটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। বোধহয় সব মায়েদেরই এই দিনটির কথা মনে থাকে, আমারও আছে। ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর—দিনটা বেশ পরিষ্কার, আকাশে মেঘ ছিল না। তিমিরিয়াজেভ কলেজের গাছ-

গুলো সোনালী হয়ে উঠেছে। আমাদের পায়ের তলায় শুকনো পাতার মর্মর শব্দ, সে শব্দে যেন বিস্ময় আর আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে, ওরা যেন বলতে চাইছে এখন থেকে আমার ছেলেমেয়েরা এক নূতন জীবনে প্রবেশ করলো।

ওদের আমি হাত ধরে নিয়ে চললাম। ওরা বেশ গম্ভীর, চিন্তিত, আর একটা ভীতুভাবে চলতে লাগলো। জয়ার খোলা হাতে একটা স্কুলব্যাগ, তাতে আছে বর্ণপরিচয়, লাইনটানা খাতা, চৌখুপীকাটা অংকখাতা, একবাক্স পেনসিল। ঐ চমৎকার বাক্সটা নেবার জন্য শুরার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বয়সের দাবিতে জয়াই ব্যাগটা পেলো। আর তেরো দিন পরেই জয়ার বয়স আট বৎসর পূর্ণ হবে আর শুরার এখনও মাত্র সাত বৎসর হয় নি।

স্কুলে যাওয়ার পক্ষে শুরা খুবই ছোট, তা হলেও আমরা ওকে স্কুলে পাঠানোই ঠিক করেছিলাম। কারণ সারাক্ষণ জয়ার সঙ্গে থেকে ওর এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে জয়া স্কুলে গেলে আর ও বাড়িতে একা থাকলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে শুরা তা ভেবেই পাচ্ছে না, তার উপর আনাতোলি পেত্রোভিচ্ আর আমি দুজনেই কাজ করি ; ওর সঙ্গে কে থাকবে তাহলে দিনের বেলা?

আমার ছেলেমেয়ের প্রথম শিক্ষিকা হলাম আমি। প্রাথমিক বিভাগের ভার আমার ওপর থাকায় স্কুলের অধ্যক্ষা আমার কাছে ওদের পাঠিয়ে দিলেন।

আমার ক্লাশে ঢুকতেই, আমার ছেলেমেয়ের বয়সী ত্রিশটি ছেলেমেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলো। জয়া আর শুরাকে বোর্ডের কাছাকাছি একই বেঞ্চে বসিয়ে দিয়ে পড়ানো আরম্ভ করলাম।

বেশ মনে আছে, প্রথমদিকে একটি ছেলের মাথায় কি খেয়াল চাপলো, জয়ার চারিদিকে একপায়ে লাফাতে লাফাতে ও ছড়া কাটতে লাগলো—জয়া জয়া রোগা পটপট ডাস্টবিনে পড়ে জয়া করে ছট্‌ফট। বেশ মজা করেই ও ছড়াটা বারবার আবৃত্তি করতে লাগলো, জয়া খুব শান্তভাবে একটুও উত্তেজিত না হয়ে শুনলো, তারপরে ওই ছেলেটা হাঁপিয়ে ওঠে একটু দম নেওয়ার জন্য থেমেছে, জয়া বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে বললো—"তুমি যে এতো বোকা তা তো জানতাম না।"

ছেলেটা একটু যেন চিন্তিত হয়ে পড়ার ভাব দেখালো, আরও বারকয়েক তার ছড়া আবৃত্তি করলো, তবে আর যেন সেই উৎসাহ ছিল না, খানিক পরে একেবারেই চুপ করে গেল।

একবার, তখন জয়া ছিল মনিটার, একটা জানালার কাঁচ কে যেন ভেঙে ফেললো। দোষীকে শাস্তি দেবার আমার উদ্দেশ্য ছিল না—কারণ জীবনে একবারও জানালার শার্শি ভাঙে নি এমন লোকের দেখা পাব কিনা সে বিষয়ে আমার বেশ সন্দেহ আছে। তাহলে ছেলেবেলার মাধুর্য থাকে না। শুরা তো আমার পরিচিত যে কোন ছেলেমেয়েদের থেকে অনেক বেশি কাচ ভেঙেছে।

আমি একেবারেই ক্লাশে না ঢুকে দালানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম কি করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলবো, হয়তো বা দোষী নিজেই দোষ স্বীকার করবে। এমন সময় জয়ার গলা শোনা গেল—

"এটা কে ভেঙেছে?"

একটু উঁকি মেরে ক্লাশের ভিতরে দেখলাম—জয়া একটা উঁচু চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আছে আর ছাত্রছাত্রীরা সব গোল হয়ে ওর চারদিকে ভিড় করে আছে।

"কে ভেঙেছে, বলো শীগগির, আমি কিন্তু চোখ দেখেই বলে দিতে পারি কে ভেঙেছে?" দৃঢ় গলায় জয়া বলে উঠলো।

অল্প কিছুক্ষণ নীরবতার পর ফোলা ফোলা গাল আর খ্যাঁদা নাকওয়ালা, ক্লাশের দুষ্টুশিরোমণিদের একজন কাছে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "আমি"।

ও হয়তো বিশ্বাস করেছিল, জয়া সত্যিই ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারবে। যে ভাবে জয়া কথাগুলো বলেছিল তাতে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়াই উচিত। আসলে কিন্তু এর পিছনে আছে ছোট্ট একটু কাহিনী। যখনই ছেলেমেয়েরা কোন অন্যায় কাজ করতো, দিদিমা মাদ্রো মিখাইভ্না বলতেন, "বলো দেখি কে করেছে এটা? তোমাদের চোখের দিকে তাকিয়েই বলতে পারি, কে এটা করেছে।" দিদিমার সত্য আবিষ্কার করার সেই চমৎকার উপায়টা জয়া মনে রেখেছিল।

জয়া আর শুরাকে শীগগিরই অন্য ক্লাশে বদলি করে দেওয়া হলো। তার একটু কারণও ছিল।

জয়ার ব্যবহার ছিল খুব সংযত, আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করতো না. এমনকি কখনও কখনও ক্লাশে আমাকে লিউবোভ তিমোফিয়েভ্না বলে ডেকে দেখাতে চাইতো অন্যদেরও যেমন তারও তেমন আমি শিক্ষিকা আর অন্যরাও যেমন. সেও তেমনি ছাত্রীমাত্র। কিন্তু শুরার ব্যবহার একেবারেই উল্টো, পড়ানোর সময় মিনিটখানেক চুপ করে থেকে হয়তো সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতো "মা" বলে তার সংগে থাকতো একটু দুষ্টুমির হাসি। শুরার মজাদাব ব্যবহারে ক্লাশে কিছু অপ্রস্তুতভাব সৃষ্টি হতো। কোথায় শিক্ষিকা লিউবোভ তিমোফি-য়েভনা আর কোথায় একেবারে "মা"। ছেলেদের বেজায় মজা লাগতো। কিন্তু তাদের কাজের ব্যাঘাত হতো। তাই একমাস পরে আমার ছেলেমেয়েকে অন্য কোনখানে বদলি করে দিলাম।

স্কুল আর স্কুলের কাজে জয়া একেবারে ডুবে গেল। স্কুল থেকে ফিরে কিছু খেয়েই সে পড়তে বসতো। এ ব্যাপারে তাকে মনে করিয়ে দিতে হয় নি একদিনও। সব থেকে দরকারী. আর চিত্তাকর্ষক বিষয় যা তার মনকে এখন অধি-কার করেছিল, সে হলো পড়াশোনা। প্রত্যেকটা অক্ষর ও সংখ্যা সে খুব যত্ন করে লিখতো. বই খাতা এমন সাবধানে আদরে নাড়াচাড়া করতো. যেন সেগুলি জীবন্ত।

ওরা দুজনে পড়াশোনা করতে বসলেই জয়া কড়া সুরে জিজ্ঞেস করতো— "শুরা, তোমার হাতগুলো বেশ পরিষ্কার তো?"

প্রথমে শুরা বিদ্রোহ করতে চাইতো—"তাতে তোমার কি? আমাকে ঘাঁটিয়ো না বলছি।"

কিন্তু এরপরে শুরাকে হার মানতেই হলো। বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করার আগে ও গিয়ে হাত পা ভালো করে ধুয়ে আসতে. আর, মনে করিযে দিতে হতো না। সাবধানতার সত্যিই দরকার ছিল। শুরা বন্ধুদের সংগে খেলা করে বাড়ি ফিরতো পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাদা মেখে। কখনও কখনও এমন ভূত সেজে আসতো যে কল্পনা করতেই পারতাম না কি করে এরকম চেহারা হলো ওর। ও কি প্রথমে বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে, পরে গায়ে কয়লা ঘষে, চুণের গামলায় ডুব দিয়ে, ইঁটের গুড়োর পাউডার মেখে এমনটি করেছে?

ওরা খাবার টেবিলে বসে পড়াশোনা করতো। জয়া তো বই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো, শুরার বরাদ্দ ছিল আধঘণ্টা মাত্র। তারই মধ্যে বারে

হারে নিঃশ্বাস ফেলে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখতো—কতক্ষণে বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা শুরা কতকগুলি ইঁট আর দেশলাই-এর বাক্স দিয়ে টেবিলের আধখানায় একখানা দেয়াল বানিয়ে দিলো। জয়াকে বলে দিলো—"ওই অর্ধেকটা তোমার আর অর্ধেকটা আমার। দেখো যেন আমার অর্ধেকটায় পা দিও না।"

জয়া হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলো—"আর বর্ণপরিচয় আর কালির দোয়াতের কি হবে?"

শুরা অতো সহজে দমবার পাত্র নয়, "তুমি বর্ণপরিচয় নিয়ে যাও, আমি কালির দোয়াত নিচ্ছি।"

জয়া খুব জোরে ধমকে উঠলো—"থামাও তোমার খেলা—" বলে তাড়াতাড়ি করে ইঁটগুলো টেবিল থেকে সরিয়ে নিল।

কিন্তু খেলা ছাড়া, মজা ছাড়া পড়া তৈরি করা শুরার কুষ্ঠিতে লেখেনি, বাড়িতে পড়া তৈরির কাজগুলোকেও ও খেলা বানিয়ে ফেলতো। কি আর করা যাবে, মোটে ছয় বছরের শিশু তো!

একটা ছুটির দিন

৭ই নভেম্বর ছিল অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকী। দিনের আলো ফুটবার আগেই শিশুরা ঘুম থেকে উঠে পড়লো। বাবা ওদের মিছিল দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছেন, ওরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে এই দিনটির জন্য।

সময়মতো ওরা সকালের খাবার খেয়ে নিলো। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ দাড়ি কামাতে বসলেন। ওরা কিছুতেই আর অপেক্ষা করতে পারছিল না, মিছিমিছি ওরা চেষ্টা করলো যেন কোন কিছু নিয়ে ভুলে থাকতে পারে।

অবশেষে কোট গায়ে দিয়ে আমরা এসে রাস্তায় পা দিলাম। জোরে বাতাস বইছিলো, অল্প অল্প বৃষ্টির সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছিলো। দিনটা মোটেই ভালো নয়, কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই উৎসবের সাড়া পেলাম—গান, বাজনা, কথাবার্তা, হাসির রোল। যতো শহরের কাছাকাছি এলাম ততোই উৎসবের গোলমাল যেন আরও বেড়ে উঠতে লাগলো। ভাগ্য ভালো যে, বৃষ্টি শীগগিরই থেমে গেলো—ধূসর আকাশের চেহারা দেখার মতো মনের অবস্থা না ছিল বুড়োদের, না ছিল ছেলেদের, অসংখ্য সোনালী লাল চকচকে উজ্জ্বল সব রঙীন নিশান উড়ছিল।

প্রথম মিছিলটা দেখেই জয়া আর শুরা খুশিতে একেবারে উচ্ছল হয়ে উঠলো, মিছিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা আর থামলো না। প্রত্যেকটা ফেস্টুনের লেখা ওরা পড়ে ফেললো—শব্দগুলি অবশ্য ওদের দাঁতভাঙা ছিল, তাতে কি হয়! প্রত্যেকটা কোরাসে যোগ দিয়ে প্রত্যেকটা ব্যান্ডের তালে তালে নাচতে লাগলো। ওরা খালি হাঁটছিল না, আনন্দের বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল যেন, খুশিতে উজ্জ্বল মুখ, চকচকে চোখ, ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখার দরুন তাদের টুপি-গুলো পড়ে যাচ্ছিল, কথার বদলে খালি খুশির চিৎকার।

"দেখো দেখো! কী সুন্দর, কি চমৎকার তারাটা, আরে ঐ যে বেলুন উড়ে যাচ্ছে, এইযে এবার দেখো দেখি!"

রেড স্কোয়ারে ওরা যেন একটু চুপ হলো, ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে স্মৃতি-মন্দিরটা দেখার পর চোখ যেন আর ফিরতে চায় না তাদের।

কেন জানি না বেশ ফিস ফিস করে শুরা বললো—"মা ওখানে কে আছে? স্তালিন আছেন বুঝি? ভরোশিলভ আর বুদিয়ানি—" বলতে বলতে শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরলো।

এই "রেড স্কোয়ার"—শব্দটার সঙ্গে কতো ভাবনা, কতো না ভালোবাসা জড়িয়ে আছে? আস্পেন বনে থাকতে কবে আমরা রেড স্কোয়ার দেখবো সেই স্বপ্নটা দেখতাম, এটা যে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস। এক বছর আগে মস্কো এসে আমি একবার এখানে এসেছিলাম। এর কথা এতো শুনেছি এতো পড়েছি, তবু কিন্তু ভাবিনি কখনও যে এই রেড স্কোয়ার এতো সাধাসিধা অথচ এতো গৌরবময়। এখন এই মুহূর্তে একে যেন আমি নূতন করে দেখলাম।

ক্রেমলিনের ফোকরওয়ালা দেয়ালের ভিতর দিয়ে, শোকাতুর, নিস্তব্ধ ঝাউ-গাছের তলায় বিপ্লবের শহীদদের সমাধির পাশে, প্রস্তরফলকে লেখা অবিস্মরণীয় সেই নাম "লেনিন" জ্বলজ্বল করছে দেখতে পেলাম। স্মৃতি-সৌধের সাদামাটা দেয়ালগুলির ভিতরে ক্রমাগত লোকের আসা যাওয়া চলছে। মনে হলো, জগতের অতো শ্রদ্ধা, আশা, প্রেম, সব যেন মূর্ত হয়ে অবিরাম জলস্রোতের মতো প্রবেশ করছে এই পথে—নির্দেশ দিচ্ছে ভবিষ্যতের পথের।

আমাদের দিক থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠলো—কমরেড স্তালিন—জিন্দাবাদ।

জোসেফ স্তালিন হেসে হাত নাড়লেন। সারা পার্কটা জুড়ে জয়ধ্বনি উঠলো। শুরাও আমার পাশে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলো, জয়া বাবার হাতটা শক্ত করে ধরে এতো জোরে তার হাত নাড়তে আর চেঁচাতে লাগলো—যেন মনে হলো ওরা স্মৃতিসৌধের উপর থেকে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে ওর গলা।

আমরা বাঁধের কাছে গেলাম। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দিলো আর ক্রেমলিন-এর প্রাসাদ চূড়ায় তার গম্বুজের ছায়া নদীর জলে পড়ে সোনালী রঙে ঝিকমিক করে উঠলো। পুলের কাছে একটা বেলুনওয়ালাকে দেখতে পেয়ে আনাতোলি পেত্রোভিচ তিনটে লাল আর দুটো সবুজ বেলুন কিনে আনলেন। একটা জয়াকে আর একটা শুরাকে দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"বাকিগুলো দিয়ে কি হবে?"

জয়া চেঁচিয়ে উঠলো—"ওদের উড়িয়ে দাও।"

আমরা হাঁটতে হাঁটতে আনাতোলি একটার পর একটা বেলুন ছাড়তে লাগলেন, বেশ আস্তে আস্তে তারা উপরে উঠতে লাগলো—জয়া আর শুরা চেঁচিয়ে উঠলো—"এসো আমরা ওদের উড়তে দেখি।"

আরও শিশু আর বড়রাও দাঁড়িয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ ধরে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে আমরা চেয়ে রইলাম আকাশের দিকে। চকচকে উজ্জ্বল রঙ্-এর বন্ধন-মুক্ত বেলুনগুলো উপরে উঠতে লাগলো—ক্রমে ছোট আরও ছোট হয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলো।

আমাদের বিকেল বেলা

কয়েকবছর আগে কোন একজন পিতার একখানি চিঠি আমি পড়েছিলাম। সেই পিতা সারাজীবন তার ছেলেমেয়েদের মানুষ করার চেষ্টায় সময় এবং পরিশ্রম নষ্ট করে শেষজীবনে বুঝতে পারলেন—তিনি তাদের মানুষ করতে পারেননি। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি প্রশ্ন করেছেন—"আমার ত্রুটি কোথায় ?" তাঁর এবার মনে পড়েছে—ছেলেমেয়ের ঝগড়ায় তিনি ওদের ব্যাপার ওরাই মিটিয়ে নেবে মনে করে হাত দেননি যা ওরা নিজেরাই করতে পারতো তা তিনি করে দিয়েছেন। উপহার আনার সময় "তোমাদের জন্য এটা এনেছি" না বলে বলেছেন "এটা তোমার" "এটা ওর", মিথ্যা আর অসাবধানতা প্রায় সময়ই ক্ষমা করেছেন, আবার খুব সামান্য ব্যাপারেই তাদের উপর বিরক্ত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"যে সময়টাতে স্বার্থপরতা আর দুরূহ কাজ এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ওদের মনে বাসা বেঁধেছে, সেই মুহূর্তটাই আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। সামান্য সামান্য ব্যাপারই পরিণামে অনিষ্টকর হয়েছে, আমার ছেলেমেয়েরা আমার পছন্দমতো তৈরি হয়নি, তারা হয়েছে অভদ্র, স্বার্থপর, অলস, তারা একজন আর একজনের ছায়া মাড়াতে পারে না।"

চিঠির শেষে তিনি প্রশ্ন করেছেন—"এখন আমার কিছু করা উচিত ? সমাজ বা সমবায় সমিতির হাতে ছেড়ে দেবো তাদের ভার ? কিন্তু আর একটা বিষয়ও তো ভাববার আছে। প্রথম কথা—সমবায় সমিতির অনেকটা সময় ও পরিশ্রম আমার ভুল শোধরানোর কাজে নষ্ট হবে, দ্বিতীয় কথা আমার ছেলেরা জীবনে কোন উন্নতি করতে পারবে না, তৃতীয় কথা হলো—কেন আমি ব্যর্থ হলাম ? কি আমার অপরাধ ?"

আমাদের বেশ বড়ো সংবাদপত্র, বোধ হয় প্রাভদায় এই চিঠিটা বার হয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে ঐ দুঃখপূর্ণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলাম।

আনাতোলি পেত্রোভিচ বেশ ভালো শিক্ষাদাতা। ছেলেদের অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিতে বা বকুনি দিতে তাঁকে আমি কখনও দেখিনি। নিজের চরিত্র, কাজকর্মের প্রতি তাঁর নিজের মনযোগ নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাতে আমার মনে হয়েছে সত্যিকারের শিক্ষা তাকেই বলে।

প্রায়ই শুনতে পাই—"আমার এতো কাজ, ছেলেমেয়েদের জন্য মন দেবার সময় কোথায় ?" অনেক সময় ভেবেছি—নিজের ছেলেমেয়েদের শেখাবার জন্য সত্যি করে বিশেষ সময় দেবার প্রয়োজন। আনাতোলি পেত্রোভিচ আমাকে শিখিয়েছেন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শেখাবার আছে—তা সে কাজ হোক, কথা হোক, আর তোমার চোখের দৃষ্টিই হোক, সর্বত্রই ছেলেমেয়েদের কিছু না কিছু শেখার আছে। কাজের সময়, বিশ্রামের সময়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলার সময়, অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে কথা বলার বেলা, সুখে, অসুখে তোমার ব্যবহারে, দুঃখে আনন্দে, ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে অনুকরণ করতে শেখে। ওদের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্নদৃষ্টি সারাক্ষণ সম্পদে বিপদে উপদেশ আদেশের জন্য অপেক্ষা করে আছে—একথা ভুলে গেলে চলবে না। কেবলমাত্র খাওয়ানো পরানো ছাড়া যে ছেলে একা একা "মানুষ" হয়, তাকে যতোই কেন না দামী খেলনা, ছুটির দিনের বেড়ানো, নীরস যুক্তিতর্ক দাও, সে ছেলের শিক্ষা

সম্পূর্ণ হয় না। সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকতে হবে, না থাকলেও সে যেন বোঝে বাবা মা-র স্নেহদৃষ্টি সারাক্ষণ সজাগ, কখনও যেন এ সন্দেহ তার মনে না জাগে—তাকে অবহেলা করা হচ্ছে, তার প্রতি তোমার কর্তব্যের ত্রুটি হচ্ছে।

আমরা দুজনে তো সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে থাকতাম। ওদের দেখার মতো সময় মোটেই আমাদের ছিল না। স্কুলে পড়াতে পড়াতে আমি শিক্ষণ শিক্ষার ট্রেনিং নিচ্ছিলাম। আনাতোলি পেত্রোভিচ্ তিমিরিয়াজেভ্ একাডেমীতে পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কোন শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করার জন্য শর্টহ্যান্ড শিখছিলেন, এটা তাঁর চিরদিনের স্বপ্ন। তাই, প্রায়ই আমরা এতো দেরি করে বাড়ি ফিরতাম যে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়তো। তা সত্ত্বেও ছুটির সময় কিংবা কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময়টা আমরা একসঙ্গে প্রচুর আনন্দে কাটাতাম।

আমরা বাড়ির দরজায় পা দিতে না দিতেই ওরা দৌড়ে এসে ওদের সারা-দিনের কাজকর্মের খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে শুরু করতো। সবগুলো বেশ গুছিয়ে শোনা বা বলা হতো না যদিও, তার মধ্যে আবেগ আব আওয়াজ ছিল প্রচুর। 'আকুলিনা বোরিসোভ্নার কুকুরের বাচ্চাটা খাবারের আলমারিতে ঢুকে ঝোলের বাটি-উল্টে ফেলে দিয়েছে! আমার কবিতাটা শেখা হয়ে গিয়েছে! জয়া আবার আমার পেছনে লেগেছে! হ্যাঁ, লেগেছিই তো, ও কেন অংক করেনি? দেখো দেখি আমরা কেমন ছবিটা কেটে নিয়েছি। বেশ দেখতে না? কুকুরছানাকে শেখালাম কি করে চাইতে হয়, প্রায় শিখে ফেলেছে!"

কি করে কি হলো তা আনাতোলি পেত্রোভিচ্ খুব চট করে ধরে ফেলতে পারতেন। কেন অংকগুলো করা হয়নি তার আবিষ্কার করতেন, জয়ার লেখা কবিতা মন দিয়ে শুনতেন, বাচ্চা কুকুরটার কথা জিজ্ঞেস করতেন। তারপর হয়তো হঠাৎ বলে ফেললেন—"খোকন, তোমার কথাবার্তা মোটেই ভদ্র নয়। 'জয়া আমার পেছনে লেগেছে' এ আবার কি রকম কথা হলো? এরকম কথা বলা আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

খাওয়াদাওয়ার পরে বাসন-কোসন, রান্নাঘর পরিষ্কার করার ব্যাপারে শিশুরা আমাকে সাহায্য করতো, আর তারপর আসতো আমাদের বহুপ্রতীক্ষিত সন্ধ্যা।

মনে হবে, বিশেষ করে প্রতীক্ষা করার মতো কিইবা ঘটেছে, সব কিছুই তো সাধারণ ব্যাপারের মতো রোজ ঘটছে। সেই আনাতোলি পেত্রোভিচ্-এর নোট-বইয়ে চোখ বুলিয়ে যাওয়া, আমার আগামীদিনের পড়া তৈরি, আর জয়া শুরার ড্রয়িংখাতা সামনে রেখে আলোচনা। আমাদের পড়ার টেবিলের উপরটা ছাড়া সবটা ঘরই অন্ধকার, শব্দের মধ্যে কেবল শুরার বসা চেয়ারটার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ আর তাদের ড্রয়িং বইয়ের পাতা ওলটানোর খসখসানি।

জয়া সবুজ উঁচু ছাদওয়ালা বাড়ি আঁকছিল। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে, কাছেই একটা আপেল গাছে ফুটবলের মতো বড়ো বড়ো আপেল ফলেছে, এখানে সেখানে পাখি, ফুল, আকাশে সূর্যের কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড পাঁচমুখো তারা। শুরার এলবামের পাতায় পাতায় ঘোড়া, গরু, মোটর, এরোপ্লেন, বিমানবাহী জাহাজ, এইসব দিয়ে ভর্তি, শুরার হাতে পেন্সিল কখনও কাঁপে না, তার আঁকা স্পষ্ট আর সুন্দর, তখনই আমার মনে হলো ড্রয়িং-এ শুরার সহজাত পটুত্ব আছে।

আমরা সকলেই চুপচাপ যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, এইবার আনাতোলি

পেত্রোভিচ্ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"এসো এবার বিশ্রাম করা যাক।" তার মানে এবার আমরা হয় খেলা না হয় আর কিছু করবো। প্রায়ই আমরা 'ডামনো' খেলতাম জয়া আর তার বাবা একদিকে আমি আর শুরা একদিকে। শুরা প্রত্যেকটা চাল খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতো। মেজাজ গরম হয়ে উঠলে ঝগড়া করতো, বাজি হারতে আরম্ভ করলেই কেঁদে ফেলতো। জয়াও অবশ্য উত্তেজিত হয়ে উঠতো, তবে নিঃশব্দে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে...

কখনও কখনও আমরা "উঁচুনীচু" খেলা খেলতাম। তার মানে কেবলমাত্র পাশার দানের উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করছে। রঙচঙে বোর্ডের উপর গোলের দিকে যেখানে এরোপ্লেন আঁকা আছে, ভাগ্যবানের ঘুঁটি তার উপর গিয়ে পড়লে জিত, আর ঘুঁটি কাত হয়ে পড়ে গেলে হার। সোজা বটে, তবে খুব মনমাতানো। ঘুঁটি উড়ে দশবারোটা চৌখুপী পার হয়ে এরোপ্লেনের মাথায় গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা কি জোরে যে হাততালি দিয়ে উঠতো!

আর একটা খেলার উপর জয়া শুরার খুব টান ছিল, আমরা তার নাম দিয়েছিলাম, "হিজিবিজি"—জয়া কিংবা শুরা যে কোন রকমের কিছু "হিজি-বিজি" এঁকে দিতো, তা সে হয়তো বা সোজা লাইন, না হয় বাঁকা, না হয় শুধুই কয়েকটা তাল-গোল—আমাকে সেগুলো দিয়ে নানারকম ছবির নক্সা আঁকতে হতো।

হয়তো শুরা একটা লম্বাটে ধরনের ডিম আঁকল, আমি এটার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভেবে নিলাম, তারপর তার সঙ্গে জুড়ে দিলাম পাখনা, লেজ, চোখ, আঁশ.—শিশুরা চেঁচিয়ে উঠলো—"মাছ, মাছ।"

জয়া হয়তো শুধু কালির ফোঁটা ফেলে দিল—আমি তাকে সুন্দর হাল্কা বেগুনি রঙ্-এর একটি চন্দ্রমল্লিকা ফুল বানিয়ে দিলাম।

শিশুরা একটু বড় হয়ে উঠলে আমরা বদলাবদলি করে নিলাম, আমি দিতাম "হিজিবিজির" নক্সা আর ওরা তা থেকে ছবি বার করতো। শুরার কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ, ও সামান্য সামান্য "হিজিবিজি" থেকে অসামান্য ছবি আবিষ্কার করতো। ছোট্ট একটা গোল্লা থেকে ছোট্ট গম্বুজ, কয়েকটা বিন্দু থেকে মুখ—একটা বাঁকা লাইন থেকে হয়তো একটা ডালপালাওয়ালা গাছই এঁকে ফেললো।

এটা কিন্তু যেমনি চিত্তাকর্ষক তেমনি প্রয়োজনীয় খেলা। এর সাহায্যে কল্পনাশক্তি, খেয়াল আর পর্যবেক্ষণশক্তির বিকাশ হয়।

সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল আনাতোলি পেত্রোভিচের গীটার বাজনা। তিনি কিরকম যে বাজাতেন, ভালো কি মন্দ, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই, কিন্তু তিনি যখন একটার পর একটা রাশিয়ান সুর বাজিয়ে যেতেন আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম, সময় জ্ঞান থাকতো না আমাদের।

এরকম স্মরণীয় সন্ধ্যা আমাদের রোজ আসতো না, কিন্তু তা হলে কি হয়, এই কয়েকটাই আমাদের অন্য দিনগুলোকে মধুময় করে তুলতো। এই সময়ের একটি শক্ত কথা, একটি মন্তব্য আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে গাঁথা হয়ে থাকতো, প্রশংসা বা আদর ওদের অত্যন্ত খুশি করতো।

একবার আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বললেন—"শুরা তুমি নিজে সব থেকে ভালো চেয়ারখানা নিয়ে মা-র জন্য ভাঙা নোংরাটা রেখেছ যে—"এর পর থেকে

শুরাকে আর কখনও নিজের জন্য ভালো জিনিস নিয়ে অন্যের জন্য খারাপটা রেখে দিতে দেখিনি।

একদিন আনাতোলি পেত্রোভিচ্ অন্যদিনের চেয়ে গম্ভীর মুখ করে ওদের সামনে এলেন. শুরাকে জিজ্ঞেস করলেন—"আনিউতা স্তেপানোভাকে মেরেছ কেন আজ?"

অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে শুরা বললো—"ও এতো ভীতু!"

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ কঠোর স্বরে বললেন—"খবরদার, আর যেন আমাকে এরকম শুনতে না হয়—" এরপর একটু নরম সুরে বললেন—"আট বছরের বুড়ো ছেলে—একটা মেয়েকে মারলে—তোমার লজ্জা হয় না?"

কিন্তু আনাতোলি পেত্রোভিচ্ যখন শুরাকে ড্রয়িং-এর জন্য প্রশংসা করতেন, আর জয়াকে তার পরিষ্কার নোটবই-এর কথা, কি বাড়ির কোন কাজে বাহাদুরীর কথা বলতেন, ওরা কি খুশিই না হতো!

আমাদের যেদিন দেরি হতো, সেদিন ওদের খাতাপত্র টেবিলের উপর খোলা রেখে, ওদের কাজকর্ম আমাদের দেখাবার জন্য রেখে, নিজেরাই শুতে যেতো। মাত্র কয়েকঘন্টা ওদের সংগে কাটিয়ে আমরা বুঝে ফেলতাম ওরা সারাদিন কি করেছে, কি ভেবেছে, আমরা যখন ছিলাম না তখন কি কি ঘটেছে—খেলাই হোক আর কাজই হোক—আমরা সকলে একসংগে করতাম বলে আমাদের ছেলে-মেয়েদের সংগে আমাদের বন্ধুত্বটা ক্রমশই বেড়ে আমরা দিনের পর দিন অন্তরংগ হয়ে উঠছিলাম। একের জন্য অন্যের সহানুভূতিও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল।

স্কুলের পথে

স্তারোয়ী শোসের রাস্তা থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল।

সবার আগে আমি উঠে প্রাতরাশ তৈরি করে ছেলেদের খাইয়ে যখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়তাম তখনও রাস্তায় অন্ধকার থাকতো। তিমিরিয়াজেভ পার্কের ভিতর দিয়ে ছিল আমাদের যাবার রাস্তা। পার্কের লম্বা গাছগুলো এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো, দেখলে মনে হতো, ওরা যেন ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা নীল পটভূমির উপরে কালো রং-এ আঁকা ছবির রেখা। পায়ের নিচে বরফ মড়মড় করে ভাঙতো, আমাদের প্রশ্বাসের গরম হাওয়া আমাদের কোটের কলারের উপরকার বরফে রঙ্ ছিটিয়ে দিতো।

আমরা তিনজন আগে যেতাম, আনাতোলি পেত্রোভিচ্ পরে, প্রথমে আমরা চুপচাপ পথ চলতাম, কিন্তু খানিকটা যাবার পরই অন্ধকার আর ঘুমের জড়তা দুই-ই কেটে যেতো আর কতরকম গল্প শুরু হতো—

একবার জয়া বলল—"আচ্ছা মা, গাছেরা যত বড়ো হয় তত দেখতে সুন্দর হয়, কিন্তু লোকেরা কেন বুড়ো হলে দেখতে বিশ্রী হয়ে যায়?"

আমার মাথায় কোন জবাব আসবার আগেই শুরা রেগে বলে উঠলো—"কখনো না—দেখ দেখি দিদিমা তো বুড়ো, কিন্তু দিদিমাকে কি সুন্দর দেখতে?"

মা...না—মাকে আর কেউ এখন সুন্দর বলবে না, চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, গাল-গুলো তুবড়ে গিয়েছে...

শুরা যেন আমার ভাবনার সূত্র ধরেই বলে ফেললো—"আমি যাকে ভালো-বাসি, তাকেই আমার সুন্দর লাগে!"

জয়া একটু ভেবে বলল—"তা সত্যি।"

একদিন আমরা তিনজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, একটা লরি আমাদের পিছন থেকে তাড়াতাড়ি সামনে এসে খ্যাঁচ করে থেমে গেল। আমাদের দিকে চেয়ে বলল—"স্কুলে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?" আমি তো অবাক হয়ে বললাম—"হ্যাঁ"।

"তাহলে ছেলেদের বলুন লাফিয়ে উঠুক।"

আমি চেয়ে দেখবার আগেই জয়া আর শুরা পিছনে লাফিয়ে উঠল আর ওদের খুশিভরা চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে লরি এগিয়ে চললো।

সেদিন থেকে বসন্তকাল পর্যন্ত সেই লরিটা রোজই আমাদের সামনে এসে ছেলেদের নিয়ে প্রায় স্কুলের কাছাকাছি নিয়ে ছেড়ে দিতো। ওরা লরির পিছন থেকে লাফিয়ে নেমে যেতেই লরিটা এগিয়ে যেতো।

আমরা কিন্তু একদিনও "আমাদের লরির" জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম না। আমাদের পিছন থেকে পরিচিত মৃদু শব্দটার সঙ্গে গম্ভীর গলার আওয়াজ—"লাফাও দেখি বাচ্চারা" শুনতে বেশ ভালোবাসতাম। অবশ্য ঐ সহৃদয় লরি-ড্রাইভারের গন্তব্যপথ দৈবাৎ আমাদের রাস্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তবুও শিশুরা বিশ্বাস করতে চাইতো যে ড্রাইভার ইচ্ছা করেই আমাদের পথে আসতো।

বাড়ি বদল

আমাদের মস্কো আসার দুই বছর পর আনাতোলি পেত্রোভিচকে ৭নং আলেকজান্দ্রোভস্কি স্ট্রীটে বেশ বড় একটি ঘর দেওয়া হলো। এখনকার আলেকজান্দ্রোভস্কি স্ট্রীটকে আর চেনা যায় না। রাস্তার দুই ধারে বড়ো বড়ো নতুন সব বাড়ি, রাস্তা আর ফুটপাথ ঘন পীচ দিয়ে ঢাকা। তখনকার দিনে গোটাকতক কুঁড়েঘর, ছোট ছোট বাগান, বড়ো অসমান পড়ে-থাকা জমি নিয়ে এর চারদিকে গ্রাম্য আবহাওয়া ছিল।

রাস্তা থেকে দূরে আমাদের বাড়িটার আশেপাশে আর বাড়ি ছিল না, কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় বেশ দূরে ট্রাম থেকে নেমেই আমি বাড়িটা দেখতে পেতাম। আমরা থাকতাম দোতলায়, আগের চেয়ে এবারকার ঘরটা অনেক বড়ো, আলো-হাওয়ার দরুন আরামেরও বটে। শিশুরাও নূতন বাড়িটা বড়ো পছন্দ করতো। একে তো ওরা নূতন সব কিছুরই ভক্ত ছিল, তারপর বাড়ি বদলানোয় ওরা বেশ আমোদও পেল। বাঁধাছাঁদা করল ওরা অনেকক্ষণ ধরে। জয়া তো খুব সাবধানে বই, খাতা, মাসিক কাগজপত্রের ছবি সব জোগাড় করলো, শুরাও সযত্নে তার সম্পত্তি, যেমন কাঁচের টুকরো, পাথর, পেরেক, লোহার টুকরো, বাঁকানো লোহা আরও নানান রকমের—আমার ধারণাতে আসে না এমন সব জিনিস বেঁধে নিলো।

নতুন ঘরে আমরা ওদের জন্য এককোণে একটা টেবিল আর বই-এর শেলফ রেখে, জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলাম। টেবিলটা দেখেই শুরা চেঁচিয়ে উঠলো—"বাঁ দিকটা আমার!"

জয়া তো সানন্দে স্বীকার করে নিল—"ডানদিকটা আমার"—কাজেই অন্যান্য-বারের মতো এবারও ঝগড়াটা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

আগের মতোই দিন চললো—কাজ আর পড়ায়। রবিবারে আমরা মস্কোর অদেখা জায়গাগুলোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তাম, হয় সোকোলনিকি, না হয় জামোস্কভোরেচিয়ে, না হয় "বি" ট্রাম করে—শহরের চারদিক দেখে বেড়ানো, কিংবা নেস্কুচনি বাগানে বেড়ানো।

আনাতোলি মস্কোর পুরনো ও নতুন দুই অঞ্চলই ভালো করে চিনতেন, তিনি অনেক কিছু বলে দিতেন। আমরা কুজনেৎস্কি ব্রিজ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটার সময় একদিন শুরা জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা ব্রিজটা কোথায়?" এই প্রসঙ্গে আনাতোলি আমাদের আগেকার দিনের নদীটা কি করে পাইপ বসিয়ে মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার চমৎকার গল্পটা বললেন। সত্যিকার নদীর আমলে এখানে "কুজনেৎস্কি ব্রিজ" ছিল আর তার থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

এমনি করে "দেয়াল", "গেট", আরও সব টেবিল স্ট্রীট, টেবলক্লথ স্ট্রীট, গ্রেনেড স্ট্রীট, আর্মারি স্ট্রীট, ডগ্ স্কোয়ার, এইসব নামের উৎপত্তি জানতে পারলাম।

প্রেস্নিয়া কেন লাল (রেড), কেন রাস্তার নাম ব্যারিকেড স্ট্রীট, পার্কের নাম অভ্যুত্থান, এই সব মজার মজার কথা বলতেন আনাতোলি। ইতিহাসের পাতার পর পাতা খুলে যেতো ছেলেমেয়েদের সামনে, তারা সব বুঝতে শিখল আর অতীত আর বর্তমানকে ভালোবাসতে শিখল।

শোক

ফেব্রুয়ারির শেষ। সেদিন সার্কাসের টিকিট কিনলাম, ওদের নিয়ে বেশি বায়স্কোপ বা সার্কাস দেখতে যাই না আমরা ; তাই যখন যাই সময়টা সত্যি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে।

ছেলেমেয়েরা তো রবিবারের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে ওরা কল্পনা করতে আরম্ভ করেছে কুকুরটা দশ পর্যন্ত গুণছে, দুলকি-চালে ঘোড়া কেমন হলের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গলায় তার রুপোর সাজ, শিক্ষিত সীলমাছ কেমন পিপে থেকে লাফিয়ে আর এক পিপেতে যাচ্ছে, কি করে শিক্ষকের ছুঁড়ে-দেওয়া বল লুফে নিচ্ছে...

সারা সপ্তাহ ধরে ওরা খালি সার্কাস ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারছে না—কিন্তু শনিবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আনাতোলি পেত্রোভিচ্‌কে বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? শুয়েই বা আছো কেন?"

"ঘাবড়াচ্ছো কেন? সেরে যাবে, বিশেষ কিছুই হয়নি, একটু খারাপ লাগছে মাত্র।"

আমার ভয় একটুও কমলো না, দেখতে পাচ্ছিলাম আনাতোলি পেত্রোভিচ-এর মুখটা এতো হলদে হয়ে গিয়েছে যেন তিনি অনেকদিন ধরে ভুগছেন—দেখে মনে হচ্ছে বড় রোগাও হয়ে গিয়েছেন হঠাৎ। জয়া আর শুরাও ভয় পেয়ে বাবার পাশটিতে চুপচাপ বসে রইলো।

জোর করে একটু হেসে বাবা বললেন—"আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের সার্কাস দেখতে যেতে হবে।"

জয়া বলল—"তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা যাবো না।"

শুরাও বলল—"না আমরা যাবো না।"

পরের দিন আনাতোলি পেত্রোভিচ্-এর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠলো। পিঠের দিকে একটা তীব্র ব্যথার সঙ্গে জ্বরও এলো। খুব সহ্য করার ক্ষমতা ছিল তাঁর, তিনি বাইরে কিছু না দেখিয়ে বা চিৎকার, কাৎরানি না করে খালি ঠোঁট কামড়ে ব্যথা সহ্য করতে লাগলেন। ডাক্তার ডাকা দরকার, কিন্তু ওঁকে একলা রেখে যেতেও আমার এতো ভয় করছিল যে কি করবো বুঝতে না পেরে পাশের বাড়ির ফ্ল্যাটে ধাক্কা দিলাম। কিন্তু সেদিন রবিবার, ওরা কেউ বাড়ি ছিলেন না, নিতান্ত হতাশ হয়ে ফিরে এলাম, কি করা যায় ভাবতেও পারছি না।

হঠাৎ জয়া বলে উঠলো—"আমি যাচ্ছি ডাক্তার ডাকতে।" আমি জবাব দেবার আগেই ও তার কোট টুপি পরে নিলো।

অনেক কষ্টে আনাতোলি পেত্রোভিচ্ বললেন—"অনেক দূরে যেতে হবে, তুমি যেও না..."

"না না আমি যাবো...আমি জানি কোথায় থাকেন..." বলতে বলতে জয়া উত্তরের অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

"আচ্ছা যেতে দাও, ওর বেশ বুদ্ধি আছে, ও ঠিক খুঁজে পাবে"—বলে আনাতোলি পেত্রোভিচ্ যন্ত্রণাকাতর মুখখানি দেয়ালের দিকে ফেরালেন।

একঘন্টা পরে জয়া ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলো। তিনি আনাতোলি পেত্রোভিচ্‌কে পরীক্ষা করে সংক্ষেপে বললেন—"আন্ত্রিক গোলযোগ"—এক্ষুণি অপারেশন করতে হবে।

ডাক্তার তাঁর কাছে রইলেন—আমি ছুটে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলাম, আধঘন্টা পর পেত্রোভিচ্‌কে ওরা নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসছিল—ছেলেমেয়েদের ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে তক্ষুণি সেটা সংবরণ করলেন।

অপারেশন বেশ ভালোভাবেই হলো, আনাতোলি কিন্তু বিশেষ ভালো বোধ করলেন না। তাঁকে যখন দেখতে যেতাম তাঁর রক্তহীন ম্লান মুখখানা আমাকে ভয় পাইয়ে দিত, আমার স্বামীকে আমি সব সময় হাসিখুশি দেখতে অভ্যস্ত, এখন তিনি সব সময় চুপচাপ। দৈবাৎ হয়তো তাঁর হাতটা আমার হাতের উপর রাখতেন, কখনও বা তাঁর আঙুলগুলো দিয়ে আমার আঙুলগুলো টিপে দিতেন।

৫ই মার্চও আমি যথারীতি তাঁকে দেখতে এলাম। একজন এসে আমাকে একটু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বললেন—"আপনি হলঘরে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, নার্স কিংবা ডাক্তার এখনই আসছে।" আমি ভাবলাম তিনি হয়তো আমায়

চিনতে পারেননি—তাই তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম—"আমি কস্‌মোদেমিয়ানস্কিকে দেখতে এসেছি। আমার রোজকার পাশ আছে।"

তিনি আবার বললেন—"এক মিনিট মাত্র, নার্স এক্ষুণি আসছে।"

এক মিনিট পরে নার্স তাড়াহুড়ো করে ঘরে ঢুকে আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই বলল—"আপনি বসুন।"

এবার আমি বুঝতে পারলাম।

অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য কথাগুলো আমিই উচ্চারণ করলাম—"তিনি তাহলে মারা গিয়েছেন?"

নীরবে নার্স মাথা নাড়লো।

দুরারোগ্য রোগে পীড়িত নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রিয়জনের বিয়োগ সহ্য করা মর্মান্তিক, তবে তার চেয়ে দুঃখজনক, বেদনাদায়ক হলো প্রিয়জনের আকস্মিক মৃত্যু।...মাত্র এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত যে-লোক আনন্দ আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল, ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যার কোনদিন অসুখ করেনি, এখন তিনি শবাধারে শায়িত, নীরব, নিস্পন্দ।

ছেলেমেয়েরা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া করেনি, জয়া আমার হাত ধরেছিল, শুরা আর একহাত জড়িয়ে রেখেছিল।

অশ্রুহীন রক্তিম চোখে জয়া বারবারই আমাকে বলতে লাগলো—"মা কেঁদো না।"

এক নিরানন্দ শীতের দিনে আমরা তিনজনে "তিমিরিয়াজেভ পার্কে দাঁড়িয়ে আমার দাদা আর বোনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তাঁরাও আসবেন শোক-যাত্রায় যোগ দিতে। আমরা একটি বড় ঠাণ্ডা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলাম, শীতের তীক্ষ্ন হাওয়া আমাদের গায়ে সূঁচের মতো বিঁধছিল। কখন যে ওঁরা এসে পেঁছিলেন বা আমরা কি করে সেই শীতের দিনটা কাটিয়েছিলাম তা কিছুই মনে নাই, খালি অস্পষ্ট মনে আছে কি রকম হৃদয়বিদারক হতাশার সঙ্গে জয়া তার বাবার কবরে মাটি দিতে গিয়ে কেঁদে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শবাধারের উপরে মাটি ফেলার শব্দ...

পিতৃহীন

তখন থেকে জীবনের ধারাই বদলে গেল। আগে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, জানতাম আমার পাশে এমন একজন স্নেহময় মানুষ আছেন যাঁর কাছে আমি সবসময়ই সাহায্য পাবো। আমি সবসময় তাঁর কাছ থেকে না-চাইতেই-পাওয়া নীরব সাহায্যের অভ্যস্ত, এর যে ব্যতিক্রম হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। হঠাৎ আমি একেবারে একা হয়ে পড়লাম, তারপর আমার উপর নির্ভরশীল দুটি ছেলেমেয়ে। তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

কি বিপদ যে আমাদের হয়েছে, সে সম্বন্ধে শুরা একেবারেই অজ্ঞ ছিল, ও নিতান্তই ছেলেমানুষ, ও হয়তো ভাবছিল ওর বাবা অন্যান্যবারের মতো

এবারও কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন কয়েকদিনের জন্য, শীগগিরই যে-কোন একদিন ফিরে আসবেন।

কিন্তু জয়া বড়োদের মতো বেদনাবোধ করতো। ও বাবার সম্বন্ধে কোন কথা কখনও বলতো না, আমার কাছে এসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো, যখন আমার ভাবনা তাঁকে ঘিরেই বয়ে চলেছে, আর বলতো—"তোমায় কিছু পড়ে শোনাবো?" না হয় বলতো—"আমাদের একটু গল্প বল না—সেই তোমরা যখন ছোট ছিলে।" না হয়তো কিছু না বলে আমার কাছে চুপচাপ বসে থাকতো। আমার হাঁটুর সংগে হাঁটু ঘেঁষে বসতো। আমার দুঃখ ভোলাবার জন্য ও প্রাণপণ চেষ্টা করতো।

কিন্তু কোন কোন রাত্রে ওর ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পেতাম. আমি ওর কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম—"বাবার জন্য মন কেমন করছে বুঝি?"

ও জবাব দিতো—"না. আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলাম।"

এই বিপদের আগে আমরা প্রায়ই জয়াকে বলতাম—"তুমি হলে বড়ো. তুমি শুরাকে দেখবে, মাকে সাহায্য করবে"—একথাগুলোর গভীরতর অর্থ এখন দেখা দিল, জয়া এবার সত্যিই আমার বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়াল।

আমি দুটো স্কুলে পড়াতে লাগলাম. কাজেই সংসারের দিকে মন দেবার সময় হাতে আরও কম থাকলো। রাত্রেই আমি খাবার রান্না করে রাখতাম, জয়া গরম করে শুরাকে খাইয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিতো, একটু বড় হলে পর উনুন অবধি ধরাতে শিখল।

প্রতিবেশীরা বিস্ময়ের সংগে বলতো—"জয়া কোন্‌দিন আমাদের বাড়িঘর দেবে জ্বালিয়ে. ছেলেমানুষ বৈ তো নয়!"

কিন্তু আমি জানতাম. যে-কোন বয়স্কের চেয়ে জয়া অনেক বেশি নির্ভর-যোগ্য। সে সব কাজ ঠিক সময়ে করতো. কোনকিছুই ভুলতো না. সামান্য সামান্য ব্যাপারেও তার বিন্দুমাত্র অবহেলা ছিল না। জয়া জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি কখনও ফেলতো না. সময়মতো আগুন নিবিয়ে দিতো. এমন কি এক-টুকরো কয়লা কোথাও পড়ে থাকলে তুলে রাখতো।

একদিন আমি ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম. এতো ক্লান্ত লাগছিল রান্না করতে আর ভালো লাগছিল না। ভাবলাম, "কাল সকাল সকাল উঠে কালকের খাবার তৈরি করবো।"

বালিশে মাথা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন উঠলাম অনেক দেরি করে, আধঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে না পড়লে স্কুলে পেঁছতে দেরি হয়ে যাবে। ভয়ানক বিরক্তি লাগলো—"কি যন্ত্রণা! কি করে এতক্ষণ ঘুমালাম. জয়া শুরা তোমাদের আজকে আর রান্না-করা খাবার জুটবে না দেখছি।"

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে দরজায় পা দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—"কেমন. না খেয়ে আছো তো?"

শুরা নাচতে নাচতে বলল—"না খেয়ে নয়, খেতে খেতে আমাদের পেট ফেটে যাচ্ছে একেবারে।"

জয়া বেশ গর্বের সংগে বলল—"মা বসে পড়ো তাড়াতাড়ি. আজ আমরা মাছভাজা রেঁধেছি।"

"মাছ? কি মাছ?"

কড়াতে মাছভাজার লোভনীয় গন্ধ আর চকচকে চেহারা ক্ষিধে জাগিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু এলো কোত্থেকে?

আমি যতোই ভাবছি ওরা ততোই খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠছে—শুরা লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগলো, জয়া শেষ পর্যন্ত খুশির চোটে বলে ফেললো—

"জানো, স্কুলে যাবার সময় পুকুরের জমানো বরফের ভিতরে গর্তের মধ্যে একটা মাছ দেখতে পেলাম. শুরা তো তক্ষুণি হাত দিয়ে ধরতে গেল, কিন্তু পিছলে পালিয়ে গেল। আমাদের দাই একটা টিন দিল, আমরা সেটাকে ব্যাগে পুরে নিয়ে এলাম। বাড়ি আসার পথে পুকুরে নেমে আমরা কিছু মাছ ধরলাম...।"

শুরা যোগ দিল—"আমরা আরও ধরতে পারতাম, কিন্তু একটা লোক আমাদের তাড়িয়ে দিল—বলল তোমরা হয় ডুবে যাবে না হয় শীতে জমে যাবে। কিন্তু মা দেখো আমরা দুটোর একটাও হইনি।"

জয়া বলল—"বেশ অনেকগুলো ধরেছি। বাড়ি এসে ভেজে আমরা কিছু খেয়েছি, তোমার জন্য কিছু রেখেছি। বেশ খেতে, নয় মা?"

সেদিন জয়া আমি দুজনে মিলে রান্না করলাম। ও আলু ছাড়িয়ে দিল, আর কোন্ মশলার কতটুকু দিতে হয় তা বেশ করে দেখে নিল।

পরে আনাতোলি পেত্রোভিচ্-এর মৃত্যুর প্রথম দিককার অবস্থা ভাবতে গেলেই আমার মনে পড়তো সেই দিনগুলোর কথা। মনে হয় পরে জয়ার চরিত্রের যে গাম্ভীর্য আর দৃঢ়তা লোককে মুগ্ধ করতো, ঐ সময়েই তার বিকাশ হয়।

নতুন স্কুলে

আমার স্বামীর মৃত্যুর পর খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমি ছেলেমেয়েদের ২০১নং স্কুলে বদলি করে নিলাম। আগের স্কুলটা ছিল খুব দূরে। ওদের একা যেতে দিতে আমার ভয় করতো। আমি নিজে ঐ স্কুলে আর কাজ করতাম না, কারণ বড় ছেলেমেয়েদের একটি স্কুলে পড়ানো শুরু করেছিলাম।

প্রথম থেকেই নতুন স্কুলটা ওদের বেশ ভালো লাগলো। প্রথম দিনে ওরা স্কুলটাকে ভালোবেসে ফেলল। স্কুলের প্রশংসা ওদের মুখে যেন আর ধরে না। অবশ্য এতোদিন পর্যন্ত ওরা কাঠের ছোট ঘরওয়ালা আস্পেন বনের স্কুলের মতো স্কুলে পড়ছিল। এই স্কুলটা খুব বড়ো, অনেকগুলো ঘর, তারপর একেবারে গায়েই মস্ত এক সুন্দর তিনতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, পরের বৎসর স্কুলটা ঐ বাড়িতে উঠে যাবে।

২০১নং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ্ কিরিকোভ্-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো জয়া। সন্ধানী চোখ ছিল ওর।

উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল জয়া—"দেখবে আমাদের কি একখানা হলঘর হবে! আর লাইব্রেরি, কতো যে বই, এতো বই আমার জন্মেও দেখিনি। চার-দিকের তাক, দেয়াল, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সব ভর্তি বইয়ে—একটুও জায়গা

নেই—একেবারে ঠাসা—একটু থেমে জয়া বলতে লাগলো (আমি যেন 'একেবারে ঠাসা' কথাটার মধ্যে দিদিমার গলা শুনতে পেলাম)—নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ্ আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে এনেছেন, তিনি বলেছেন—আমাদের একটা প্রকাণ্ড বাগান হবে, আর আমরাই তার সব গাছ লাগাবো। দেখো কি সুন্দর স্কুল হবে আমাদের। সারা মস্কো খুঁজলেও আর এমনটি পাবে না!"

শুরাও নতুন স্কুলের ব্যাপার স্যাপার দেখে একেবারে থ' হয়ে গিয়েছিল, তবে ও বেশি পছন্দ করতো ব্যায়ামের ক্লাশগুলো। কি করে দড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিল, কি করে ঘোড়ার উপর দিয়ে লাফিয়ে গিয়েছিল, কি করে ও বাস্কেটবল খেলতে শিখল—সে সব কথা বলতে ওর কখনও ক্লান্তি আসতো না।

প্রথম থেকেই ওদের শিক্ষয়িত্রী লিদিয়া নিকোলাইয়েভনা য়ুরিয়েভার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। যেরকম খুশির সঙ্গে ওরা রোজ স্কুলে যেতে লাগলো, যে রকম খুশি আর তৃপ্তি নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে আসতো, যে রকম করে স্কুলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা, শিক্ষিকার প্রত্যেকটি কথা বলতো, তার কথার বিশেষ গুরুত্ব দিত, তাতেই আমি তাঁর প্রতি ওদের শ্রদ্ধা যে কতো বুঝতে পারতাম।

একদিন আমি বললাম, "জয়া তুমি বড্ড বেশি মার্জিন রাখছো—"

জয়া তাড়াতাড়ি লজ্জা পেয়ে বলল—"না বেশি নয়—দিদিমণি বলে দিয়েছেন এর চেয়ে কম রাখা ভালো নয়।"

সব ব্যাপারেই এরকম।

লিদিয়া নিকোলাইয়েভনা যা বলবেন, তাই হবে। আর সত্যি বলতে আমরা জানি এরকম হওয়াই উচিত। ছেলেমেয়েরা শিক্ষিকাকে ভালোবাসে, ভক্তি করে। তাই তাঁকে খুশি করার জন্য তাঁর আদেশ পালন করার জন্য তাঁরা যথাসম্ভব চেষ্টা করতো।

স্কুলে কি ঘটতো না ঘটতো শুরা আর জয়ার মনে গাঁথা হয়ে থাকতো। শুরা মহা খাপ্পা হয়ে বলে চলল—"বোরিস দেরি করে স্কুলে এসে বলল আমার মার অসুখ করেছে—আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম; মার অসুখের ওপর তো আর বেচারার হাত নেই তাই লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্না বললেন 'যাও, বসো গিয়ে।' কিন্তু স্কুলের পর দেখা গেলো বোরিসের মা সশরীরে হাজির, ওকে কোথায় যেন নিয়ে যাবেন। তাঁর চেহারা দিব্যি সুস্থ, সতেজ আর সবল, কোনকালে যে অসুখ করেছিল তার কোন চিহ্ন নেই কোথাও। লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্না রাগে লাল হয়ে উঠলেন, বোরিসকে ডেকে বললেন—'আমি সব থেকে অপছন্দ করি কি জানো—মিথ্যাকথা বলা। আমার নিয়ম হলো যদি মিথ্যা না বলে স্বীকার করে ফেল...' তার মানে সত্যি কথা বল আর কি—বলতে বলতে শুরা হঠাৎ বোধহয় ভাবলো শিক্ষিকার কথার মানে করাটা বোধহয় ঠিক নয় তাই শুধরে নিয়ে বলল—'তাহলে অপরাধের বেশির ভাগই মাপ করা যায়।' আমি জিজ্ঞেস করলাম—'অপরাধের বেশির ভাগই কেন মাপ হয়ে গেল?' লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্না বললেন—'দোষ স্বীকার করে ফেলার মানে হলো—সে তার অন্যায় বুঝতে পেরেছে, তখন আর তাকে কঠোর শাস্তি দেবার কোন মানে হয় না। কিন্তু সে যদি অপরাধ অস্বীকার করে তার মানে সে অন্যায় বুঝতে পারেনি এবং এখন শাস্তি না দিলে একই অপরাধ বারবার করে যাবে..."

ক্লাশের মেয়েরা খারাপ নম্বর পেলে জয়া এমন মুখের চেহারা করে বাড়ি

আসতো যে আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করতাম, "কি ব্যাপার, খারাপ নম্বর পেয়েছো বুঝি?"

দুঃখিত সুরে সে জবাব দিতো,—"আমি নয়—আমি তো বেশ ভালোই নম্বর পেয়েছি, কিন্তু মানিয়া ফেদোতোভা সব বিষয়েই খুব খারাপ করেছে, আর নিনা লিউবিমোভাও তাই, লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্‌না বলেছেন—'তোমাদের জন্য আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই। তোমাদের তো খারাপ নম্বর দিতেই হবে।"

একদিন আমি অন্যদিনের থেকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে দেখি ওরা তখনও ফেরেনি। বেশ চিন্তিত হয়ে আমি স্কুলে গিয়ে লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্‌নাকে জিজ্ঞেস করলাম—জয়া কোথায় তিনি জানেন কিনা—তিনি জবাব দিলেন—"বোধ হচ্ছে তারা সবাই বাড়ি চলে গিয়েছে। আসুন একবার ক্লাশঘরে খুঁজে দেখা যাক।"

আমরা ক্লাশঘরের কাছে গিয়ে জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে উঁকি দিলাম।

জয়া আর তিনটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন লম্বায় জয়ারই সমান হবে, মাথায় সরু সরু জোড়া বেণী, আর একজন জয়ার চেয়ে বেঁটে, মোটাসোটা আর মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সবাই বেজায় গম্ভীর, ভারী চিন্তিত মুখ, কোঁকড়া চুলওয়ালা মেয়েটি তো একটু হাঁ-ই হয়ে আছে।

একটু বকুনির ভঙ্গিতে জয়া তাদের দিকে তাকিয়ে বলছে—"কি করছো বল তো তোমরা? পেন্সিলের সঙ্গে পেন্সিল যোগ দিলে পেন্সিল পাওয়া যায়, তা তোমরা তো মিটারের সঙ্গে কিলোগ্রাম যোগ দিচ্ছ, তাতে পেলে কি?"

ঠিক এই সময় ক্লাশের পিছন দিকে একঝলক সাদা আলোর মতো কি যেন দেখতে পেলাম—সেদিকে চেয়ে দেখি শুরা পিছনের বেঞ্চিতে বসে একমনে কাগজের এরোপ্লেন ওড়াচ্ছে।

আমরা পা টিপে টিপে সেখান থেকে চলে এলাম। লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্‌নাকে বলে এলাম ওদের শীগগির বাড়ি পাঠিয়ে দিতে আর ভবিষ্যতে যেন ওরা ছুটির পর বাড়ি ফিরতে দেরি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। সন্ধ্যাবেলায় আমি জয়াকে বললাম, ছুটি হওয়ামাত্রই তার বাড়ি আসা উচিত। "আজ আমি তোমাদের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকবো বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম, আর এসে দেখি কিনা তোমরা নেই! স্কুলের পর সেখানে থেকে মিছিমিছি সময় নষ্ট করো না।"

জয়া চুপ করে আমার কথা শুনলো—কিন্তু খাবার পর হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে বসলো—"আচ্ছা মা -অন্য মেয়েদের সাহায্য করলে কি সত্যি সত্যি সময় নষ্ট হয়?"

"কেন, সময় নষ্ট হবে? তোমার সাথীকে সাহায্য করাটা তো খুব ভালো কাজ।"

"তাহলে তুমি কেন বললে, স্কুলে থেকে সময় নষ্ট করো না?"

আমি নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেই জিভ কাটলাম (এই নিয়ে বোধ হয় একশ'বার আমার এরকম হলো)। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় কি কঠোর সংযমের সঙ্গে প্রত্যেকটি কথার ওজন যাচাই করে নিতে হয় তা আমার ভাবা উচিত ছিল।

"আমি তো আর সবসময় ছুটি পাইনা, তোমাদের সঙ্গে একটু বেশি সময় থাকবো তাই বলেছিলাম—"

"কিন্তু তুমিই তো বলেছো—কাজ করতে হবে সবার আগে।"

"খুব সত্যি। কিন্তু শুরাকে দেখাশোনা করাও তো তোমার কাজ, শুরা যে ক্ষুধার্ত হয়ে স্কুলে বসে তোমার সঙ্গে ফিরে আসার অপেক্ষায় ছটফট করছিল।"

শুরা বিড়বিড় করে উঠলো—"না! আমার মোটেই খিদে পেয়েছিল না, জয়া স্কুলে অনেকখানি টিফিন নিয়ে গিয়েছিল।"

পরের দিন জয়া যাবার সময় বলল—"মেয়েদের সঙ্গে আজকে একটু স্কুলে থাকবো?"

"বেশি দেরি কোরো না জয়া।"

"আধঘন্টা মাত্র"—জয়া জবাব দিল।

আমি জানতাম, জয়ার আধঘন্টা মানে আধঘন্টাই হবে, তার একমিনিটও বেশি নয়।

গ্রীক্ পুরাণ

আনাতোলি পেত্রোভিচ্ যে ভাবে আমাদের জীবনের ধারা শুরু করে দিয়েছিলেন, তা বজায় রাখার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। তিনি বেঁচে থাকতে যেমন, এখনও তেমনি আমরা ছুটির দিনে মস্কোর চারদিকে ঘুরে বেড়াতে যেতাম। কিন্তু তাতে তাঁর কথা আমাদের আরও বেশি করে মনে পড়তো। সন্ধ্যার খেলার আনন্দও আমাদের জমতো না, তাঁর প্রাণখোলা হাসি, কৌতুকের অভাববোধটা আমাদের আরও বিষণ্ণ করে তুলত।

এক ছুটির সন্ধ্যায়, বাড়ি ফেরার পথে, গহনার দোকানের সামনে আমরা দাঁড়ালাম। জানালার উজ্জ্বল আলোগুলি লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী, হরেক-রকমের রং ছড়িয়ে দিয়েছে দামী দামী পাথরের উপরে আর তা থেকে নানা রং-এর ঝলমলানি হচ্ছে। সেখানে আছে নেকলেস্, ব্রোচ্, পেন্ডেন্ট—সবকিছু, আর এক পাশে জানালার শার্শির নিচেই মখমলের কুশনে সাজানো আছে সারির পর সারি দামী দামী আংটি। তাদের প্রত্যেকটিতে একটি দুটি করে দামী পাথর বসানো, সেই পাথর থেকে রঙবেরঙের আলো ঠিক্‌রে পড়ছে, যেমন বার হতে দেখা যায় ময়দাভাঙার যাঁতার ভেতর থেকে, কিংবা ট্রামের উপরকার ডান্ডার মাথা থেকে বার হতে। আশ্চর্য সব আলোর মেলায় ছেলেমেয়েরা অভিভূত হয়ে পড়েছিল—হঠাৎ জয়া বলে উঠলো—"বাবা বলেছিল কেন আংটিতে মণিমুক্তা বসানো হয় তা বলবে, কিন্তু বলে নি।"... বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে জয়া আমার হাতে শক্ত চাপ দিল, যেন আমাকে বাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য মাপ চাইছে।

বাধা দিয়ে শুরা বলল—"মা আংটিতে কেন মণিমুক্তো বসানো হয় তা কি তুমি জানো?"

হাঁটতে হাঁটতে আমি ওদের প্রমিথিউস-এর গল্প বললাম, ছেলেমেয়েরা তো কোনরকমে অন্য পথচারীদের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা না লাগিয়ে চলতে চলতে

আমার প্রত্যেকটা কথা যেন গিলতে লাগলো। মানুষের জন্য টাইটানের দুষ্প্রাপ্য বস্তু মর্ত্যে নিয়ে আসা, ফলে প্রমিথিউসকে কি পরিমাণ নিগ্রহ ভোগ করতে হয় তার অমর কাহিনী শুনতে শুনতে ওরা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

"একদিন হারকিউলিস্ নামে অসাধারণ বলশালী, দয়ালু বীর প্রমিথিউসের কাছে এলেন। তিনি কাকেও ভয় করতেন না এমন কি দেবরাজ জীউসকেও নয়। তলোয়ার দিয়ে তিনি যে শিকল দিয়ে প্রমিথিউসকে পাহাড়ের গায়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল তা কেটে দিলেন। প্রমিথিউস্ মুক্ত হলেন। কিন্তু দেবরাজ জীউসের আজ্ঞায়, প্রমিথিউসের দেহ থেকে সে শৃঙ্খল মুক্ত হলো না ; একটুকরো পাথর আর ঐ শিকল প্রমিথিউসের হাতে লেগেই রইল। সেই থেকে, প্রমিথিউসের স্মৃতি হলো এখানকার দামী পাথর।"

কয়েকদিন পরে আমি লাইব্রেরি থেকে গ্রীক্ পুরাণের একখানি বই এনে ওদের কাছে পড়তে আরম্ভ করলাম। প্রমিথিউসের প্রতি ওদের যতই আকর্ষণ থাক, ওরা কিন্তু প্রথমে যেন অনিচ্ছায় শুনতে লাগলো। কারণ বোধ হয়—গ্রীক-পুরাণের এই অর্ধ-দেবতা তাদের কাছে যেমনি অপরিচিত, তেমনি তাদের খটমট নামগুলোও ওদের পক্ষে মনে রাখা ভয়ানক শক্ত। রুশ-কাহিনীর পরিচিত নামগুলোর মতো—মিষ্টিদাঁতওয়ালা ভালুক, শেয়াল পাদ্রিকাইয়েভ্না, ধূসর হায়েনা, বরফের গর্তে ল্যাজ রেখে যাওয়া বোকা মেছো,—এই সবের মতো পরিচিত আর প্রিয় নয়। ক্রমে ক্রমে গ্রীক বীরেরা ছেলেমেয়েদের মনে জায়গা করে নিল জয়া আর শুরো হারকিউলিস, পারসিউস্ আপকারুস এদের কথা নিয়ে এমন আলোচনা শুরু করল, যেন তারা সব জ্যান্ত মানুষ।

মনে পড়ছে একদিন জয়া বলেছিল, নিওবের জন্য ওর ভারী দুঃখ হয়। শুরা বেশ গরম মেজাজে জবাব দিল—"কেন সে অত অহংকারী কেন?" আমি জানতাম আরও অনেকগুলি চরিত্রই ওদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে। আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে—একদিন আমাকে ভয়নিচ-এর লেখা 'দি গ্যাডফ্লাই' পড়তে দেখে জয়া বলল—"ওমা তোমার মতো বড়োরা কাঁদে বুঝি।"

আমি জবাব দিলাম—"তুমিও একদিন এ বই পড়বে, তখন দেখো।"

"কখন পড়বো?"

"যখন তুমি এই মনে কর চৌদ্দ বছরের হবে।"

"ও তার তো এখনও ঢের দেরি—" জয়া জবাব দিল, বোঝা গেল এত দিনের ব্যবধান তার কাছে অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব রকমের দীর্ঘ।

ওদের প্রিয় বই

আমরা ছুটির সন্ধ্যায় আর দোমিনো খেলতাম না। আমরা জোরে জোরে পড়তাম, আমিই পড়তাম—ছেলেমেয়েরা শুনতো।

প্রথম প্রথম আমরা পুশকিন্ পড়তাম, তাঁর জগতটা ছিল সৌন্দর্য আর আনন্দ দিয়ে ভরা। বিশেষ ভাবে মনের মতন ছিল তাঁর বই আমাদের সকলেরই কাছে। পুশকিনের কবিতাগুলো মনে রাখাও খুব সোজা। 'কাঠবিড়ালী' সম্বন্ধে কবিতাটা আবৃত্তি করতে শুরা কখনও ক্লান্তি বোধ করতো না।

কণ্ঠ তার সদাই গেয়ে চলেছে গান
ছোট্ট বাদামগুলো অবিরত খান্ খান্
বাদামগুলো নয়কো শুধু শাঁসেই সুস্বাদু
আবরণে ঠাসা আছে সোনারই যাদু
শাঁসের বদলে তার চুনী আর পান্না...

পুশকিনের কবিতা মুখস্থ থাকলেও ছেলেমেয়েরা প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো—

"মা সোনালী মাছের কথা শোনাও না...জার সুলতানের কথা পড় না..."

একবার আমি গারিন-এর লেখা "তিওমার ছেলেবেলা" পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে আমরা এসে থামলাম—সেখানে তিওমার বাবা তিওমাকে ফুল ছেঁড়ার জন্য চাবুক লাগাচ্ছেন। বাচ্চারা তারপর কি জানবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল, কিন্তু সেদিন ভয়ানক রাত হয়ে গিয়েছিল বলে ওদের শুতে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর ঘটনাচক্রে সেই সপ্তাহে কিংবা পরের রবিবারেও আমি ঐ গল্পটা শেষ করার আর মোটেই সময় পেলাম না। আমার হাতে বিস্তর কাজ জমেছিল, সেলাই, খাতা শুদ্ধ করা, আর অনেক মোজা রিপু করার ব্যাপার ছিল। শেষ পর্যন্ত জয়ার আর ধৈর্য রইল না। ও নিজেই বইটা নিয়ে বাকিটা পড়ে ফেলল।

আর এমনি করেই শুরু হলো। জয়া হাতের কাছে যা কিছু পেতো তা সে রূপকথাই হোক, খবরের কাগজই হোক আর স্কুলের পাঠ্য বই হোক্ সবকিছুই একেবারে গিলে ফেলতে আরম্ভ করল। যেন সে বড়োদের মতো করে পড়া অভ্যাস করছে, পাঠ্যবইয়ের একখানা করে পাতা মাত্র আর সে পড়বে না এখন সে একটা গোটা বই পড়তে চায়। কিন্তু যখনি আমি বলতাম "এ বইটা তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি আগে বড়ো হও তবে পড়বে।" ও বইটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিত।

আর্কাদি গাইদার আমাদের বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সত্যি ঘটনাবলী নিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য গল্প লেখার তার যে আশ্চর্য কায়দা, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। তার শিশুশ্রোতাদের তিনি এমনভাবে সম্বোধন করতেন যেন তারা তাঁর সমান, বয়সে ছোট বলে তিনি তাদের তুচ্ছ করে কথা বলতেন না। তিনি জানতেন শিশুরা সবকিছুই পুরোপুরি চায়, সাহসের মধ্যে নামমাত্র ভয় থাকলে চলবে না, বন্ধুত্বের মধ্যে কোন খাদ থাকবে না, বিশ্বস্ততায় থাকবে না কোন শর্ত। তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় উচ্চাশার শিখা, কবি মায়াকভ্স্কির মতো তিনিও শ্রোতাকে আমাদের দেশের প্রকৃত শান্তি ও সুখের দিকে তাকাতে নির্দেশ দিতেন, কেবল মাত্র সাময়িক সুখ ও সাধারণ মানবিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই তাঁর প্রতিটি ছত্রে প্রেরণা থাকতো না। তিনি মানবসমাজকে শাশ্বত শান্তি ও সুখের দিকে ধাবিত হবার জন্য প্রেরণা দিতেন।

গাইদার-এর প্রত্যেকটি বই পড়ার পর আমাদের কিরকম আলোচনাই না হতো! আমাদের বিপ্লবের সার্থকতা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতাম, আমাদের বর্তমান স্কুলের সঙ্গে জারের আমলের স্কুলের কত তফাৎ ; সাহস আর শৃঙ্খলা নিয়েও আমরা আলোচনা করতাম। গাইদারের বইয়ে এইসব কথাগুলো কি আশ্চর্য সোজা আর পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে। বোরিস গোরিকভ সঙ্গীদের সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে মুহূর্তের ভুলে অনুমতি না নিয়েই সাঁতার কাটতে চলে গিয়েছিল, ফলে অনিচ্ছাকৃত হলেও তার অসমবয়সী বন্ধু চুবুক-এর উপর

কি বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল তার বিবরণ পড়তে পড়তে জয়া আর শুরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

শুরা বলে উঠল—"ভাব একবার। ওর ইচ্ছে হলো ও সাঁতার কাটবে—আর ধরে নিয়ে গেল কিনা চুবুককে!"

জয়া বলল—"আর চুবুক কিনা মরার সময় জেনে গেল যে বোরিস্ বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে! এর পরে বোরিসের কি মনের অবস্থা হলো ভেবে দেখেছ! আমি তো ভাবতেই পারি না, আমার বন্ধুকে যদি আমার জন্য গুলি করে মারা হয় তারপর আমি কি করে বেঁচে থাকবো!"

আমরা বারে বারে "দূরদেশ", "আর-ভি-এস" "সেনাবিভাগের গোপন রহস্য", ইত্যাদি পড়তাম। গাইদার-এর কোন নূতন বই বার হওয়া মাত্রই আমি কিনে আনতাম। সেই সময়কার প্রধান প্রধান চমৎকার সব ঘটনা নিয়ে সেই বইগুলো লেখা হতো, আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। জয়া একবার জিজ্ঞেস করলো—"আচ্ছা মা. গাইদার কোথায় থাকেন"?

"বোধহয় মস্কোতে।"

"ওঁকে দেখতে পেলে কি মজাই না হতো।"

নতুন কোট

"কসাক দস্যু" খেলতে শুরা ভয়ানক ভালোবাসত। ছেলেদের নিয়ে শীতকালে বরফের উপরে, গরমের দিনে বালির ভিতরে, ওরা গর্ত খুঁড়ে, আগুন জেবলে পিলে চমকানো চিৎকার করতে করতে রাস্তায় রাস্তায় শুরা ঘুরে বেড়াতো।

একদিন সন্ধ্যার সময় হলের দিকে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল, দরজাটা দড়াম করে খুলে যেতে দেখা গেল শুরা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে ওর। দেখে জয়া আর আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলাম, সারাগায়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, মাথা মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে। মাত্র এই নয়, এ রকম দেখা আমাদের অভ্যাস আছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক হলো ওর নতুন কেনা কোটের অবস্থাটা। যত বোতাম, পকেট সব উপড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে—আর সেগুলোর জায়গায় মস্ত মস্ত সব গর্ত হাঁ হয়ে আছে।

ভয়ে আমার হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, মাত্র কয়েকদিন আগে কোটটা কিনে দিয়েছি।

কোন কথা না বলে ওর কাছ থেকে কোটটা নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলাম। শুরাও একটু হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তবে ওর চেহারা যেন পরিচয় দিচ্ছিল নীরব ঔদ্ধত্যের—"তাতে কি হয়েছে?" এই যেন তার মনের ভাব। মাঝে মাঝে তার এইরকম ভাব আসতো, আর সেসময়ে তাকে সামলানো এক অসম্ভব ব্যাপার। আমি বকাবকি করতে ভালোবাসি না, এইসময় ওর সঙ্গে খুব ঠাণ্ডামাথায় কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে বলে আমি ওর দিকে আর

না তাকিয়ে নিজের মনে কোটটা সেলাই করতে বসলাম। পনের কুড়ি মিনিট ধরে ঘরে অখন্ড নীরবতা, মনে হলো যেন ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে।

শুরা আমার পেছন থেকে গুণগুণ করে উঠলো—"মা এবার আমাকে মাপ করো—আর এরকম করবো না।"

জয়াও বলল—"মা এবার ওকে মাপ করো।"

আমি মাথা না তুলেই বললাম—"বেশ।"

অনেক রাত পর্যন্ত বসে কোটটাকে সারালাম, পরের দিন যখন জাগলাম তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে, চেয়ে দেখি আমার পায়ের কাছে শুরা দাঁড়িয়ে আছে কখন আমি চোখ খুলবো সেইজন্য।

অপরাধী ভাবে খুব নিচু সুরে শুরা বলল—"মা এবার আমাকে মাপ করো—আর কখনও এরকম হবে না"—আগের বারের সেই কথাগুলোই, কিন্তু বলার মধ্যে কত তফাত, সত্যিকারের দুঃখ আর অনুতাপ মেশানো এবার।

জয়াকে যখন একলা পেলাম—আমি জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি শুরাকে কিছু বলেছ কাল রাত্রের ব্যাপার নিয়ে?"

একটুক্ষণ থেমে সে বলল—"হ্যাঁ।"

"কি বলেছো ওকে?"

আমি বলেছি "তোমাকে সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। তাতে তোমার ভয়ানক কষ্ট হয়। আরও বলেছি তুমি রাগ করনি খুব, কিন্তু ভাবছো—যে ওভারকোটটা যে একেবারে গিয়েছে, এখন কি করে চলবে।"

চেল্যুস্কিন

আমি শুরাকে জিজ্ঞেস করলাম—"বাবা যে সেদভ্এর অভিযান গল্পটা বলেছিলেন মনে আছে?"

"আছে মা।"

"মনে আছে যাত্রার আগে সেদভ বলেছিল ঃ এরকম যন্ত্রপাতি নিয়ে আমরা কি করে মেরুদেশে যাবো? আশিটা কুকুর-এর বদলে আমাদের মোটে কুড়িটা কুকুর আছে। আমাদের পোশাকপরিচ্ছদ ছেঁড়া, খাবারের অভাব,...মনে আছে? তাহলে শোন একটি বরফভাঙ্গা জাহাজ উত্তর মেরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে, তারা কতো সব জিনিসপত্রই না জাহাজে নিয়েছে—সূঁচ থেকে আরম্ভ করে গরু পর্যন্ত।"

"গরু, কিরকম গরু?"

"হ্যাঁ, জাহাজে ছাব্বিশটা জ্যান্ত গরু, চারটা শুয়োর, টাট্কা আলু আর তরকারি, এবার বোধহয় নাবিকরা আর খাবারের অভাবে কষ্ট পাবে না।"

আমার কাঁধের উপর দিয়ে কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়া বলল—"ওরা শীতেও আর কষ্ট পাবে না, কি পরিমাণ জিনিসপত্র নিয়েছে একবার দেখ—লোমের কাপড়চোপড়, বিছানা ব্যাগটাও লোমের, তারপর কয়লা, বেনজিন, কেরোসিন..."

শুরা অন্যমনস্কের মতো বলে উঠল—"আর স্কি, স্লেজ, আর বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রপাতি,...বন্দুক...আরে...কতকিছু যে নিয়েছে...সীল আর শ্বেতভাল্লুক মারবে বন্দুক দিয়ে কি মজা।..."

তখনও আমি ভাবতে পারিনি যে চেল্যুস্কিন জাহাজটি শীঘ্রই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে। খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যা বেশি বার হতো না, সাধারণ খবর হয়তো আমার চোখেই পড়তো না, তাই সেদিন যখন শুরা হঠাৎ একেবারে সাংঘাতিক খবর নিয়ে এলো আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

শুরা উস্কোখুস্কো চুলে একেবারে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল —"মা, চেল্যুস্কিন জাহাজের কথা তুমি বলেছিলে না—তার কি হয়েছে আমি নিজের কানে শুনে এলাম।"

"কি হয়েছে?"

"ভেঙে গিয়েছে, বরফের মধ্যে!"

"আর লোকগুলো!"

"তাদের সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে। সবাই পড়েছিল বরফের চাঁইয়ের উপরে. একজন খালি জাহাজের ডেকের থেকে বাইরে পড়ে গিয়েছিল।"

একেবারেই অবিশ্বাস্য। শুরার কথা কিন্তু গালগল্প নয়! গোটা দেশ জুড়ে এই একই বিষয়ের আলোচনা. (শুরা স্থির বিশ্বাসের সুরে বলল—"১৩ তারিখটা যে অলুক্ষণে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।") ১৩ই ফেব্রুয়ারি উত্তর মেরুর তুষারস্রোত জাহাজটাকে ধাক্কা দেয়, প্রচণ্ড চাপে জাহাজের ডান দিকটা দুমড়ে গর্ত হয়ে যায়, জাহাজটা ঢেউয়ের তালে ভেসে যায়।

দু ঘন্টা সময়ের মধ্যে লোকেরা দু'মাসের খাবার, তাঁবু, বিছানাপত্র. একটা এরোপ্লেন, একটা বেতার কারখানা সব নামিয়ে নিয়ে এলো। ভাগ্যের লেখা মেনে নিয়ে বেতারে যোগাযোগ স্থাপন করলো মেরু কেন্দ্রের চুকোৎস্ক দেশের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি বাসস্থান, রান্নাঘর, সংকেতস্তম্ভ নির্মাণ করে ফেললো।

বেতারে এবং কাগজে শীঘ্রই আরও খবর পাওয়া যেতে লাগলো ; চেল্যুস্কিন নাবিকদের উদ্ধারের জন্য পার্টি আর সরকার মিলে একটা আর্তত্রাণ সমিতি গঠন করেছেন, অবিলম্বে গোটা দেশটাই উদ্ধারের কাজে লেগে গেল। বরফ ভাঙা কলগুলো মেরামত করা হতে থাকলো, এরোপ্লেন, বরফের উপর দিয়ে চলার উপযুক্ত বিমানপোত তৈরি হলো যে কোন মুহূর্তে উড়বার জন্য।

উত্তর অন্তরীপস্থিত ওয়েলেন ও প্রভিডেন্স উপসাগরের বিমানপোতগুলি অকুস্থান পরিদর্শন করার জন্য যাত্রার আয়োজন করলো। শিকারী কুকুরের দল ওয়েলেন থেকে তাঁবুর দিকে ছেড়ে দেওয়া হলো। মহাসাগর অতিক্রম করে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাত্রা করলো 'ক্রাসিন' নামে বরফভাঙা জাহাজ। স্মোলেনস্ক আর স্তালিনগ্রাদ জাহাজ দুটি বিমানবহর নিয়ে গেল অলিউতরস্কি অন্তরীপে, সেখান থেকে তারা যে দ্রাঘিমারেখার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো সেখানে আজ পর্যন্ত শীতকালে কেউ যেতে সাহস করেনি। তারা অলিউতরস্কি অন্তরীপে এরোপ্লেন বয়ে নিয়ে গেল।

আমার তো মনে হয় না যে আমাদের দেশে এমন একটি লোকও ছিল চেল্যুস্কিন-এর নাবিকদের কথা নিয়ে যাদের ভাবনা ছিল না। জয়া আর শুরা তো রুদ্ধশ্বাসে ওদের কি হয় না হয় নজর রাখছিল। খবরের কাগজ পড়া বা রেডিও শোনার আমার দরকার হতো না, কারণ শিশুরা খুঁটিনাটি পর্যন্ত

প্রত্যেক ঘটনা বেশ ভালোভাবেই জানতো, ঘন্টার পর ঘন্টা ওরা একই বিষয় নিয়ে তর্ক করে যেতো। 'চেল্যুস্কিন'-এর নাবিকরা এখন কি করছে? কি ভাবছে তারা? ভয় পেয়েছে বুঝি?"

ভাসমান বরফরাশির উপরে দুইজন ছোট ছেলে নিয়ে একশতচারজন আটকা পড়েছিল ঐ শিশু দুটির উপর শুরার কি হিংসাই না হতো।

"আচ্ছা ওদের কেন এতো সৌভাগ্য হলো বলতো? ওরা কিই বা বোঝে। একজনের তো মোটে দু'বছর বয়স, আর একজনের তো এখনও দোলনা ছাড়ার বয়সই হয়নি, আর আমি যদি সেখানে থাকতুম..."

"আচ্ছা শুরা ভালো করে ভেবে দেখো দেখি! কি করে এটাকে তুমি সৌভাগ্য বলতে পারো! লোকেদের এতো বিপদ, আর তুমি কিনা বলছো সৌভাগ্য?"

আমার আপত্তি তো শুরা আমলের মধ্যেই আনলো না। চেল্যুস্কিন নাবিক-দের সম্বন্ধে ওদের ধারণা আর তাদের অবস্থা সম্বন্ধে কাগজের সমস্ত বিবরণ শুরা কেটে রেখেছিল। উত্তর দিকের শিবির আর তুষারশৈলীর ছবি ওর নিজের ধারণা মতো এঁকে যেতো।

আমরা সবাই জানতাম—ভয়ানক বিপদের সামনে পড়ে চেল্যুস্কিনের লোকেরা তাদের সাহস বা বুদ্ধি হারায়নি। তারা ছিল দৃঢ়চেতা, আর সত্যিকারের রুশ নাগরিকের মতো অসম সাহসী। কেউই নিরুৎসাহ হয়নি। প্রত্যেকেই যার যার কর্তব্য করে যাচ্ছিল, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল, ওরা যে কাগজ ঐ সময় বার করছিল যথেষ্ট সঙ্গতভাবেই তার নাম দিয়েছিল "হার মানবো না"—খালি টিনের কৌটো দিয়ে স্টোভ বানাল, টিন কেটে কড়া আর বাতি তৈরি হলো, কাঠের টুকরো কেটে চামচে হলো। ঘরের জানালাগুলো তৈরি করেছিল খালি বোতল বসিয়ে। তাদের সমস্যা পূরণ করবার মতো কৌশল, চাতুর্য আর ধৈর্য সবই তাদের ছিল। আর বরফের উপর এরোপ্লেন নামবার জায়গা তৈরি করার জন্য, পরিষ্কার করতে গিয়ে কত মণ বরফ যে ওদের বইতে হয়েছিল তার হিসাবই করা যায় না! সারাদিন ধরে ওরা পরিশ্রম করে পরিষ্কার করে রাখতো, আর রাত্রে ওদের সমস্ত কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ করে নূতন তুষারপাত হয়ে আবার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিত। কিন্তু চেল্যুস্কিনের অসমসাহসী লোকেরা জানতো সাফল্য অবশ্যম্ভাবী, সোভিয়েতদেশে পার্টি আর কমরেড স্তালিন ওদের বিপদে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত থাকবেন না। তারপর মার্চের প্রথমদিকে (জয়া খবরটা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সময়টিতে") লিয়া-পিদেভ্স্কির বিমান বরফের উপর অবতরণ করল, স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়েদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলো, চারদিকেই শুনতে পেলাম, "লিয়াপিদেভ্স্কি—কি আশ্চর্য মানুষ।"

জয়া আর শুরা তো মলোকভের নাম খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগলো। আর সত্যি বলতে কি এই নির্ভীক বৈমানিকের কাজের কথা মনে করলেও ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এই নির্জন নির্বাসিত অভিযাত্রীদের তাড়াতাড়ি উদ্ধার করার জন্য তিনি বিমানের পাখায় বাঁধা প্যারাসুট দোলনায় করে তাদের বয়ে নিয়ে গেলেন। একদিনে তিনি কয়েকটা 'ক্ষেপ'ই দিয়ে ফেললেন। তিনি একলাই উনিশ জনকে বরফের চাঁই থেকে উদ্ধার করলেন।

শুরা তো ঘোষণা করলো—"যদি তাঁকে শুধু দেখতে পেতাম।"

সরকারী কমিশন "চেল্যুস্কিন" নাবিকদের উদ্ধার করার জন্য কামচ্‌কাটকার

আর ভ্ল্যাডিভস্টক থেকে আরও বিমানবহর পাঠালেন। এই সময় খবর পাওয়া গেল শিবিরের চারদিককার তুষারশৈলীর জায়গায় জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। নূতন বড়ো বড়ো ফাটলের সঙ্গে দেখা দিয়েছে বড়ো বড়ো জলের চেহারা। বরফ সরে গিয়ে ক্রমশ পাতলা হয়ে এলো। স্ত্রীলোক আর ছেলেদের সরাবার পর সেই রাত্রেই, ওদের অস্থায়ী বাসস্থান সেই কাঠের ব্যারাকগুলো ধসে পড়লো, লিয়াপিদেভ্স্কির বিমানখানা খুব সময়মতো এসে পৌঁছেছিল যাহোক।

আবার আর এক বিপদ এসে উপস্থিত। একচাঁই বরফ এসে রান্নাঘরটাকে ভাসিয়ে দিল, বিমানাবতরণের ক্ষেত্র ধ্বংস করলো, সেখানেই দাঁড়িয়েছিল শেলপনেভের বিমানখানা। অবস্থাটা একেবারে ভয়াবহ, প্রতি মিনিট প্রতি দিন তার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছিল। বসন্ত এগিয়ে আসছিল। বরফ গলবার মতো গরম দিনগুলোকে শুরা আন্তরিক ঘৃণার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালো, নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে বললো—"আবার রোদ আসছে, আবার ছাদগুলো ভাসিয়ে দেবে—"

বরফে আটকে থাকা লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছিল, অবশেষে ১৩ই এপ্রিল সেখানে আর কেউ রইলো না। অবশিষ্ট ছয়জনকে নিরাপদে দেশে নিয়ে আসা হলো।

জয়া এবার বিজয়ীর সুরে শুরাকে জিজ্ঞাসা করলো—"কেমন ১৩ই না অলুক্ষণে সংখ্যা!"

শুরা গভীর আবেগের সঙ্গে বললো—"সব বিপদ কেটে গেছে জেনে কি আনন্দই যে হচ্ছে!"

আমি নিশ্চিত জানি বরফ থেকে উদ্ধার কাজের বীর যদি ওরা নিজেরা হতো, তাহলেও ওরা এর চেয়ে বেশি খুশি হতো না।

গহ্বরে নিশ্চিন্তে বাস যারা করে তাদের প্রত্যেকেরই বরফে আটকে-পড়া মানুষগুলোর জন্যে আশঙ্কার অবধি ছিল না, দীর্ঘ দুই মাস ব্যাকুল প্রতীক্ষার এবার অবসান হলো।

আগে আমি সুমেরু অভিযান সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি—আনাতোলি পেত্রোভিচ্ নিজে উত্তর মেরু সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী ছিলেন, তাঁর সে সম্বন্ধে কতকগুলো গল্প-উপন্যাস জাতীয় বই ছিল। সেগুলো এবং ছোটবেলায় পড়া বইগুলো থেকে আমার ধারণা হয়েছিল যে বরফে আটকে-পড়া মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, অবিশ্বাস, ঘৃণা, এমন কি ইতর প্রাণীসুলভ আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা, দুঃসময়ের বন্ধুদের জীবন বা স্বাস্থ্যের বিনিময়েও নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়াস পর্যন্ত দেখা দেয়।

কিন্তু এ সব কথাই আমার ছেলেমেয়ে, যে-কোন সোভিয়েত ছেলেমেয়ের কাছে একেবারে অজানা। তাদের চোখের একশত "চেল্যুস্কিন" নাবিকদের এই দু'মাসের ব্যবহার, বরফের উপর জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা, আর বন্ধুত্ব—একান্ত পার্থিব, স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল।

জুনের মাঝামাঝি মস্কো চেল্যুস্কিন নাবিকদের অভিনন্দন জানালো। যদিও আকাশ ছিল ধূসর, প্রাণহীন, তবু এতো উজ্জ্বল আর এর চেয়ে আনন্দদায়ক দিন আমি আর পাইনি। ভোরবেলাই ছেলেমেয়েরা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল গোর্কী স্ট্রীটে। মনে হলো সারা মস্কোর লোক ভেঙে পড়েছে এখানে। ফুটপাথে এক ইঞ্চি জায়গাও ছিল না। বিমানবহরগুলো উপরে চক্কর দিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্রই, বাড়ির দেয়ালে, ছোট ছোট জানালায়, বড়ো বড়ো দোকানের

জানালায়, ঐ চেল্যুস্কিন বীর আর তাদের উদ্ধারকর্তাদের ছবি ঝুলছিল—যারা আমাদের কাছে এমনই আদরের হয়ে উঠেছিল। সব জায়গাতেই বিরাট বিরাট নীল লাল নিশান, উৎসাহব্যাঞ্জক অভ্যর্থনার বাণী আর ফুলের অন্ত নেই।

বেইলোরুশিয়ান রেল স্টেশনের দিক থেকে হঠাৎ কয়েকটা গাড়ি এসে উপস্থিত হলো। প্রথমটা দেখলে ওদের গাড়ি বলে মনেই হবে না, যেন চাকাওয়ালা বাগান, অথবা ফুলের রাশি আসছে। রেড স্কোয়ারের উদ্দেশ্যে ওরা চলে গেল। ফুলের স্তূপ, বড় তোড়া, গোলাপের মালা, সবার মাঝখানে একটি লোকের সহাস্য, উত্তেজিত মুখ কোন রকমে দেখা গেল, তার হাত নাড়াও লক্ষ্য করা গেল। ফুটপাথ থেকে, বারান্দা থেকে, জানালা থেকে, ছাদ থেকে লোকেরা আরও ফুল ছুঁড়ে দিতে লাগলো। বিমান থেকে প্রজাপতির পাখার পত্ পত্ আওয়াজ করে প্রচারপত্র পড়ে নিচের পীচঢালা রাস্তাকে একেবারে ঢাকা দিয়ে দিল।

রোদে-পোড়া লম্বা মতো একজন শুরাকে তুলে নিয়ে তার কাঁধে বসিয়ে নিল, আর সেখান থেকে সে তো অন্য সবার চেয়ে চেঁচাতে লাগলো। জয়া রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো—"কি আনন্দের দিন।" মনে হলো সবার মুখেই সেদিন সেই এক কথা।

জয়া যে শুরার চেয়ে বড়ো সে কথা সে কখনও ভুলতো না, তাই সে যখন তখন বলে উঠতো—"শুরা জামার বোতাম লাগাও দেখি! কোথায় গেল বোতাম সব? আবার ছিঁড়েছ, লাগিয়ে দিলেই বা কি হবে? আচ্ছা তুমি কি ইচ্ছে করে ওগুলো ছিঁড়ে ফেল? এবার তাহলে নিজেই বোতাম লাগাতে শেখ।"

শুরা তো একেবারে ওর হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল—কড়া শাসনে রাখলেও জয়া কখনও ওর উপর নজর রাখতে কসুর করতো না। কখনও কখনও রেগে গেলে জয়া ওকে আলেকজান্দার বলে ডাকতো, ছোট্ট শুরা থেকে সে নামের গাম্ভীর্য যেন ফুটে উঠতো বেশি।

"আলেকজান্দার তোমার হাঁটু দেখা যাচ্ছে আবার, শীগগির তোমার মোজা খোল দেখি!"

শুরা তো বাধ্যভাবে মোজা খুলে নিতো, আর জয়া সব ছেঁড়াগুলো সেলাই করে দিতো।

ভাইবোন দুজনে একেবারে অবিচ্ছেদ্য ছিল, তারা এক সঙ্গে ঘুমোবে, এক সঙ্গে উঠবে, এক সঙ্গে স্কুলে যাবে, এক সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসবে। যদিও শুরা জয়ার চেয়ে দু' বছরের ছোট ছিল, ওরা দুজনে লম্বায় ছিল প্রায় সমান, তার উপর শুরার গায়ে ছিল বেশি জোর। শুরা তরুণ শাল গাছের মতো স্বাস্থ্যে সম্পদে পূর্ণ হয়ে উঠছিল, আর জয়া সেরকমই রোগা, দুর্বল ছিল। সত্যি বলতে, জয়া মাঝে মাঝে কটু কথা বলে শুরাকে বিরক্ত করলে বা রাগিয়ে দিলেও শুরা খুব কমই বিদ্রোহ করতো, কিন্তু ঝগড়া চরমে উঠলেও জয়াকে ধাক্কা দেওয়া বা মারার কথা কোনদিন শুরার মাথায় আসেনি। প্রায় সর্বদাই বিনা প্রশ্নে সে দিদির আদেশ মাথা পেতে নিত।

চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে শুরা বললো—"ঢের হয়েছে। তোমার সঙ্গে একই বেঞ্চে আমি আর বসবো না, একটা মেয়ের সঙ্গে অনেকদিন বসেছি, আর কতো?"

জয়া তর্ক মোটেই না করে স্থিরভাবে জবাব দিল—"তুমি আমার সঙ্গেই বসবে, না হলে আমি তো তোমাকে জানি, ক্লাশময় কাগজের প্লেন উড়িয়ে বেড়াবে।"

তার স্বাধীনতায় হাত পড়ায় শুরা একেবারে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে উঠলো ; আমি এ ব্যাপারে মাথা গলালাম না। পয়লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা শুরা, তুমি এবার কোন ছেলের পাশে বসছো"—শুরা ভুরু কুঁচকে, দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো—"জয়া কস্‌মোদেমিয়ানস্কায়া নামে একটা ছেলের পাশে, ওর সঙ্গে একবার আলাপ করেই দেখো না।"

অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জয়া কিরকম ব্যবহার করে জানতে আমার খুব ইচ্ছা হতো। আমি তো ওকে খালি শুরার সঙ্গে আর রাস্তার খেলা করা ছেলেদের সঙ্গে দেখেছি। শুরার মতো অন্য ছেলেমেয়েরাও জয়ার কথা খুব ভাবতো, আর ওর প্রত্যেক কথাই শুনতো। স্কুল থেকে ফেরার পথে ওরা দূর থেকেই জয়ার হাঁটার ভঙ্গি লাল পশমের টুপী দেখে চিনতে পারতো, চিৎকার করে ওর সঙ্গে দেখা করতে ছুটতো। তাদের চিৎকারের মধ্যে শুধু শোনা যেতো, "পড়, খেল, বল।" শুরার হাতে স্কুল-ব্যাগটা দিয়ে জয়া শীত আর উত্তেজনায় গোলাপী গাল নিয়ে তার লম্বা হাতদুটো দু'পাশে এমনভাবে বাড়িয়ে দিতো যেন যতোগুলো বাচ্চা এসেছে তাদের প্রায় সবগুলোকেই নিয়ে নিতে পারে হাতের বেড়ের মধ্যে।

কখনও ওদের লাইনে দাঁড় করিয়ে সেও তাদের সঙ্গে আস্পেন বনে শেখা কোন বিপ্লবী গানের সুর বা স্কুলে শেখা কোন গান গেয়ে মার্চ করতে করতে ওদের সঙ্গে চলতো। কখনও বরফের গোলা নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলত কিন্তু তার সে খেলার মধ্যেও থাকতো বড়দের মতো একটা গাম্ভীর্য। শুরা কিন্তু এরকম ছিল না, সে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যেতো, বিদ্যুতের মতো ও বরফ-গোলকগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতো, ছুঁড়ে দিতো, এঁকেবেঁকে বলগুলোকে পাশ কাটিয়ে দিতো বিপক্ষকে মুহূর্তমাত্র ভাববার অবসর না দিয়ে আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

জয়া চেঁচিয়ে উঠতো, "শুরা পালাও বলছি, ওরা এতো ছোট ওদের সঙ্গে ওরকম খেলতে নেই তা কি তুমি জানোনা?"

ছোটদের তখন সে স্লেজগাড়ির উপর তুলে নিয়ে টানতো, তোলার আগে দেখে নিত, প্রত্যেকের জামায় ঠিকভাবে বোতাম লাগানো আছে, ভালো করে গরম জামা জড়ানো আছে, কারোরই কানে হাওয়া লাগছে না বা জুতোর ভিতরে বরফের কুচি ঢুকে নেই।

গ্রীষ্মকালে, একদিন আমি কাজ থেকে ফেরার সময় দেখি, এক পুকুরের পাড়ে একদল রাস্তায়-চরা ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে। হাঁটু ঘিরে হাত-দুটোকে রেখে জয়া বসে আছে, বেশ চিন্তিতের মতো জলের দিকে চেয়ে ও যেন কি বলে চলেছে। আমি আরও কাছে এলাম।

সূর্য উঠেছে উপরে, কুয়া আছে বহুদূরে, সূর্যের প্রখর তাপে দরদর ঘাম ঝরে, দেখতে পেলো ওরা ছাগলের খুরের গর্তে ভর্তি আছে জল। ছোট্ট ইভানুস্কা বলে উঠলো "আমি খাবো ঐ খুরের জল।" "খেওনা খেওনা ভাইমণি, তুমি কিন্তু ছাগল হয়ে যাবে।"

আমি চুপচাপ সরে পড়লাম, ওরা এমন মন দিয়ে শুনছিলো, অবাধ্য দুর্ভাগা

ইভানুস্কের দুঃখে ওরা এমন দুঃখিত হয়েছিল আর জয়াও দিদিমা মাভ্রু মিখাইলোভ্‌নার ব্যথিত সুর এমন দরদ দিয়ে অনুকরণ করছিল যে আমি আর বিরক্ত করলাম না।

কিন্তু সমবয়সীদের সঙ্গে জয়ার কিরকম ব্যবহার? এক সময় আমাদের প্রতিবেশী লীনা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে জয়া স্কুলে যেতো। তারপর একদিন দেখলাম ওরা আর একসঙ্গে যাচ্ছে না।

"লীনার সঙ্গে ঝগড়া করেছো বুঝি?"

"না ঝগড়া করিনি, কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব করতে চাই না।"

"কেন?"

"ও খালি বলবে 'আমার বাক্সটা নাও তো,' আমি কখনও বয়ে নিয়ে গিয়েছি, তারপর বললাম, 'এইবার তুমি নিজে নাও, আমার নিজেরটা বইতে হবে।' দেখো তো, ও যদি দুর্বল বা অসুস্থ হতো আমি তাহলে বয়ে নিতাম, তাতে আমার কোন কষ্টই হয় না, কিন্তু ও তো আর তা নয়—কেন আমি বইবো বল তো?"

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করার জন্য শুরা বলে উঠলো—"জয়া ঠিক বলেছে! ঐ লীনাই সবার উপর খালি কর্তৃত্ব করতে চায়।"

"বেশ, তা ঐ তানিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব নেই কেন আর?"

"ও বড্ড চাল মারে। যা বলে তাই দেখা যায় মিথ্যা। এখন আর ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না। আর পরস্পরকে বিশ্বাস না করলে কি করে বন্ধুত্ব করা যায় বল তো? ওর কথা আর কি বলব? কতো রকম খেলা আমরা খেলি, সেখানেও ও জোচ্চুরি করে। গোণার সময়ও ও জোচ্চুরি করে সব সময়।"

"কিন্তু ওরকম করা যে অন্যায় তা তো তোমার বলে দেওয়া উচিত।"

শুরা বলল—"জয়া তো কতোবার বলেছে।"

আর সব ছেলেমেয়েরাও বলেছে, এমন কি লিদিয়া নিকোলাইয়েভনা পর্যন্ত। কিন্তু ওকে কিছুতেই শোধরানো যায় না।

আমার ভাবনা হলো—জয়া হয়তো বেশি কড়া হচ্ছে—আর তার ফলে সমবয়সীদের সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ঘন্টাখানেক সময় করে নিয়ে আমি তাই লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন—"জয়া খুব সরল আর সৎপ্রকৃতির মেয়ে। ছেলেমেয়েদের শেখায় সোজা সত্যকথা বলতে। প্রথমে তা আমি ভেবেছিলাম ওর বন্ধুরা হয়তো ওর বিপক্ষে যাবে, কিন্তু তা হয়নি। ও বারে বারেই বলে—'আমি সাধুভাবে খেলার পক্ষপাতী', আর ছেলেমেয়েরাও দেখে যে ও বাস্তবিকই সত্য যা তার সমর্থন করে।"

একটু হেসে লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্‌না বললেন—"একদিন জানেন কি হয়েছিল, একটি ছেলে সবার সামনে বলে উঠলো—'লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্‌না, আপনি বলেন আপনার কাছে বিশেষ প্রিয়পাত্র বলে কেউ নেই, কিন্তু জয়া কসমোদেমিয়ান্‌স্কায়ার ব্যাপারটা কি হলো?' স্বীকার করছি—আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার কাজ করতে জয়া সাহায্য করেছে?' ও বলল—'হ্যাঁ করেছে!' আমি আর একজনের দিকে তাকিয়ে বললাম—'তোমাকে?' 'আমাকে সাহায্য করেছে।' 'তোমাকে, তোমাকে?....' দেখা গেল প্রায় সবাইকেই কোন না কোন রকমে জয়া সাহায্য করেছে। আমি বললাম—'এরকম একটি মেয়েকে ভালো না বেসে তোমরা

থাকতে পারো কি?' তারা সবাই স্বীকার করলো এ কথা।...ওরা তাকে ভালোই বাসে। আর বেশি কি ওরা তাকে শ্রদ্ধা করে, আর ওর বয়সের তুলনায় এটা কম কথা নয়।"

একটু চুপ করে থেকে লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্না বলে চললেন—"ও খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়ে, যা সত্যি বলে বুঝবে তা থেকে কেউ ওকে নড়াতে পারবে না। ছেলেমেয়েরাও জানে ও নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক। ওর নিজের কাছ থেকে যা আশা করে অন্য মেয়েদের কাছ থেকেও তাই আশা করে। ওর সংগে বন্ধুত্ব পাতানো অবশ্যই খুব সহজ নয়, তবে শুরার ব্যাপার কিন্তু একেবারেই অন্য-রকম।" হেসে লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্না বললেন—ওর অজস্র বন্ধু, একটা বিষয় অবশ্যি ভাববার আছে—মেয়েদের না ক্ষেপিয়ে বা বেণী ধরে না টান দিয়ে ওদের ছেড়ে দেবে না—এ ব্যাপারে আপনার একটু ওর সংগে আলোচনা করা উচিত।"

সার্জি মিরনোভিচ কিরভ

চারদিকে শোকচিহ্নগাঁথা কিরভের ছবি। এতো সুন্দর, শান্ত স্বচ্ছ চেহারা—মৃত্যু যেন মানায় না এখানে। খবরের কাগজের দক্ষিণ কোণে সবার উপরে ঘোষণা করা হয়েছে পার্টি আর জনগণের শত্রুরা সার্জি মিরনোভিচ্ কিরভকে হত্যা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে সকলেই দুঃখ অনুভব করেছিল। এই ধরনের দুঃখ জয়া আর শুরা এই প্রথম জানতে পেল। ওরা খুব বিচলিত হয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত ওদের এটা মনে ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন গৃহের দিকে ধাবমান বেদনার্ত জনতার স্রোত, বেতারে প্রচারিত অনুরাগ আর বেদনার বাণী, সংবাদপত্রের শোকগাথা, আর অগণিত জনসাধারণের ব্যথা ম্লান মুখ আর কণ্ঠস্বর কেবল মাত্র একটি কথাই জানিয়ে দিচ্ছিল সবাইকে....

জয়া জিজ্ঞেস করল—"মা সিৎকিনোতে কমিউনিস্টদের হত্যাকাণ্ডের কথা তোমার মনে আছে?"

জয়া খাঁটি কথাই বলেছিল। কিরভের হত্যাকাণ্ড আর গ্রামের ঐ সাতজন কমিউনিস্টদের হত্যার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। প্রাচীনপন্থীরা অদম্য ঘৃণার চোখে নতুনদের দেখে। তারপর সিৎকিনোতেও শত্রুর পিছন থেকে আঘাত হেনেছে। আর এখানেও আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে ওরা পিঠে আঘাত করেছে। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে পবিত্র জিনিসের উপর আঘাত দিয়েছে। সকলের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পাত্র, জনতার দাবির প্রতীক, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জনগণের স্বার্থে লড়াই করেছেন এমন একজন বলশেভিককে ওরা হত্যা করেছে।

সেরাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি জেগেছিলাম। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। হঠাৎ খালি পায়ে চলার হাল্কা আওয়াজ পেলাম, তারপরেই একটু ফিস্ফিসানি, "মা তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো? আমি আস্বো?"

"এসো জয়া।"

জয়া আমার গা ঘেঁষে এসে শুয়ে পড়লো—আমরা দুজনেই চুপচাপ, অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি ঘুমাওনি কেন? নিশ্চয় একটা বেজে গিয়েছে।"

জয়া আমার হাতে শক্ত চাপ দিল। তারপর বললো—"মা তরুণ অগ্রণী সংঘে আমি দরখাস্ত পাঠাতে চাই।"

"বেশ ভালো কথা।"

"কিন্তু ওরা কি আমায় নেবে?"

"নিশ্চয়ই নেবে। তোমার তো এগারো বছর পার হয়ে গিয়েছে।"

"আর শুরা?"

"শুরা কিছুদিন পরে যোগ দেবে।"

আবার আমরা চুপ করলাম।

"মা, তুমি আমাকে দরখাস্ত লিখতে সাহায্য করবে?"

"তার চেয়ে তুমি নিজে লেখ। পরে আমি দেখে দেব এতে কিছু ভুল আছে কিনা।"

আবার ও চুপ করে কি ভাবছিল, কেবল ওর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেরাত্রে ও আমার পাশেই ঘুমালো।

যেদিন অগ্রণী সংঘে ভর্তি হবে তার আগের রাত্রেও জয়া আবার বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আবার ঘুম আসছে না?" চাপা গলায় জয়া বললো—"আমি কালকের কথা ভাবছি।"

পরের দিন আমি মাত্র স্কুল থেকে সকাল সকাল ফিরে খাতাপত্র দেখতে বসেছি—ও পাখির বেগে স্কুল থেকে এলো—আমার নীরব জিজ্ঞাসার জবাব দিল সেই মুহূর্তেই—"আমি একজন তরুণ অগ্রণী।"

আমাদের কে দেখতে এসেছিল, বলো দেখি

কিছুদিন কেটে গেল—একদিন আমি স্কুল থেকে এসে জয়া আর শুরাকে ভয়ানক উত্তেজিত দেখলাম—ওদের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলাম খুব অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ওরা দুজনে এক সংগে চেঁচিয়ে উঠল—"কে আমাদের স্কুল দেখতে এসেছিল বলতো? মলোকভ, মলোকভ, আমাদের স্কুলে এসেছিলেন। সেই যে চেলিওস্কা নাবিকদের উদ্ধার করেছিলেন, সেই মলোকভ, সকলের চেয়ে বেশি লোককে তিনিই বাঁচিয়ে ছিলেন।"

অবশেষে শুরা আরও পরিষ্কার করে বলতে আরম্ভ করল—"আচ্ছা প্রথমে তো তিনি প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়িয়েছিলেন, সর্বত্রই বেশ একটা গুরুগম্ভীর ভাব...কিন্তু কিরকম যেন বেখাপ্পা...তারপর তিনি নেমে এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁর চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালাম। আর কি মজাই হলো। তিনি এতো পরিষ্কার আর সহজ সহজ সব কথা বললেন। জানো তিনি কি বললেন—"বিস্তর লোক সুমেরু প্রদেশের মলোকভ-এর ঠিকানায় চিঠি দেয়... কিন্তু আমি তো মোটেই সুমেরু প্রদেশের লোক নই, আমার বাড়ি হলো ইরিনিনস্কয় গ্রামে, কেবল মাত্র চেল্যুস্কিন নাবিকদের উদ্ধার করার জন্য আমি সুমেরু প্রদেশে একবার উড়ে গিয়েছিলাম।"

তারপর তিনি বললেন—"তোমরা বোধহয় মনে কর, বৈমানিক বীরদের ধরন বোধহয় অন্যদের থেকে আলাদা, কোন বিশেষ ধরনের লোক তারা। আমরা সবাই কিন্তু সাধারণ লোক, চেয়ে দেখ দেখি আমার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে কি? আর সত্যি মা—তিনি একেবারে একজন সাধারণ লোক—আবার তার সঙ্গেই অসাধারণ।" শুরা এরপর শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে হঠাৎ চুপ করতে গিয়ে বলে ফেললো তার মনের কথা..."আমি ত্রিলোকভকে দেখতে পেয়েছি।"

শুরার সবচেয়ে প্রিয় কামনা সত্যি সত্যি সফল হলো।

রূপকথার দেশে একদিন

অনেকদিন ধরেই আমরা আলখাল্লাপরা রবার বুট আর চওড়া কিনারাওয়ালা মালকাটার টুপি-পরা তরুণ-তরুণীদের দেখা পেতাম, তাদের টুপিগুলো শুকনো কাদামাটিতে মাখামাখি। ওরা হলো মস্কোর ভূগর্ভস্থিত রেলপথ 'মেট্রো'র নির্মাতার দল। তারা খুব ব্যস্তসমস্তভাবে খনির একমুখ থেকে আর এক মুখে দৌড়ে দৌড়ে যায়। ওদের পালা শেষ হয়ে গেলে ধীরেসুস্থে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেলেদুলে বেড়ায়। ওদের দিকে তাকালে ওদের দাগ-ওয়ালা ঢিলে আলখাল্লা চোখে পড়ে না, পড়ে ওদের মুখগুলো। কি সুন্দর দৃঢ়তাব্যঞ্জক সে মুখগুলো—ক্লান্তিতে ছাপিয়ে গর্বে আর আনন্দে সেগুলো জ্বল জ্বল করছে।

ঐ আলখাল্লা-পরা লোকগুলো সকলেরই শ্রদ্ধা আর কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল—ওরা 'মেট্রো'র প্রথম নির্মাতা—খেলার কথা নয়। খুব সম্ভবত শুধু মস্কোতেই নয়, দূরে আস্পেন বনে, সুদূর সিংকিনোতে পর্যন্ত লোকেরা মেট্রোর খবরাখবর পাবার জন্য খবরের কাগজ হাতড়ে বেড়াতো। তারপর—১৯৩৫ সালের বসন্তকালের সেই স্মরণীয় দিনটিতে খবর পাওয়া গেল 'মেট্রো' প্রস্তুত হয়েছে।

জয়া ঘোষণা করলো—"মা আমাদের তরুণ অগ্রণী সংঘ আগামী রবিবারে মেট্রো দেখতে যাবে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?"

রবিবার সকালে আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই আজ আর মেট্রো দেখতে যাবে না, কিন্তু ওরা এর মধ্যেই বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি পোশাক পরিচ্ছদ পরতে শুরু করেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম—বেড়ানো স্থগিত রাখার কথাটা ওদের কল্পনাতেও আসে নি।

"কিন্তু দেখেছ আকাশের অবস্থা?"

শুরা বেপরোয়াভাবে বলে উঠলো—"এর নাম বৃষ্টি নাকি? আমরা বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই থেমে যাবে।"

অনেক ছেলেমেয়েই ট্রাম স্টপে এসে জড়ো হয়েছে। দেখে মনে হলো বৃষ্টি যেন ওদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা চেঁচিয়ে, হেসে স্ফূর্তি করছিল, সোল্লাসে ওরা আমাদের আহ্বান জানালো।

ট্রামে উঠে ভিড় আর হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে আমরা সকলে অখোৎনি রিয়াদ্‌-এ এসে পৌঁছলাম।

ওরা মার্বেল পাথরে বাঁধানো চত্বরে এসে পেঁছামাত্রই সব চুপচাপ হয়ে গেল। এখানে কথা বলার সময় নেই—কত কিছু দেখবার আছে।

শান্তভাবে আমরা চওড়া সিঁড়িগুলো দিয়ে নেমে এসে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। সত্যিকারের বিস্ময় এখানেই শুরু হলো। আর এক সেকেন্ড পরেই আমি, জয়া, আর শুরা নিম্নমুখী ঢেউখেলানো পাতের রিবনের উপর পা দিলাম প্রথম। চুপচাপ বেশ সহজভাবে আমাদের নীচে নিয়ে চলল —আরও নিচে, আরও নিচে। আমাদের পাশ দিয়ে কালো লোহার পাহাড়গুলো সরে সরে চলেছে—তাদের উপর হাত দিলে মনে হয় যেন রবারের মতো। তাদের পিছনে, চক্‌চকে পরিচ্ছন্ন বেষ্টনীর পেছনে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে-ওঠা স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি দৌড়ে চলেছে। নীচের দিকে নেমে যাবার বদলে এটা আবার উপরদিকে আমাদের দিকে আসছে। অনেক লোক উপরে উঠছে—তারা আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। একজন আমাদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে, অন্য আর একজন চিৎকার করে কি বলছে, কিন্তু আমাদের তখন সেদিকে তাকাবার সময় নেই, যাওয়া নিয়ে আমরা তখন ভয়ানক ব্যস্ত।

তারপর, আবার আমাদের পায়ের তলায় কঠিন মাটি। চারদিক কি সুন্দর! উপরে, উঁচুতে কি ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে...আর এখানে...

আমি একবার এক বুড়ো গল্প-বলিয়ের কথা শুনেছিলাম। সারা জীবন ধরে তিনি গ্রামে বাস করার পর বুড়ো বয়সে তাঁকে সকলে মিলে মস্কো নিয়ে এলো, সেখানে তিনি ট্রাম, মোটর, এরোপ্লেন এই সব দেখেন। তাঁর সঙ্গীরা ভেবেছিল এইসব দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি সবকিছুই বেশ সহজভাবে নিলেন, সারাজীবন ধরে তিনি ম্যাজিক কার্পেট, মাইলখানেক লম্বা চামড়ার জুতো...এই সব নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন, তাই মস্কোর জিনিসপত্রে তিনি যেন পরিচিত রূপকথার রাজ্যকে সত্যি হতে দেখলেন।

ছেলেমেয়েদের মেট্রো দেখতে এসে এমনি ভাব হলো। তাদের চোখে মুখে আনন্দ ছিল, কিন্তু ঠিক বিস্ময় ছিল না—তারা যেন অবশেষে তাদের চিরদিনের চেনা রূপকথার দেশে প্রবেশ করতে পেরেছে।

আমরা প্ল্যাটফরম ধরে এগিয়ে গেলাম, আর হঠাৎ এই সময় একদিক থেকে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একঘেয়ে ঘর্ঘর শব্দ শোনা যেতে লাগলো—দুটো আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দেখা গেল...আর এক সেকেন্ড পরেই লম্বা হাল্কা রঙের বগিওয়ালা একটা রেলগাড়ি—চওড়া কাঁচের জানালার নিচের ধার দিয়ে দিয়ে লাল চাদরের পাড় বসানো তাতে—আস্তে আস্তে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালো। দরজাগুলো কোন্ অদৃশ্যহাতে খুলে গেল, আমরা ভিতরে ঢুকে বসে পড়লাম, চলা শুরু হলো, আর সে কী তীব্র বেগ!

শুরা জানালার সঙ্গে এঁটে বসে রইল আর যতোগুলি আলো পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল তা গুনছিল, তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

"ভয় পেয়ো না, মেট্রোতে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না। 'পাইওনীয়ারস্কায়া প্রাভ্‌দা'তে একথা বলা হয়েছে, মেট্রোতে স্বয়ংচালিত স্টপ আর ট্রাফিক আলো আছে—তাদের বলা হয় বৈদ্যুতিক পাহারাওয়ালা।"

শুরার দিকে তাকিয়ে মনে হলো ও কেবলমাত্র আমাকেই আশ্বাস দিচ্ছে না।

সেদিন আমরা প্রত্যেকটা স্টেশনে গেলাম। আমরা সব জায়গাতেই থামলাম,

সব কয়টা স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আবার নেমে এলাম। চেয়ে চেয়ে আমাদের চোখের খোরাক যেন আর ফুরায় না, দ্জারঝিনস্কি স্টেশনের পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ছোট্ট টালিগুলোকে দেখাচ্ছিল যেন মৌচাকের সেলের মতো। কমসোমলস্কায়া স্টেশনের ভূগর্ভস্থিত বিরাট প্রাসাদ, ধূসর, সোনালী আর বাদামী রঙের পাথরের দেয়াল মেঝে সবই এতো আশ্চর্য রকম সুন্দর যে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

রেডগেট স্টেশনের দেয়াল কুলুঙ্গিগুলোর দিকে চেয়ে শুরা বলে উঠলো, "মা দেখ, ওরা সত্যি সত্যি লাল গেট বানিয়েছে।"

প্যালেস অফ সোভিয়েত স্টেশনে আলোভরা স্তম্ভগুলোর দিকে চেয়ে জয়া আর আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। উপরে বিরাট বিরাট শালুকের মতো ঢেউখেলানো আলোগুলোকে মনে হয় যেন ওরা গলে ছাদের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। পাথর যে এতো নরম দেখাতে পারে কিংবা এতো আলো প্রতিফলিত করতে পারে তা কখনও ভাবি নি।

আমাদের সঙ্গে একটি গোলমুখ আর কালো চোখওয়ালা ছেলে ছিল (জয়া আমাকে ওর কথা শুনতে দেখে বলল, প্রথম অগ্রণী দলের নেতা). মনে হবে ও সেই দলেরই একজন, যারা পৃথিবীতে সবকিছুই জানতে চায় আর তারা যা পড়ে তার প্রতিটি কথা পর্যন্ত মনে রাখে। সেই আমাদের বলল—দেশের সব জায়গা থেকে এখানে পাথর আনা হয়েছে, এটা এসেছে ক্রিমিয়া থেকে, ওটা কারেলিয়া থেকে, কিরভ স্টেশনের স্বয়ংক্রিয় সিঁড়িটা পঁয়ষট্টি মিটার লম্বা। এসো গুণে দেখি একবারে কত লোক আসছে।

শুরা আর ও সোজা উপরে উঠে গিয়ে আবার নেমে এল। ওরা এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ভুরু কুঁচকে মনযোগ দিয়ে কি যেন ভেবে নিল, ঠোঁট-গুলো ওদের নিঃশব্দে নড়ছিল।

তুমি কত গুণেছ? একশ পঞ্চাশ, আমি গুণেছি একশ আশি, ধরা যাক একশ সত্তর। উঃ! এক ঘন্টায় দশহাজার লোক। সিঁড়িটা যদি নিশ্চল থাকতো, তাহলে ভেঙে পড়তো, না? জানো, ব্রিটিশরা একটা স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি তৈরি করে দেবার জন্য কত মজুরি চেয়েছিল? আমাদের রুবল-এ দশ লক্ষ মোহর। কিন্তু তখন আমরা ঠিক করে নিয়ে আমাদের কারখানায় নিজেরাই তৈরি করে নিলাম। জানো কোন কোন কারখানায় এর জন্য কাজ করছিল? মস্কো ভ্ল্যাদিমির ইলিচ্ ওয়ার্কস, লেনিনগ্রাদের কিরভ ওয়ার্কস, আর গোরলোভকার কারখানাগুলো, ক্রামাটোরস্ক-এর কারখানাও।

সন্ধ্যার দিকে যখন বাড়ি ফিরলাম, ক্লান্তিতে আমরা প্রায় ভেঙে পড়ছিলাম। কিন্তু আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, অনেকদিন পর্যন্ত আমরা মাটির তলার এই পরীর রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতাম।

মেট্রোর সঙ্গে পরিচিত হতে আমাদের বেশি দিন লাগে নি। খালি শোনা যেতো, "আমি মেট্রো দিয়ে যাবো," "মেট্রোতে আমাদের দেখা হবে।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যার ম্লান আলোয় যখন চুণীরাঙা M অক্ষরটা জ্বল জ্বল করতে দেখি, আমার প্রায়ই মনে পড়ে সে দিনটির কথা যেদিন আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রথম আমি মেট্রো দেখতে যাই।

বন্ধুৎসব

সারা গরমের ছুটিটা প্রায় জয়া আর শুরা অগ্রণীশিবিরে কাটালো। সেখানে থেকে ওরা আমাকে বিরাট বিরাট চিঠি লিখত, কি করে ওরা বনে বেরী ফল কুড়ুতে যেতো, গভীর স্রোতস্বিনী নদীতে কি করে ওরা সাঁতার কাটছে, কি করে ওরা বন্দুক ছুঁড়তে শিখছে, এইসব।

মনে আছে শুরা একবার আমাকে তার "লক্ষ্য" একটা পাঠিয়ে দিয়ে গর্ব-ভরে লিখেছিল—"দেখো আমি কিরকম গুলি চালাতে শিখেছি, প্রত্যেকটা গুলিই যে লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি তাতে কিছু আসে যায় না—সব চেয়ে বড়ো কথা হলো যে, এলাকার চারপাশে যে পড়েছে সেইটে বেশ আশার কথা।"

আর প্রত্যেক চিঠিতেই ওরা লিখত—"মা একবার এসে দেখ না আমরা কি রকমভাবে আছি।"

এক রবিবার সকালে আমি ওদের দেখতে গেলাম—শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরে এলাম—ওরা আমাকে আসতে দেবে না। শিবিরে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাকে ওদের রাজত্ব দেখালো। শশা আর টম্যাটোর ক্ষেত, ফুলের চারার সারি, মস্ত মাঠ, একটা ভলিবল খেলার জায়গা। বড় ছেলেদের ঘুমাবার সাদা শিবিরটার দিকে শুরার ভয়ানক লোভ, কিন্তু কম বয়সের ছেলেদের বাড়িতে গিয়ে শুতে হয়, এ জন্য তার আক্ষেপের সীমা ছিল না। জয়া প্রচণ্ড আপত্তির সুরে বলল আমাকে—"ওর মোটেই আত্মসম্মান নেই, খালি সব সময় ভিতিয়া অরলোভের পিছন পিছন ঘুরবে।"

তরুণ অগ্রণী ইউনিট সভার সভাপতিরই নাম দেখা গেল ভিতিয়া অরলোভ। সে একটি চমৎকার উৎসাহী ছেলে, তাকে শুরা তো প্রায় পুজো করতো। ভিতিয়া ছিল শিবিরের সব থেকে ভালো বাস্কেটবল খেলোয়াড়। সব থেকে দক্ষ লক্ষ্যভেদকারী, চমৎকার সাঁতারু আরও যে কত সব গুণ তার ছিল তা বলে শেষ করা যায় না।

ভিতিয়াকে জনাকুড়ি ছোট ছোট ছেলে অনুসরণ করতো। আর তাদের প্রত্যেকের জন্যই ভিতিয়া কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় কাজ খুঁজে বার করতো। ও বলতো—"যাও তো মনিটরকে গিয়ে বল খাবার বাঁশী বাজাতে," নয় তো "এবার রাস্তাটা ঝাঁট দাও তো, দেখ কি নোংরা করেই রেখেছে," নয় তো "ফুল-গুলোতে জল দাও, তৃতীয় দলটা জল দেবার ব্যাপারে বড় কঞ্জুস, দেখ তো ফুলগুলো রোদে কি রকম হাঁপিয়ে উঠছে।" ভাগ্যবান ছেলেরা তার আদেশ পালন করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে বার হয়ে যেত।

শুরার আমার সঙ্গে থাকার জন্য খুব আগ্রহ হচ্ছিল, অনেক দিন হয়ে গেল আমরা পরস্পরকে দেখি নি, কারণ বাপ-মাদের মাসে একবার মাত্র যেতে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ভিতিয়াকে চোখের আড়াল করতে চাইলো না, ও ভিতিয়ার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে উঠেছিল।

ওর আদর্শ বীর সম্বন্ধে শুরা বলে চলতো—ভিতিয়াকে গুলি করতে একবার দেখ—ওর কখনও লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না, গুলিগুলো এতো কাছাকাছি গিয়ে পড়ে যে সবগুলো মিশে একটা গর্ত হয়ে যায়। ওই তো আমাকে গুলি করতে

শিখিয়েছে। আর কি সাঁতারটাই না কাটে দেখ একবার, বুকসাঁতার, গুঁড়ি-সাঁতার, উপুড়সাঁতার, যে রকমটি চাও!"

ছেলেমেয়েরা আমাকে নদীর পাড়ে নিয়ে গেল। ওরা দুজনেই বেশ সাঁতার শিখেছে দেখে আমি খুশি হলাম। শুরা তো আমার সামনে যত পারলো তার কেরামতি দেখালো। চুপচাপ জলের মধ্যে অনেকক্ষণ পড়ে রইলো, তারপর এক হাতে সাঁতার কাটলো, তারপর 'একটা হাতবোমা' ধরে রেখে সাঁতার কাটলো, দশ বছরের ছেলের পক্ষে এগুলো কম কৃতিত্বের কথা নয়। এরপর দৌড় হলো—তাতে জয়া একশ মিটার দৌড়ে জিতলো। ও রকম স্বচ্ছন্দ আর দ্রুতগতিতে এত ফূর্তির সঙ্গে দৌড়ল যে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন সত্যিকার রেস নয়, এখানে যেন কঠোর বিচারক আর আগ্রহে ব্যাকুল বন্ধুরা নেই, খালি খেলা হচ্ছে মাত্র।

অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে শুরার চরম বিজয়ের মুহূর্ত এলো।

ভিতিয়া অরলোভের গলা শোনা গেল—"শুরা কসমোদেমিয়ানস্কায়া—শিবির-শিখা জ্বালাবার সময় হয়েছে—"

আমি ফিরে ওর দিকে তাকাবার আগেই, যে আমার পাশে এইমাত্র বসেছিল—সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও শুরা ছিল শিবিরের মশালচী। বহুদিন আগে আস্পেন বনে থাকতে ওর বাবা ওকে কি করে শিবিরবহ্নি জ্বালাতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ও নিখুঁতভাবে তা শিখে নিয়েছিল। খট্‌খটে শুকনো ডালপালা খুঁজে নিয়ে ও এমনভাবে তাদের সাজাবে যে আগুন দেওয়ামাত্র তারা আপনা থেকেই খুশিতে জ্বলে উঠতো। কিন্তু আমাদের বাড়ির কাছে ছোট-খাটো যে সব আগুন শুরা জ্বালতো তার সঙ্গে এই শিবিরের কাছের বিরাট চত্বরের প্রকাণ্ড আগুনের কোন তুলনাই চলে না।

শুরা তার কাজের মধ্যে ডুবে গেল। আমার উপস্থিতি এবং পৃথিবীতে আর সব কিছুই সে ভুলে গেল। ও গাছের ডালপালা টেনে এনে স্তূপ করলো, হাতের কাছে সময়মতো পাবার জন্য কিছু জড়ো করে রাখলো। বেশ সন্ধ্যা হয়ে এলে যখন ছেলেমেয়েরা সবাই এসে চারদিকে বসলো—ভিতিয়ার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে শুরা দেশলাইকাঠি জ্বালালো। তৎক্ষণাৎ শুকনো ডালপালাগুলো জ্বলে উঠলো, চোখের পলকের চেয়েও দ্রুতগতিতে আগুন সাপেরা তড়িৎ নাচন শুরু করলো, আর হঠাৎ আমাদের চারপাশের অন্ধকারকে চিরে আগুনের লেলিহান শিখা আকাশের দিকে উঠলো।

আমার আরও অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল কারণ শিবিরে বাপ-মায়েরা বিশেষ কেউ নেই। কিন্তু জয়া শক্ত করে আমার হাত ধরে বারে বারেই বলতে লাগলো—"আর একটু থাকো না। শিবির শিখার পাশে কি চমৎকারই না লাগে, তুমি নিজেই দেখ না। স্টেশন থেকে তো আর বেশি দূরে নয়, রাস্তাটাও বেশ সোজা, আমরা সবাই মিলে তোমাকে বিদায় দিয়ে আসবো। গ্রীশা নিশ্চয়ই আমাদের যেতে দেবে।"

কাজেই আমি রয়ে গেলাম। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমিও আগুনের পাশে বসলাম, একবার ওদের উজ্জ্বল চকচকে আগুনের আভায় গোলাপী হয়ে-ওঠা মুখের দিকে, একবার আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

তরুণ অগ্রণী নায়ক, ছেলেদের সার্বজনীন গ্রীশা বললো—"আচ্ছা আজ আমরা কি নিয়ে আলোচনা করবো?"

আমি বুঝতে পারলাম, শিবিরশিখার পাশে আলোচনা করার জন্য ওরা বিশেষ কোন বাঁধাধরা প্রোগ্রাম রাখেনি। ওদের কাছে যা সবচেয়ে উৎসাহজনক তাই নিয়েই ওরা খোলাখুলি কথা বলে। এরকম কথাবার্তা বলার জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আর নেই। নীরবে মনযোগ দিয়ে যখন শুনছে, তাদের পিছনে ঈষদুষ্ণ গ্রীষ্মরাত্রির স্বচ্ছ নীলাকাশ, তখন কি করে জ্বলন্ত অঙ্গারের গলে-পড়া সোনা আস্তে আস্তে ভস্মে পরিণত হয়, কি করে অগণিত স্ফুলিঙ্গ উড়ে উড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তা দেখতে দেখতে আগুনের দিক থেকে আর চোখ ফেরানো যায় না।

গ্রীশা নিশ্চিত আয়াসের ভঙ্গিতে জবাব দিল. "আমি ভাবছিলাম নাদিয়ার বাবাকে আজ গল্প বলতে বললে কেমন হয়?"

গল্পটা কি নিয়ে তা আমি শুনি নি। গ্রীশার শেষ কথাগুলো সকলের একসাথে চিৎকারে ডুবে গেল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না বলুন!" চারদিক থেকেই শোনা যেতে লাগলো—বোঝা গেল ছেলেমেয়েরা এই কথকের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত, আর তাকে ভালোও বাসে।

জয়া এক নিশ্বাসে আমাকে বলে ফেললো—"তিনি হলেন নাদিয়া ভাসিলিয়েভার বাবা, জানো মা, তিনি কি চমৎকার মানুষ, চাপায়েভ ডিভিশনে তিনি যুদ্ধ করেছেন. তিনি লেনিনকে কথা বলতে শুনেছেন।"

একটি নীচু গম্ভীর অথচ কোমল কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "তোমাদের এতো গল্প বলেছি যে আমার উপর বোধ হয় তোমাদের বিরক্তি এসে গিয়েছে।"

"না না. আরও বলুন।"

নাদিয়ার বাবা আগুনের আরও কাছে সরে বসলেন। এবার গোল কামানো মাথা, প্রশস্ত রোদেপোড়া মুখ, চওড়া বজ্রের মতো কঠিন, ফুলের মতো কোমল হাত, পোশাকের উপর বয়সের সঙ্গে মলিন হয়ে যাওয়া 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার' বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। লালচে ছাঁটা গোঁফ দিয়েও ওঁর কৌতুকপ্রিয় সহাস্য মুখের চেহারা ঢাকা পড়ে নি, পুরু সাদা হয়ে-আসা ভুরুর নীচ থেকে ওঁর চোখগুলো কেমন তীব্র আগ্রহ আর ফুর্তির চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে।

নাদিয়ার বাবা ছিলেন 'কমসোমল'-এর প্রথম একজন সদস্য। তৃতীয় কমসোমল কংগ্রেসে তিনি লেনিনের বাণী শুনেছেন. সে-সব কথা তিনি যখন বলতে আরম্ভ করলেন, তখন চারদিক এমন গভীর নিস্তব্ধ হয়ে গেল যে সামান্যতম খস্‌খস্‌ শব্দ বা একটি ছোট ডালে আগুন ধরে ওঠার শব্দটুকু পর্যন্ত পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"আমাদের কাছে ভ্লাদিমির ইলিচ লেখা বক্তৃতামাত্র পড়েন নি। তিনি বন্ধুর মতো কথাবার্তা বলতেন। আমাদের মাথায় আগে ঢোকে নি এমন সব ব্যাপার নিয়ে তিনি আমাদের ভাবাতে শেখালেন। বেশ পরিষ্কার মনে আছে. তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন—'সব চেয়ে প্রয়োজন এখন কিসের?' আমরা সবাই ভাবলাম তিনি বলবেন—'যুদ্ধ! শত্রুকে বিধ্বস্ত করো!' হাজার হলেও সেটা তো ১৯২০ সাল! আমাদের প্রত্যেকেরই বিরাট কোট বা জ্যাকেটের সঙ্গে হাতে ছিল রাইফেল, কেউ বা মাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে, কেউ বা কাল-পরশুই যাবে যুদ্ধে। এই সময় হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—'পড়াশোনা—সব চেয়ে প্রয়োজন এখন পড়াশোনা করা।"

নাদিয়ার বাবা কোমলতা আর বিস্ময় মিশিয়ে এমন চমৎকার সুরে সব বলতে লাগলেন যেন মনে হলো সেই দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে। তিনি বলতে লাগলেন কি করে কুড়ি বছর বয়সের সবাই লেনিনের আদেশ পালন করবার জন্য স্কুলে গিয়ে প্রথমভাগ নিয়ে বসে পড়লো। আমাদের ইলিচ কি সাদামাটা আর বিনয়ী ছিলেন, কি রকম বন্ধুভাবে, ভালোবাসা নিয়ে তিনি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সংগে আলাপ-আলোচনা করলেন, সব চেয়ে কঠিন প্রশ্নের কি সহজ সরল মীমাংসা করে দিলেন, সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্য দেখিয়ে, কঠিন কঠিন কাজের জন্য মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করে, জীবনের যা সত্য সুন্দর সেই মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমাদের করতে হবে জ্ঞানার্জন, যুদ্ধ জয়, এমনি কর্তব্যের প্রতি আঙুল দেখিয়ে বিশ্লেষণ করে দিতেন—তাও নাদিয়ার বাবা আমাদের বললেন।

ভ্যাদিমির ইলিচ্ আরও বললেন—"যারা আজ পনেরো বছরের হয়েছে তারা বড়ো হয়ে ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজের সভ্য হবে, তাদের সমাজ তারা নিজেরাই গড়বে, সবচেয়ে তাই আজ প্রয়োজন হলো তোমরা প্রত্যেকে, প্রত্যেকদিন তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাজটুকু করে যাবে, হোক না সে নিতান্ত সাধারণ, নিতান্ত ছোট্ট, যতক্ষণ বৃহত্তর স্বার্থের, সাধারণ উপকারে আসছে তা।"

আমার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, আমাদের সেই অন্ধকারময় অতীতে এই ছেলেমেয়েদের জীবন কত না অন্য রকম হতে পারতো? কি কষ্টই না হতো তা হলে। আমার নিজেরও ওদের মানুষ করতে কি কষ্টই না হতো। কিন্তু এখন তো কেবলমাত্র আমিই ওদের না বলে শিক্ষা দিই না, স্কুল তাদের শেখায়, অগ্রণী সংঘ, চারদিকের সবকিছু দেখা এবং শোনার মধ্য দিয়ে ওদের শেখা হয়। এই ছোট শিবিরশিখার ছোট্ট স্ফুলিংগ যে ভবিষ্যৎ জীবনে কি দাবানল জ্বালাবে তা কে কল্পনা করতে পারে—এই যে লেনিনের বক্তৃতার শ্রোতা চাপায়েভ্ বাচ্চাদের মনে অনুভূতি আর প্রেরণার বীজ বপন করে দিয়ে গেল তার কি অসাধারণ পরিণতি হবে, কে তা বলতে পারে?

ধীরে ধীরে তিনি বর্ণোজ্জ্বল সুদূর অতীতের কথা আমাদের কাছে মনে করে করে বলে গেলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, "এসো গান করা যাক।"

ছেলেমেয়েরা শোনা-কাহিনীর মায়া থেকে ঝাড়া দিয়ে মুক্ত হয়ে একের পর এক প্রস্তাব করে যেতে লাগলো—"তরুণের গান"।

"চাপায়েভ-এর প্রিয় গান।"

অন্ধকারের বুক চিরে সেকালের সর্বত্র গীত গানের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো—

ঝঞ্ঝা গরজে, বারি বরষে,
বিদ্যুৎ চমকে আধার অম্বরে,
বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিছে আবার...

তারপর তারা 'অগ্রণী' সংঘের প্রথম দিককার গান ধরলো—

সুনীল রাত্রি চিরে জ্বালাও বহ্নিশিখা,
আমরা অগ্রদূত শ্রমিকের সন্তান
অভিনব দিন আজি আসন্ন ওই—
শোন অগ্রণীর আহ্বান—"হও সদা আগুয়ান।"

গানের পর গান চললো—জয়া আমার কাঁধের উপর চাপ দিয়ে বসেছিল—কখনও কখনও খুব গোপনভাবে আমাকে বলতে চাইছিল—"থেকে গেলে বলে নিশ্চয়ই দুঃখিত হওনি, কি চমৎকার দেখো তো!"

সান্ধ্য নামডাকার সময় এগিয়ে এলো খুব শীগগিরই—জয়া শুরার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো—"সময় হয়েছে। এসো এবার।"

আরও কিছু ছেলেমেয়ে খানিকটা দূরে বসে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কি বলাবলি করছিল, একে একে সবাই আগুনের পাশ থেকে উঠে গেল। আমিও উঠতে গেলাম কিন্তু জয়া বললো—"তুমি এখানে বসে থাকো, উঠো না, ওরা খালি আমাদের দল, দেখ না কি হয়।"

একটু পরেই সব ছেলেমেয়েরা লাইন করে নামডাকার জন্য চললো—আমিও ওদের পিছনে পিছনে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম—"কি চমৎকার, কি সুন্দর! কে তৈরি করেছে!"

শিবিরচত্বরের ঠিক মাঝখানে নিশান পুঁতবার স্তম্ভটার নিচে এক পাঁচ-মুখী তারা চকচক করে জ্বলছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় এলো না কি করে এটা করা হয়েছে—আমি শুনতে পেলাম—"ওরা জোনাকীপোকা দিয়ে বানিয়েছে—দেখছো না সবুজ আলো ঠিকরে বার হচ্ছে।"

দলের নেতারা তাদের বিবরণী পড়ার পর নিশান নামিয়ে নেওয়া হলো—এবার বাঁশী বাজতে লাগলো "ঘুমাও, ঘুমাও, শিবিরে যাও।"

জয়া আর শুরা খুশিতে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

"আমাদের দলটাই তো ঐ তারার কথা বার করেছে। বেশ দেখতে না? কিন্তু মা জানো—গ্রীশা বলেছে আমরা তোমাকে বিদায় দিতে যেতে পারবো না, নাদিয়ার বাবা তো ঐ গাড়িতেই যাবেন, তুমি নিশ্চয় তার সঙ্গে যেতে ভয় পাবে না।"

আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাদিয়ার বাবার সঙ্গে স্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। স্টেশনের আলোগুলি শিবির থেকেই দেখা যাচ্ছিল, সোজা সামান্য রাস্তা, আমি মোটেই ভয় পাই নি, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

আমার সঙ্গী বলে চললেন, "ওরা বেশ, ওদের ভালোবাসতে ইচ্ছা করে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে—চমৎকার শ্রোতার দল।"

দূর থেকে ইঞ্জিনের বাঁশী শোনা গেল, আমরা জোরে পা চালিয়ে দিলাম।

শিবির বহ্নিশিখা সারা শীতকালটা ওদের কাছে মধুময় করে তুললো। বারে বারেই ওদের মনে পড়তো—ওদের সেই শিবির, আগুনের ধারে গোল হয়ে আলোচনা, জোনাকীর তারা।

ওদের রচনাখাতা এই সব ঘটনার বিবরণে ভর্তি হয়ে গেল। "কি করে গ্রীষ্মকালে কাটালাম" নামে রচনায় জয়া ১৯৩৫ সালে লিখলো "শিবিরশিখার পাশে বসে ভালো করে চিন্তা করা যায়। আগুনের পাশে বসে গল্প শোনা, তারপর গান করা খুব ভালো। এর পরেই বোঝা যায় শিবিরে বাস করা কি মজার, আর সাথীদের সঙ্গে আরও নিবিড় বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলার আগ্রহ হয় এই শিবিরশিখার পাশ থেকে উঠেই।"

দিনপঞ্জী

কোন ছেলে না দিনপঞ্জী রাখে! নয় বছরের শ্রাও তার ব্যতিক্রম নয়। শ্রার দিনপঞ্জীর লেখা পড়ে আমি হাসি চাপতে পারতাম না। "আজ ৮টায় উঠলাম, খেয়েদেয়ে রাস্তায় বার হলাম, কারোর সঙ্গে ঝগড়া করিনি।" না হয় "উঠে খেয়েদেয়ে বেড়াতে গেলাম, পেৎকার সঙ্গে ঝগড়া হলো।" খাতায় লেখা-গ্লো খালি এক জায়গায় অন্যরকম "পেৎকার সঙ্গে ঝগড়া হলো" "ভিৎকার সঙ্গে ঝগড়া হলো, কারো সঙ্গে ঝগড়া হয় নি"—না হলে প্রায় সবগ্লোই শ্টির ভিতরের মটরের মতো, সবগ্লোই প্রায় একই রকম।

জয়ার দিনপঞ্জীর উপর ভয়ানক যত্ন ছিল—অন্যসব ব্যাপারেও যেমনি, এখানেও তেমন যত্ন নিয়ে কাজ করতো। তার লেখা ছিল বিস্তারিত, আর বেশ ঘন ঘন দিনপঞ্জী লিখতো সে। ১৯৩৬ সালের বসন্ত আর গ্রীষ্মের লেখা জয়ার দিনপঞ্জী আজও আমার কাছে আছে।

আগেই বলেছি—গরমের ছ্টিতে ওরা তর্ণ অগ্রণী শিবিরে চলে যেত। আমি কখনও সখনও ওদের দেখতে যেতাম। সেখানে ওদের দিনগ্লো বেশ খারাপ লাগতো। সে জন্যই দিদিমা আর দাদ্র সঙ্গে আস্পেন বনে একটা গ্রীষ্মকাল কাটাবার জন্য আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ওঁরাও আমাদের অনেকদিন ধরে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করছিলেন, আমরাও যাবার জন্য দিন গ্ণছিলাম, ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমাদের সে স্বপ্ন সত্যির্প পেল, বসন্তকাল থেকেই আমরা আস্পেন বনে যাবার জন্য ভাবতে লাগলাম আর সেই তখন থেকেই একটা ছোট পাতলা খাতা আমি রেখেছি—সেটি হলো জয়ার দিনপঞ্জী।

কয়েকটি ট্করো তুলে দিচ্ছি ঃ—

১লা মে।

"১লা মে,—আনন্দে আর খ্শিতে ভরপ্র একটি ছ্টির দিন। ভোর সাড়ে সাতটার সময় মা মিছিলে গেলেন। আকাশে যদিও রোদ ছিল, জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। আমি বেশ খ্শিভরা মন নিয়েই জেগে উঠলাম। তাড়াতাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার করে কিছ্ খেয়ে নিয়ে রেড স্কোয়ারের দিকে চলমান মিছিল দেখবার জন্য ট্রাম স্টপে গেলাম। সারাদিন আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘ্রলাম, চকোলেট কিনতে দোকানে গেলাম, ছায়ায় ছায়ায় মাঠে দৌড়াদৌড়ি খেললাম। তারপর ব্ষ্টি এলো। মা মিছিল থেকে ফিরে এলে আমাদের ছোটদের পার্টি শ্র্ হলো। সবাইকে উপহার দেওয়া হলো।"

৩রা মে।

"মা আজ কাজে যান নি বলে আমার খ্ব আনন্দ হয়েছে। স্কুলে আমি শ্রুতলিপিতে 'ভালো' পেয়েছি, কিন্তু অংক আর সাহিত্যে পেয়েছি 'চমৎকার'। মোটাম্টি দিনটা বেশ ভালোই কাটলো।"

১২ই মে।

"সকাল নয়টার সময় দ্ধ আর পাঁউর্টি আনতে দোকানে গেলাম। মা একটা

বইয়ের তাক কিনলেন। এটা রাখামাত্রই ঘরের চেহারাটা উজ্জ্বল আর চকচকে সুন্দর হয়ে উঠলো। তাকটা ছিল বাঁশের তৈরি, আমার বেশ ভালো লেগেছে।

“আমার কিরকম যেন অদ্ভুত লাগছিল। আমার ইচ্ছা ছিল রাস্তায় গিয়ে একটু দৌড়াদৌড়ি করবো। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে তরকারী বাগান করার জন্য জমি বিলি করা হলো, আমার জমিটা পড়লো আমাদের জানালার ঠিক নিচেই, আমি সেটা খুঁড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম মা নানা রকম ফল ও ফুলের বীজ কিনে আনবেন, আর আমার তরকারী বাগানটা কি সুন্দর হয়ে উঠবে।”

২৪শে মে।

“কাল পরীক্ষা আরম্ভ হবে। বেশ গরম পরিষ্কার ছিল দিনটা। দোকান থেকে কি কিনতে হবে বলে মা কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমি উঠে ঘর পরিষ্কার করলাম, গোছালাম, এমন সময় মা চলে এলেন, তিনি আজ তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়েছেন। প্রথমে আমরা গেলাম দুধ আনতে, তারপর কেরোসিন। আমাদের একসঙ্গে দোকানে যেতে খুব ভালো লাগতো। দুপুরের দিকে বেশ গরম পড়লো। ছায়ায় ছাড়া আর বসবার উপায় ছিল না। আমার পাইওনীয়ারস্কায়া প্রাভদা কাগজ এলো।

“বই পড়ার সময় ছিল না, কিন্তু আমি কাগজটা পড়ে ফেললাম। আজ খবরে দেখলাম ‘রোস্তভ’-এ একটি তরুণ অগ্রণী প্রাসাদ খোলা হয়েছে। এটা বেশ সুন্দর, আর সব থেকে চমৎকার বাড়িতে—আশীখানা ঘর, তার সবগুলোই আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য। তাতে একটা খেলার টেলিফোন স্টেশনও আছে। আর একটা ঘরে একটা সুইচ টেপামাত্রই দুটো ট্রাম বৃত্তাকারে যাওয়া-আসা করতে থাকবে। ট্রামগুলো যদিও খেলার, তারা দেখতে ঠিক সত্যিকার ট্রামেরই মতো। আবার একথাও বলা হয়েছে শীগগিরই ‘মস্কোর মেট্রো’র মতো ছোট্ট একটি ভূগর্ভস্থিত রেলপথও খোলা হবে। আর তাহলে যেসব ছেলেমেয়েরা মস্কোতে আসে নি কখনও, তারাও ‘মেট্রো’ দেখতে পাবে।

“আর ‘পাইওনীয়ারস্কায়া প্রাভ্দা’তে পরীক্ষা সম্বন্ধের অনেক কিছু বলা হয়েছে। ওরা লিখছে—পরিষ্কার করে মাথা ঠান্ডা করে নিজের উপর বিশ্বাস রেখে উত্তর লিখবে। পরীক্ষা এসে গিয়েছে আমি আর কিছু ভাবছি না, আমি পড়াগুলো বারেবারে লিখছি, পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি, আসল ব্যাপার হলো পরীক্ষা হলের শিক্ষিকা বা তাঁর সহগামীদের দেখে বিচলিত হয়ে না পড়া। আমি তো পাশ করবোই, সব বিষয়ে ‘চমৎকার’ পাবো, অন্ততপক্ষে ‘ভালো’র নিচে নিশ্চয়ই নয়।”

১১ই জুন।

“আজ পরীক্ষার খবর। কে কিরকম করেছে সব জানতে পারবো। পরীক্ষার নম্বর দিয়ে কার্ড আর প্রাইজও সেই সঙ্গে দেওয়া হবে।

“সাড়ে আটটায় উঠে স্কুলে গেলাম। সবাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। এইবার আমাদের অধ্যক্ষ তাঁর বিবরণী পড়তে আরম্ভ করলেন। সারা ঘরে নিথর নিস্তব্ধতা। একটা লাল কাপড়ে ঢাকা অনেকগুলি নূতন বই টেবিলের উপর রাখা হয়েছে। এগুলো সব থেকে ভালো ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হলো। এবার আমাকে ডাকলো। আমি রুশসাহিত্যে আর অঙ্কে ‘চমৎকার’ পেয়েছি, আর ভূগোল আর প্রকৃতিবিদ্যায় পেয়েছি ‘ভালো’। শুরাও

বেশ ভালো নম্বর পেয়েছে। আমাকে ডেকে সব থেকে ভালো বইটা দিলেন। ক্রাইলোভ্-এর উপকথা।"

১২ই জুন।

"১০-৩০টায় আমরা জুয়েভ বাগান দেখতে রওয়ানা হলাম। বাসের জন্য অপেক্ষা করে আমরা গেলাম, পৌঁছে আমরা 'মাতৃভূমির আহ্বান' বলে একটা চমৎকার ছবি দেখতে গেলাম। সেখানে নিকিতা সার্জিয়েভিচ্ খ্রুশ্চভ্-এর সঙ্গে বাগানে দেখা হলো। তাঁকে নমস্কার করলাম, আমাদের বেশ ভালো লাগছিল। আমাদের জন্য অভিনয়ও ছিল। এবার আমরা বাগানে বেড়াতে লাগলাম, ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে এলাম। তারপর গেলাম লাইব্রেরিতে। তারপর আমাদের কেক্ খেতে দিল, এরপর আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।"

২৬শে জুন।

"সকালবেলা আমার কিছু করতে ভালো লাগছিল না। কোনরকমে উঠে কাজকর্ম করতে আরম্ভ করলাম। মা কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে এখনও ঘুমোচ্ছেন। কাজেই পাছে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, আমি আর শুরা বেড়াতে গেলাম। যদিও জোরে বাতাস বইছিল, বেশ সুন্দর গরম রোদও দেখা দিয়েছিল। পুকুরের জলটা যেন টাটকা দুধের মতো, উষ্ণ, পরিষ্কার আর স্বচ্ছ। আমরা স্নান করে নিয়ে পাড়ে উঠে ঘাসের উপর শুয়ে শুকিয়ে নিলাম। স্নানের পর আমাদের টক্ টক্ কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল, আমরা বাগানে গিয়ে টক আপেল কুড়াতে শুরু করলাম।

"হঠাৎ সাতটা কি আটটার সময় আমাদের মাসতুতো ভাই শ্লাভা এসে উপস্থিত। সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো হলেও আমাদের বেশ ভাব ছিল। তাকে আমার স্কুলে পাওয়া ক্রাইলভের উপকথা আর শুরার ড্রয়িং খাতাটা দেখালাম। ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো সেগুলির।

"প্রত্যেকদিন আমি গ্রামের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। এবার আমরা যাচ্ছি।"

২রা জুলাই।

"কাল সারাদিন ধরে প্রস্তুতির পরও রাত্রেও আমরা ঘুমোতে যেতে পারি নি। সকাল সাড়ে চারটার সময় আমি, শুরা, শ্লাভা, আর মা, আমরা এই চারজন ট্রামস্টপে গেলাম। মা আমাদের সঙ্গে আসছেন না বলে আমার বেশ খারাপ লাগছিল। আবার গ্রামে যেতে পেয়ে আমি যেন খুশিও হয়েছিলাম। পাঁচ বছর হয়ে গেল আমি সেখানে যাই নি।

"একটি পুরো দিন পুরো রাত ধরে আমরা ট্রেনে রইলাম। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি চড়ে আমরা আস্পেন বনে পৌঁছলাম। (আমাদের গ্রামের নাম আস্পেন বন)। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম শ্লাভা দরজায় খট্‌খট্ শব্দ করলে দাদু বললেন—'ভিতরে এসো।' তিনি ভাবলেন ট্রাক্টর চালক ভাসিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—দিদিমার বুকে একটা ব্যথা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেখে তাঁর এত আনন্দ হলো যে ব্যথা সব কোথায় উড়ে গেল। তিনি আমাদের প্যানকেক আর টাটকা দুধ খেতে দিলেন। তারপর আমি স্নান করতে গেলাম, মেয়েদের সঙ্গে খেলা করলাম, সন্ধ্যাবেলা গেলাম গ্রামের পাঠাগারে—সেখানে আমার পুরনো প্রিয় বন্ধু মানিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। দিনটা বেশ

চমৎকার কাটলো। আমরা কত মজার মজার খেলা করলাম, গ্রামের হাওয়াই বা কি চমৎকার। রান্নাঘরে দাদুর বিছানায় আমি ঘুমালাম।"

৭ই জুলাই।

"আমি বেড়াতে যাই, ছুটাছুটি করি, দিদিমাকে তাঁর কাজে সাহায্য করি। তিনি যা বলেন করতে আমার ভালো লাগে। গমের ক্ষেতে মুরগী তাড়াই, দিনে তিনবার করে স্নান করি, পাঠাগারে গিয়ে কতো কতো মজার বই পড়ি। 'বামনদের দেশে গালিভার', গোগোল-এর 'ইনস্পেক্টার জেনারেল', তুর্গেনিভ্-এর —'বেজিন মাঠ', এই সব পড়ে ফেললাম।

"দিদিমা কি চমৎকার সব সুস্বাদু জিনিস আমাদের খেতে দেন। ডিম, মুরগীভাজা, প্যানকেক এইসব। বাজার থেকে আমরা শশা, মনাক্কা আর চেরী কিনে আনি। কিন্তু কখনও কখনও বেশ মুস্কিলও হয়। একবার তো শুরা তার জামা হারিয়ে ফেললো। ঠিক কখন সে আমার মনে নেই। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে আর পাওয়া গেল না। কখনও কখনও নদীতে নাইতে গেলে আমার বেশ দেরি হয়, দিদিমা আমার উপর রেগে যান।"

১৫ই জুলাই

"হাতে কোন কাজ না থাকলে কিরকম যে নীরস আর একঘেয়ে লাগে দিনটা কিন্তু এখানে গ্রামে, কোন কাজ না থাকলে যেন বিশেষ রকম বিরক্তিকর লাগে। আমি ঠিক করলাম, আমার যথাসাধ্য আমি দিদাকে সাহায্য করবো। জেগে উঠেই আমার মাথায় এলো, আমি ঘর মুছবো। আমি ঘর মুছতে ভালোই বাসতাম। তারপর লাল রেশম দিয়ে আমি কয়েকটা চুলের ফিতে বানালাম। বেশ ভালোই হলো, অন্তত আমার নীলগুলো থেকে তো খারাপ হলো না।

"দিনটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রচন্ড বাজের আওয়াজের সঙ্গে বেশ বৃষ্টি এলো। বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো আকাশে দেখা যেতে লাগলো। বাজ পড়লে জন্তুজানোয়াররা ভয় পেয়ে যায়। আমাদের ছাগীটা তার দল থেকে কোথায় যে গিয়েছে—দিদা অনেক কষ্টে কার যেন বাগান থেকে তাকে উদ্ধার করলেন। আজ আমি মস্কোতে মাকে আর আমার বন্ধু ইরাকে খানকতক চিঠি লিখলাম।"

২৩শে জুলাই।

"আজ আমার মামাতো বোন নীনা তার মার সঙ্গে আসছে দেখলাম। সাধারণ গোচারণের মাঠে বোনা গমের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আসছে ওরা।"

২৬শে জুলাই।

"নীনা এলে আমি খুব খুশি হলাম। আমরা একসঙ্গে খেলা করলাম, বই পড়লাম, খুব মজা হলো। দিদিমার দেওয়া সতরঞ্জ আর লুডো নিয়ে আমরা খুব খেললাম। নীনার সঙ্গে আমার খুব ভাব হলো না প্রথমে, কিন্তু পরে আমরা ঝগড়া মিটিয়ে নিয়ে ঠিক করলাম নীনার সঙ্গে আর ঝগড়া করবো না।"

৩০শে জুলাই।

"আমরা হলে ঘুমালাম। দিদিমা এসে আমাদের জাগিয়ে দিতে মনে হলো আজ নীনা, লেলিক আর আনিয়া মামীকে বিদায় দিতে হবে। ওরা আজ ভেলমোঝ্কায় চলে যাবে। গাড়ি এসে দাঁড়ালো, সদ্যজাগ্রত পৃথিবীর উপর আস্তে আস্তে সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

"ওদের বিদায় দিতে ওরা চলে গেল।। আমার বড়ো খারাপ লাগছিল ওরা চলে যাওয়াতে।

"আমি দিদাকে ঘরের কাজ করতে সন্ধ্যাবেলায় সাহায্য করলাম। আমি কাচা কাপড়গুলো ইস্ত্রি করলাম, জল আনতে গেলাম আরও কিছু কিছু অন্য কাজ করলাম।"

৩১শে জুলাই।

"দুপুরবেলা। ভারী গরম। গুজব শোনা গেল, আমাদের ছোট নদীর জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে।

"আস্তে আস্তে গরম কমে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমি ছাগল-গুলো আনতে গেলাম। পাঁচটা ছাগল—মাইকা, চেরনোসোরকা, ব্যারণ, জোরকা, আর একটার কোন নাম নেই, শুধুই ছাগল।

"দিদা দুধ দুইয়ে দিলে আমি দুধ নিয়ে ঘরে রাখলাম, এবার আমরা ঘুমোতে গেলাম।"

১লা আগস্ট।

"আমার বেণীগুলো বড় ছোট। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে দিদা তাদের খুব শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছেন, ফলে তারা এখন একটু একটু করে বাড়ছে, দিদা বড়ো ভালো।

"সন্ধ্যাবেলা মার চিঠি এলো। তিনি লিখেছেন তিনি অসুস্থ, এখানে আসতে পারেন। তিনি অসুস্থ বলে আমার বড়ো খারাপ লাগছে। ১৫ই আগস্ট থেকে তাঁর ছুটি আরম্ভ হলে তিনি এখানে আসবেন।"

২রা আগস্ট।

"এবার দিদা আমাকে বাড়িঘর দেখতে দিয়ে গেলেন। তিনি উনুন জ্বালিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি সব একাকার করে দিলাম। দিদা ম্যাকারোণি রান্না করে আমাকে ডিম টুকরো টুকরো করে তাতে দিতে বললেন। আমি উনুনের চিমটের উপর কড়াখানা রাখতেই চিমটে গেল উল্টে আর ম্যাকারোণিগুলো সব উড়ে ছড়িয়ে পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি মেঝেটা মুছে নিয়ে নতুন করে ম্যাকারোণি রান্না করলাম।

"সন্ধ্যার দিকে দিদা আর আমি স্নান করতে গেলাম। গুজব শোনা গিয়েছিল যে আজ এতো গরম পড়বে যে নদীর জল টগবগ করে ফুটতে থাকবে। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়, গরম খুব পড়েছিল, কিন্তু জল ফোটে নি।"

৫ই আগস্ট।

"আজ আমি দিদাকে কাজে সাহায্য করলাম। আমি মেঝে, দরজা, জানালা, বেঞ্চ সব পরিষ্কার করে ধুয়ে দিলাম। কাচা কাপড়গুলো ইস্ত্রী করলাম, মার শরীরের অবস্থা জানবার জন্য আমার বড়ো চিন্তা হচ্ছিল।"

১১ই আগস্ট।

"এখানে খুব কম বৃষ্টি হয়েছে। আশা করি শস্যক্ষেতগুলো পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে না। দিদার তরকারী বাগানে শশা, কুমড়ো, তরমুজ, বাঁধাকপি, তামাক, টম্যাটো, শণ আছে। যৌথ ক্ষেত্রে আছে আলু, কুমড়ো, টম্যাটো। আমাদের নিজেদের সূর্যমুখী ক্ষেত নেই। দিদা তো জানতেন না যে আমরা আসবো তাই তিনি সূর্যমুখী লাগান নি। বেজায় গরম। গরম ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়িয়ে চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।"

১৫ই আগস্ট।

"খুব ভোরে দরজায় খুব ধীরে ধীরে খটখট শব্দ শোনা গেল। শুরা, আমি, দিদা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম, মা এসেছে। আমাদের কি আনন্দই যে লাগছে! দিদা প্যানকেক ভাজতে বসলেন। মা আমাদের জন্য অনেক উপহার নিয়ে এসেছে। ওলিয়া মাসী নিজে আসতে পারেন নি কিন্তু আমাদের জন্য অনেক সুস্বাদু খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

১৭ই আগস্ট।

"মা আমি আর শুরা বাগানে গিয়ে একটা কুমড়ো আর হাতের মুঠোর মতো ছোট ছোট সাতটা ফুটি তুললাম। দিদা কুমড়োটা দিয়ে পরিজ রাঁধলেন আর বীচিগুলো শুকিয়ে রাখলেন। সন্ধ্যার দিকে মা, শুরা আর আমি স্নান করতে গেলাম। এখানে তো এমনিতেই বেশ ভালো, মা আসাতে আরও তিনগুণ বেশি ভালো লাগছে।"

১৯শে আগস্ট।

"বৃষ্টি পড়ছিল। দিদিমা আমাকে নিজের জন্য একটা কাঁথা তৈরি করতে অনেক টুকরো কাপড় দিলেন।"

২২শে আগস্ট।

"সকালটা বড় একঘেয়ে। শুরা আর আমি বেশ দুষ্টুমি করছিলাম, কিন্তু আমরা ঠিক করলাম মাকে আর কখনও বিরক্ত করবো না।"

২৪শে আগস্ট।

"সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর দিদা আমাকে একটা বহু পুরনো রঙ-এর বাক্স দিলেন, দাদু দিলেন ওর একখানা ছবি। এইসব উপহার পেয়ে আমার ভারী আনন্দ হলো। এগুলো আমি স্মারক হিসাবে রেখে দেবো। আমাদের মস্কোর কথা মনে পড়ছে।"

"ছোট্ট সাদা লাঠি"

কি চমৎকার ছিল সেই গ্রীষ্মকালটা, কেবল বাধাবন্ধহীন আনন্দের সেই মুহূর্তগুলি। শুরা আর জয়া এখন বেশ বড়ো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই পাঁচবছর আগে আমি যখন মস্কো থেকে ওদের নিতে এসেছিলাম, তখনকারই মতো ওরা আমার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলো, যেন ওদের ভয় করছে পাছে আমি হঠাৎ পালিয়ে যাই। বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাই।

ওদের সঙ্গে যে দিনগুলি কাটালাম তা আমার কাছে দীর্ঘ আনন্দময় একটা ছুটির দিনের মতো মনে হয়েছিল, কোন ঘটনাই অবিচ্ছিন্নভাবে মনে রাখার মতো নয়। কেবলমাত্র একটি ঘটনা এমন পরিষ্কার আমার মনে আছে যেন তা কালকেই মাত্র ঘটেছিল।

বোধ হয় শলাভা ওদের এই খেলাটা শিখিয়েছিল আর নয়তো পাইওনীয়ারস্কায়া প্রাভদায় পড়ে ওরা খেলাটা শিখেছিল, সে যাই হোক খেলাটা ওদের বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এটার নাম হলো "ছোট্ট সাদা লাঠি"। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন গাঢ় রঙ-এর জিনিস জমির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র

উজ্জ্বল অথবা ফ্যাকাশে রঙ-এর জিনিসই একটু একটু চোখে পড়ে তখনই এটা খেলার সময়। আমার ছেলেমেয়েরা আর আমাদের প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরা মিলে দু'দল তৈরি করে একজন বিচারক বেছে নেয়। বিচারক—যতো জোরে সম্ভব কাঠিটি একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর যতো খেলুড়ে সবাই সেটা খুঁজে আনতে ছোটে। যে খুঁজে পায় সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে বিচারকের হাতে দিতে যায়। কিন্তু এমন চালাকি করে চুপি চুপিভাবে দিতে হয় যেন বিপক্ষের খেলুড়েরা বুঝতে না পারে। যে লাঠিটা খুঁজে পাবে সে তাদেরই দলের আর একজনের হাতে খুব চুপি চুপি দিয়ে দেয় যাতে বিপক্ষ দলের লোকেরা আন্দাজও করতে না পারে কার হাতে আছে। বিপক্ষ দলের অলক্ষ্যে যদি বিচারকের হাতে দিয়ে দিতে পারে তবে ওদের দল দুই পয়েন্ট পাবে। যদি বিপক্ষ দল লাঠিওয়ালাকে ধরে ফেলে তাহলে প্রত্যেক দলই এক পয়েন্ট করে পাবে, দশ পয়েন্ট না পাওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে।

জয়া আর শুরার এই খেলায় এতো উৎসাহ ছিল যে এটার মজার কথা চেঁচিয়ে বলতে বলতে তারা প্রায় আমার কাণের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে শুলাভা এসে যোগ দিল—প্রয়োজনীয় খেলাও বটে। কি করে বন্ধুত্ব করতে হয় শেখা যায়। খালি নিজের নিজের স্বার্থের জন্যই নয়, বহুর জন্য এক, আর একের জন্য বহু।

প্রায়ই শুরা হতো বিচারক। ওর শক্ত হাতে লাঠিটাকে এতোদূর ফেলতো যে খুঁজে পাওয়া বেশ মুস্কিলই হতো। একদিন জয়া লাঠি ছুঁড়তে চাইলো।

একটি ছেলে বললো—"এটা মেয়েদের কাজ নয়।"

জয়া লাঠিটা তুলে নিয়ে দুলিয়ে ছুঁড়ে দিল আর লাঠিটা এসে পড়লো জয়ার পায়ের কাছে। জয়া লজ্জায় লাল হয়ে ঠোঁট কামড়ে দৌড়ে বাড়ি চলে গেল।

খেলার থেকে বাড়ি ফিরে এসে শলাভা জিজ্ঞেস করলো—"কেন বাড়ি চলে এলে?"

জয়া চুপ।

"অভিমান হয়েছে বুঝি। তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তুমি যদি ছুঁড়তে না পার যে পারে তাকে দাও না কেন? আমাদের সঙ্গে খেলুড়ে হয়ে তুমি খেলতে পারতে। অভিমান করার মতো কিছু হয় নি। অভিমান বা অহংকার ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ তা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা যায়।"

জয়া এবারও কোন জবাব দিল না। সন্ধ্যাবেলায় এমনভাবে সবার সঙ্গে খেলায় যোগ দিল যেন কিছুই হয় নি। ছেলেমেয়েরা ওকে ভালোবাসতো, তারাও আগের দিন কি হয়েছিল তা আর মনে করিয়ে দিল না।

এই ঘটনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, এমন সময় একদিন শলাভা এসে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে বাগানটা পার হয়ে গেলাম।

শলাভা ফিস ফিস করে বললো—"লিউবামাসী চেয়ে দেখ!"

একটু দূরে আমাদের দিকে পিছন ফিরে জয়া দাঁড়িয়ে কি যেন করছে—আমি প্রথমটায় ভালো বুঝতে পারি নি। ও দুলে দুলে কি ছুঁড়ে দিচ্ছে, আবার তা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে আবার ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমি আরও কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা ছোট কাঠের লাঠি নিয়ে জয়া ছুঁড়ছে। জয়ার চোখের আড়ালে একটা গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে আমরা নীরবে দেখতে লাগলাম

কি করে জয়া অক্লান্তভাবে লাঠি ছুঁড়ছে, দৌড়ে আনতে যাচ্ছে, নিয়ে এসে আবার ছুঁড়ছে। প্রথমে খালি এক হাত দিয়ে ছুঁড়ছিল, তারপর পিছন দিকে একটু হেলে সামনের দিকে ঝুঁকে সে গোটা শরীরের ঝাঁকুনি দিয়ে যেন লাঠির পিছনে তাড়া করার ভঙ্গিতে ক্রমাগত ছুঁড়তে লাগলো।

শুভা আর আমি চুপিচুপি চলে এলাম, জয়াও তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলো। জয়ার সর্বাঙ্গ পরিশ্রমে লাল হয়ে গিয়েছে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে। গা ধুয়ে জয়া সেলাই নিয়ে বসলো, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে কাঁথা সেলাই করছিল। শুভা আর আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম, শুভা খিলখিল করে হেসে উঠলো। জয়া মুখ তুলে বললো—

"কি ব্যাপার?"

শুভা কিন্তু কিছুই বললো না।

পরের দিন ঠিক ঐ সময়ে আমি বাড়ি থেকে বার হয়ে চুপি চুপি সেই জায়গায় গিয়ে দেখলাম জয়া লাঠি কিংবা পাথর ছুঁড়ে অভ্যাস করছে। দিন দশেক পরে, আমাদের চলে যাবার অল্প কয়েক দিন আগে শুনলাম—আমাদের বাড়ির সামনের উঠোনে জড়ো হওয়া ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ করে—"এসো আমরা 'ছোট্ট সাদা লাঠি' খেলি. আমি হবো বিচারক।"

শুরা অবাক হয়ে বললো—"আবার চেষ্টা করবে?"

আর উচ্চবাচ্য না করে জয়া হাত দুলিয়ে লাঠি ছুঁড়লো—আর চারদিকে সবাই অবাক হয়ে গেল—লাঠিটা হাওয়ায় উড়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়লো।

দাদামশাই সান্ধ্য আহারের সময় বললেন—"একেবারে শেয়ালনী! লাঠিটা নিয়ে এতো কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল কি? খালি হেরে গিয়েছিল বলে নিজের বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছিল বই তো নয়!"

জয়া জবাব দেবার আগেই দিদিমা বাধা দিয়ে বললেন—"একটা প্রবাদ আছে —যাই হোক না কেন আমি আমার মতেই চলবো।" তিনি একটু হেসে বললেন—"আর তাই আমার মনের কথা।"

জয়া খাবারের ডিশের উপর মুখ লুকিয়ে চুপ করে রইলো—হঠাৎ হেসে ফেলে বলে উঠলো—"নদীর পাড় খাড়া হলোই বা মাছটা পাওয়ার তো মজা আছে। সে তো মাত্রা মিখাইলোভ্নারই নাতনী!"

সবাই হেসে উঠলো।

দি গ্যাড ফ্লাই

বসন্তকাল। ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ নিয়ে উষ্ণ বাতাস বইছে। বসন্তের হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে কি ভালো লাগছে। বন্ধ ট্রামের ভিতর থেকে আমি একটু আগেই নেমে পড়লাম। আমার বাড়ি আর বেশি দূরে নয়। বাকিটুকু হেঁটেই যাবো।

দেখলাম একমাত্র আমিই যে বসন্তের আমেজ পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছি তা নয়। পথিকদের মুখে হাসি, চোখ উজ্জ্বল, কণ্ঠস্বর আরও সতেজ, আরও উচ্চ।

"...করদোভাতে সাধারণতন্ত্রী দল বেশ এগিয়ে যাচ্ছে।" "এস্ত্রেমদুরাতে..." একটা দুটো কথা ভেসে এলো আমার কানে।

আজকাল প্রত্যেকের মনে আর মুখে শুধু স্পেনেরই কথা। ডোলোরেস্ ইবারুরির সেই অমর বাণী—"নতজানু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরা অনেক ভালো" চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রত্যেক সৎ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনকে দোলা দিয়েছে।

সকাল বেলা, ভালো করে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই জয়া দৌড়ে যায় চিঠির বাক্সের কাছে, খবরের কাগজে দেখবে স্পেনসীমান্তে এখন কি ঘটছে।

শুরার এখনও তের বছর পূর্ণ হয় নি, আর এ জন্যই সে সরাসরি মাদ্রিদ-এ গিয়ে পৌঁছতে পারছে না, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় খবরের কাগজ পড়ার পরই শুরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে—হয়তো পড়েছে একটি মেয়ে কিরকম করে গণতন্ত্রীদলে লড়ছে, নয়তো বেতারে শুনেছে কি করে তরুণ স্পেনীয়, বাপমায়ের অমতে সীমান্তে যুদ্ধ করতে গিয়েছে।

"আর সে কি চমৎকার যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ালো, একবার ফ্যাসিস্টদের বোমার আঘাতে ওদের মাটির তলায় সুড়ংগ ভেঙে চুরমার হয়ে ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল, কিন্তু এই এমেতেরিও কর্নেজো একটা হাতবোমা নিয়েই গর্তের বাইরে লাফিয়ে পড়লো। ট্যাঙ্কটার দিকে দৌড়ে গিয়ে সোজা তার উপরই ছুঁড়ে দিল সেই বোমাটা! ট্যাঙ্কের তলায় চাকার ঢেউলাগানো আবরণগুলোর নিচেই বোমাটা ফাটলো আর একই জায়গায় ট্যাংকটা দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। তখন অন্যরাও একবাক্স ভর্তি বোমা নিয়ে এলো আর কর্নেইজো একটার পর একটা ছুঁড়তে লাগলো। আর একটা ট্যাংক ধ্বংস করা হলো, তারপর আর একটা, এবার বাকিগুলো পিছন ফিরে অন্তর্ধান করলো। দেখ দেখি! আর আমরা ভাবি ট্যাঙ্কের চেয়ে মারাত্মক বোধ হয় আর কিছুই নেই।"

"কর্নেইজোর বয়স কত?"

"সতের"—শুরা জবাব দিল।

"তোমার বয়স কতো?"

এরকম নিষ্ঠুরের মতো প্রশ্ন করা উচিত হয় নি আমার।

শুরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

আমার পাশ থেকে একটি রিনরিন্ আওয়াজ ভেসে এলো—"মা, এতো দেরি করেছ কেন? অপেক্ষা করে করে আর ভালো লাগছিল না।"

"দেরি হয়েছে বুঝি? আমি তো সাতটার সময় আসবো বলেছিলাম।"

"এখন আটটা বাজতে দশ মিনিট। আমার তো ভাবনা হয়ে গিয়েছিল।"

জয়া আমার হাত ধরে আমার পায়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলো। গত দু'বছরে ও অনেক বেড়ে গিয়েছে। আর কিছু-দিনের মধ্যেই ও আমার সমান লম্বা হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে আমার এত বড় মেয়ে ভাবতেও অবাক লাগে। ফ্রকের ঝুল অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে—কাজ-করা ব্লাউজ আঁট হয়ে গিয়েছে—নতুন আর একখানা করার কথা এবার ভাবতে হবে।

১৯৩১ সালে মস্কোতে ওদের নিয়ে আসার পর থেকে আমরা বড় একটা কখনও আলাদা থাকি নি। আমাদের মধ্যে যে-কেউ বাইরে গেলেই বলে যাবে কে কোথায় কতক্ষণের জন্য যাচ্ছে। আমি যদি বলি আটটার সময় কাজ থেকে

ফিরে আসবো তাহলে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, আটটার সময় ফিরে আসতে। কোন কারণে একটু দেরি হলে জয়া চিন্তিত হয়ে ট্রামস্টপে আমাকে নিতে আসতো, আজও তাই করেছে।

শুরা বাড়ি ফিরে দিদিকে দেখতে না পেলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে- "জয়া কোথায়? কোথায় গিয়েছে, এখনও আসছে না কেন?"

জয়া তো বাড়িতে পা দিতে না দিতেই জিজ্ঞেস করবে—"শুরা কোথায়?"

আমি কখনও আগে বাড়ি ফিরে সিঁড়িতে দুটি পরিচিত পদশব্দ না শোনা পর্যন্ত কিরকম অস্বস্তি বোধ করতাম। বসন্তকালে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করতাম।...এখন আমি চোখ বন্ধ করলেই ওদের দেখতে পাই—ওই যে আসছে, রোজকার মতো দুজনে কিছু একটা নিয়ে তর্ক করতে করতে, আমার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো।

জয়া আমার কাগজের প্যাকেট আর হাতব্যাগটা নিল। "তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়েছ, আমার কাছে দাও।" বসন্তের আগমনে পুলকিত হয়ে আমরা ধীরে পথ চলতে চলতে সারাদিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

জয়া বললো—"কাগজে লিখেছে স্পেনীয় বাস্তুহারা ছেলেমেয়েদের—আরটেক তরুণ অগ্রণী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফ্যাসিস্টরা ওরা ওখানে পৌঁছুবার আগেই জাহাজটা ডুবিয়ে দিয়েছিল আর কি? ওদের দেখতে কি ইচ্ছেই যে করে...ভাব দেখি এতো সব বোমাবর্ষণ টর্ষণের পর হঠাৎ ক্রিমিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলো! আচ্ছা সেখানে কি এখন বেশ গরম পড়েছে?"

"হ্যাঁ, এপ্রিল মাসে দক্ষিণ দেশে বেশ গরম পড়ে। গোলাপ ফুটতে আরম্ভ করেছে। তোমার দিকেই চেয়ে দেখো না। মস্কোতে পর্যন্ত রোদের আলোয় তোমার নাকের রঙ বদলাতে শুরু করেছে।"

"শোন—আমরা স্কুলের চারদিকে বাগান করতে আরম্ভ করেছি। প্রায় অর্ধেক দিন আমি খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে রোদে-পোড়া রঙ পেয়েছি। প্রত্যেকেরই একটা করে গাছ পুঁততে হবে। আমি পুঁতেছি 'পপ্‌লার', পপ্‌লারে যখন বরফ পড়ে ভারী সুন্দর দেখায়। আর পপ্‌লারের কি মিষ্টি গন্ধ না মা? এতো টাটকা, একটু তেতো তেতো....এবার আমরা বাড়ি এসে গিয়েছি, চট্ করে গা ধুয়ে এসো আমি খাবার গরম করছি।"

আমি গা ধুতে গেলাম, জয়া কি করছে তা আমি না দেখেও বলে দিতে পারি। পাতলা চটি পায়ে হাল্কা আওয়াজ করে জয়া স্টোভ জ্বালিয়ে সুপ গরম করে টেবিল সাজাচ্ছে নিপুণহাতে। ঘরটা নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা, ঘরটা এইমাত্র মোছা হওয়ায় কেমন সুন্দর গন্ধ বার হচ্ছে। জানালায় একটি লম্বা গ্লাসে দুটো সাদা ভ্রমরগুচ্ছের মতো পুষ্পে ভরা উইলো গাছের ডাল গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পরিচ্ছন্নতা আর আরাম যা এই ঘরে আছে তার সবটাই কৃতিত্ব জয়ার। বাড়ির সমস্ত কাজ, ধোয়া মোছা, বাজার করা সব জয়ার উপর ভার। শীতের দিনে এমন কি স্টোভ জ্বালিয়ে ঘর গরম পর্যন্ত রাখে। শুরারও কাজ ভাগ করা আছে, জল বয়ে আনা, কাঠ চেলা করা, কেরোসিন কিনে আনা। কিন্তু সামান্য সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘামাতে সে রাজী নয়। আরও বহু ছেলের মতো ওরও মত হলো যে ঘরমোছা বা দোকান বাজার হাট করা ওসব ছেলেদের জন্য নয়, যে কোন মেয়েও তো এসব করতে পারে।

এই যে শুরা হাজির!

দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল, শুরা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে, গাল দুটো পরিশ্রমে লাল, কনুই পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি, চোখের উপর কালশিরা পড়েছে। মহা উৎসাহের সঙ্গে বললো শুরা—"আমরা খেলছিলাম, এই যে মা নমস্কার! গা ধুয়েছ? এই যে তোমার জন্য একখানা চেয়ার আছে—বসে পড়, এবার আমি গা ধোব।"

জল ছিটিয়ে খেলা করে অনেকক্ষণ ধরে শুরা গা ধুলো—সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল খেলার বর্ণনা এতো আড়ম্বরের সঙ্গে চলল যে পৃথিবীতে মনযোগ দেবার মতো আমাদের আর কিছু রইল না।

জয়া জিজ্ঞেস করল—"তোমার জার্মান অনুবাদ কখন হবে শুনি?"

"মানুষটাকে খেতেও দেবে না দেখছি।"

বাচ্চাদের খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। আমি খেতে বসলাম। স্কুলের বাগান সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা চললো। শুনে মনে হলো, পৃথিবীতে যতো-রকম গাছের নাম তারা শুনেছে তার প্রত্যেকটিই স্কুলের বাগানে লাগাবার মতলব করছে ওরা।

"কি বললে, পামগাছ হবে না? 'ওগোনিওক' কাগজটায় চারধারে বরফ-জমানো একখানা পামগাছের ছবি পর্যন্ত দেওয়া আছে। তার মানে এই যে ওরা শীত সহ্য করতে পারে।"

জয়া ঠাট্টা করে বলে উঠল—"আহা কি বুদ্ধি! ক্রিমিয়ার শীতের সঙ্গে মস্কোর শীতের তুলনা করছে দেখো!" আমার দিকে চেয়ে বলল—"মা আমার জন্য কোন বই এনেছ?"

নীরবে আমি আমার বাক্স থেকে 'দি গ্যাডফ্লাই'খানা বার করে ওর হাতে দিলাম। জয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

"আঃ ধন্যবাদ মা তোমায়!" লোভ সামলাতে না পেরে জয়া পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখল—কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই বইটা বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে তাড়াতাড়ি টেবিলটা পরিষ্কার করে কাঁটা চামচগুলো ধুয়ে পড়তে বসলো।

একটু পরে "কাল সকালে পড়লেই বেশ হতো" বলে খানিকক্ষণ গজগজ করে শুরাও জয়ার পাশে বসল।

জয়া সব থেকে ওর কঠিন বিষয় অংক নিয়ে আরম্ভ করলো। শুরা বসলো জার্মান বই নিয়ে—অংক পড়ে রইল। এটাই ওর সহজ লাগে।

আধঘন্টাটাক পরে শুরা সশব্দে চেয়ারটা ঠেলে ঝপ্‌ করে বইটা বন্ধ করলো।

"হয়ে গিয়েছে—অংকগুলো কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে।"

কাজে নিবিষ্টচিত্ত জয়া চেয়েও দেখল না। পাশেই বহুদিন ধরে আবদার করা "দি গ্যাডফ্লাই" পড়ে আছে অনাদরে—কিন্তু আমি বেশ জানি, জয়া কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদিকে চেয়েও দেখবে না।

আমি বললাম—"দাও তোমার ট্রানস্লেশানটা দেখে দিই। আচ্ছা এটা কি—সম্প্রদান কারক বুঝি?"

"হ্যাঁ,...বড্ড ভুল হয়েছে।"

"হ্যাঁ তাইতো দেখছি।...এটা কি হয়েছে, উ বসিয়েছ যে—ওটা 'য়ু' হবে। আরে আরে এটা কি? 'গার্টেন' তো বিশেষ্য, তবে বড়ো অক্ষরে দাওনি যে বড়ো। তিন তিনটে ভুল, নাও বসে পড় আবার লেখ দেখি।"

শুরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো, ওর খেলুড়েরা সব অপেক্ষা করে আছে কখন ও বাইরে আসবে। এখনও তো বেশি রাত হয়নি। আরও একদফা খেলা চলতে পারে...কিন্তু সত্যি কি করে অস্বীকার করবে, তিন তিনটে ভুল তো আর চাট্টিখানি কথা নয়, হতাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলে শুরা টেবিলে বসে পড়ল আর একবার।

রাত্রে আমার কেমন যেন মনে হলো, কোথায় কিছু একটা অনুচিত ব্যাপার ঘটছে—আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার অনুমান যথার্থ, খবরের কাগজ আড়াল দিয়ে জয়া গালে হাত দিয়ে বসে "দি গ্যাডফ্লাই" পড়ছে। ওর মুখ, হাত, বইয়ের পাতা সব চোখের জলে ভিজে গিয়েছে।

আমি জেগেছি বুঝতে পেরে জয়া চোখের জলের ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমরা কেউই কিছু বললাম না, কিন্তু একদিনের কথা আমাদের দু'জনেরই মনে পড়ল যেদিন জয়া আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল—"ওমা বড়োরা কাঁদে বুঝি?"

গোলাপী পোশাক পরা বালিকা

পাতাবিহীন গাছের কালো ডালপালা আর উজ্জ্বল বসন্ত আকাশকে পিছনে রেখে চমকদার বাক্স একটা। ছবিটার মধ্যে আর কিছু নেই। কিন্তু এটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। এটা শুধু মাত্র আকাশ আর গাছ আর চমকদার বাক্সের ছবিই নয়; যার অভাবে ছবি—ছবি হতে পারে না সেই মানসিক আবহাওয়া ভাব ও প্রকৃতিকে দেখবার বুঝবার ক্ষমতা সবই এই ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আর একটা ছবি ঃ ঘোড়া ছুটছে, হিংস্র অশ্বারোহীর হাতে উদ্যত ভয়াল অস্ত্র—সত্যিই এতে গতিবেগ রয়েছে, এই যে আর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তিমিরিয়াজেভ পার্কের অতি পরিচিত নির্ঝরিণী, আর এই যে আমাদের আস্পেন বন—লম্বা লম্বা ঘাস, আনন্দধারায় বয়ে যাওয়া ছোট্ট রূপালী নদীটি...

বাড়িতে আমি একলা—হাঁটুর উপর পড়ে আছে শুরার মোটা ড্রয়িং খাতা।

শুরা প্রত্যেক বছরই আঁকায় উন্নতি করছে। আমরা প্রায়ই ত্রেতিয়াকভ ছবির প্রদর্শনী দেখতে যেতাম, ও কেবলমাত্র আঁকতে শিখুক এটাই আমার উদ্দেশ্য নয়, ছবি বুঝতেও শিখুক তাই আমি চাই।

ত্রেতিয়াকভ গ্যালারিতে আমাদের প্রথম যাওয়াটা আমার বেশ মনে আছে। ধীরে ধীরে আমরা এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাচ্ছিলাম। এই সব ছবির যারা প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেই সব ঐতিহাসিক কাহিনী আমি ওদের বলে গেলাম, ওরাও অনর্গল প্রশ্ন করে চলেছে, সবকিছুই ওদের ভালো লাগছে, ওদের আশ্চর্য লাগছে। ফ্রুবেল-এর আঁকা 'জ্যোতিষ' যখন সব দিক থেকেই জয়ার দিকে তাকাতে লাগলো, তখন জয়া তো একেবারে অবাক। বড়ো বড়ো কালো দুটি আনন্দহীন সর্বজ্ঞানী চোখ যেন অচঞ্চল দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অনুসরণ করছিল।

এরপর আমরা এলাম—"সেরভ"-এর ঘরে। শুরা "পীচ্ওয়ালী মেয়েটি"-র

কাছে গিয়ে একেবারে যেন জমে গেল। হাল্কা গোলাপী গাল, কালো চুলওয়ালা মেয়েটি আমাদের দিকে ভাবুকের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কেমন শান্তভাবে তার হাতদুখানি টেবিলক্লথের উপর পড়েছিল। তার মাথার পিছনে জানালা দিয়ে একশ বছরের লেবুগাছের ছায়ায় ঢাকা বাগান যেন চোখের সামনে ধরা দেয়... অনেকক্ষণ ধরে নির্বাক দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে আমরা সকলেই চেয়ে রইলাম, অবশেষে আমি আস্তে আস্তে শুরার কাঁধ ছুঁয়ে বললাম—

"চল"

ও সেরকমই চাপাগলায় বলল—"আর একটু পরে।"

মাঝে মাঝে তার এরকম হয়। প্রগাঢ় অনুভূতি ওকে যেন পাথর করে দেয়। সাইবেরিয়ায় শুরা যখন চার বছরের ছিল তখন সত্যিকারের বনে প্রথম ঢুকতেই ওর একবার এরকম হয়েছিল, আর এখনও তাই। আমি আমার ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, ও নিঃশব্দে তাকিয়েছিল, শান্ত ভাবুক ঐ গোলাপী পোশাক-পরা মেয়েটির দিকে। ভাবতে চেষ্টা করলাম কি দেখে ও এতো অভিভূত হয়েছে। তার ছবি সবসময়ই গতি আর শব্দে ভরপুর। অবশ্য যদি তুলি আর রঙ দিয়ে শব্দ করা সম্ভব হয়—বেগবান অশ্ব, চলন্ত ট্রেন, উড়ন্ত বিমান এইসব তার ছবির বিষয়। শুরা নিজেও একটি দুরন্ত ছোকরা, দৌড়ানো, চেঁচানো, ফুটবল খেলা এই সব তার পছন্দ। গোলাপী পোশাকে মেয়েটিকে দেখে ও এতো অভিভূত হয়ে পড়ল কেন? এই ছবিটার প্রশান্ত স্তব্ধতা কি করে মুগ্ধ করল, কি করে ওর আসল স্বভাবের গতি রোধ করল? সেদিন আমরা আর কিছু না দেখেই বাড়ি চলে এলাম, সারাটা পথ শুরা শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল—"সেরভ কোন সময়ের লোক? ছোট্টবেলা থেকেই কি তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন? কে ওঁকে শিখিয়েছিল? ওঁর গুরু কি যিনি 'তুর্কি সুলতানের কাছে লিখছে জাপোরঝিয়ে কসাকরা' এই বিখ্যাত ছবিখানি এঁকেছেন সেই রেপিন?"

এটা অনেকদিন আগের কথা, শুরা তখন মাত্র দশ বৎসরের ছেলে। তার পর থেকে আমরা অনেকবারই ত্রেতিয়াকভ গ্যালারি দেখতে গিয়েছি, সেরোভ-এর অন্যান্য ছবি দেখেছি, সুরিকভের নানা ছবি—"নির্বাসনে মেনশিকভ—" সুভোরভকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, লেভিতান-এর আঁকা বিষণ্ণ প্রকৃতি আরও কত যে ছবি আছে সেখানে! কিন্তু সেরভের ছবি দেখার পরই শুরার খাতায় প্রথম প্রকৃতির ছবি দেখা গেল, আর ঠিক সে সময়ই জয়াকে আঁকবার ইচ্ছা হলো তার।

শুরা তার স্বভাববিরুদ্ধ ভদ্রতার সুরে দিদিকে বলল—"বোসো না, আমি তোমার ছবি আঁকব।"

জয়া অনেকক্ষণ নড়াচড়া না করে ধৈর্য ধরে বসে রইল। সেই কাঁচা-হাতে আঁকার মধ্যেও জয়ার কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতো, চোখ দুটো কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহে জয়ার, স্থির, গম্ভীর, চিন্তিতের চোখ...

এখন আমি শুরার ড্রয়িং খাতার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম বড়ো হয়ে ও কোন দিকে যাবে? কি ওর ভবিষ্যৎ?

শুরার অঙ্কে খুব ভালো মাথা, ওর বাবার কাছ থেকে ও কারিগরী বিদ্যার ঝোঁক পেয়েছে—আর এদিকে ওর হাতদুটিও খুব নিপুণ, যা কিছুতে হাত দেয় তাই বেশ ভালোভাবে করতে পারে। ও যে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় তাতে আমি

মোটেই আশ্চর্য হইনি। ওকে হাতখরচার যা টাকা দিই সব দিয়ে ও "বিজ্ঞান বিচিত্রা" কেনে। আর তার সামনের মলাট থেকে পেছনের মলাট পর্যন্ত কেবল যে পড়ে মুখস্থ করে ফেলে তাই নয় বইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী নানা রকম যন্ত্রপাতিও তৈরি করে ফেলে।

শুরা সব সময়েই কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে যায়। একবার আমি ওদের স্কুলের বাগান দেখতে গিয়েছিলাম। পুরোদমে কাজ চলছে, ওরা মাটি খুঁড়ছে, ছোট ছোট চারা ঝোপ লাগাচ্ছে, বাতাসে বাচ্চাদের গলার আওয়াজ মিষ্টি প্রতিধ্বনি তুলছে। জয়া আমাকে দেখে একবার লজ্জা পেয়ে শুধু একটু হাত নাড়ল, শুরা আর একটি ছেলের সঙ্গে একটা ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলে গেল, এই ঝুড়িটার মধ্যে এতো যে মাটি ধরতে পারে তা না দেখলে আমার বিশ্বাসই হতো না।

লম্বা সোনালী চুলওয়ালা লম্বা ও বেশ মজবুত গড়নের একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"সাবধান কসমোদেমিয়ানস্কি, শরীরের উপর বেশি চাপ দিও না।"

শুনলাম—শুরা একটু হেসে খুশির সুরে বলল—"মোটেই না, মন দিয়ে যদি কাজ কর তাহলে কষ্ট হয় না কখনও। আমাদের দাদু বলতেন—কাজে যদি ভয় পাও তাহলেই কাজ করতে ভেঙে পড়বে।"

সেদিন সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে কতকটা ঠাট্টার কতকটা গম্ভীর ভঙ্গিতে শুরা বলল, "আচ্ছা মা আমি তো বেশ বাগানের মাটি কোপাতে পারি, তাহলে আমি স্কুল শেষ করে 'তিমিরিয়াজেভ একাডেমি'তে ভর্তি হতে পারব—তুমি কি বলো?"

তাছাড়া শুরা খেলোয়াড় হতেও চায়, শীতকালে জয়া আর শুরা স্কেট আর স্কী করত, গরমের দিনে তিমিরিয়াজেভ পুকুরে সাঁতার কাটতো। শুরা সত্যিই খেলোয়াড়ের মতো দেখতে, তেরো বছর বয়সে ওকে দেখতে পনের বছরের মতো লাগত। শীতকালে বরফ মাখবে সারাগায়ে, বসন্তকালে সকলের আগে সাঁতার কাটতে শুরু করবে—আর হেমন্তে যখন বড়ো বড়ো সাঁতারুরাও জলে নামবার কথা শুনতেই ভয় পেতো, ও তখনও দিব্যি সাঁতার কাটতো, আর ফুটবলের নাম শুনলে তো কথাই নেই। তাহলে শুরা খাওয়া-দাওয়া পড়াশোনা সব ভুলে যেত।

কিন্তু তবুও যেন মনে হয় শুরার চরম আকাঙ্ক্ষা হলো শিল্পী হওয়া। আজকাল তার প্রতিটি অবসর মুহূর্ত সে আঁকার কাজে লাগাত, লাইব্রেরি থেকে ও নিজেও কিছু কিছু আনে, আমাকেও আনতে ফরমায়েস করে বড়ো বড়ো চিত্রকর—যেমন রেপিন, সেরভ, সুরিকভ, লেভিতান-এর জীবনী।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ও বললো—"শোন একবার, নয় বছর বয়স থেকে রেপিন একদিনও বাদ না দিয়ে রোজ ছবি আঁকতে থাকেন, জীবনের একটি দিনও তিনি বাদ দেনান, ভাব দেখি একবার? বাঁ হাতটা ভেঙে গেলে যখন তিনি ধরতে পারতেন না, শরীরের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে নিয়ে ঠিক আগের মতোই ছবি আঁকতে থাকেন—কী প্রতিভা! কী আশ্চর্য ক্ষমতা!"

শুরার ছবিগুলো দেখতে দেখতে তার মধ্যে পেলাম পার্কে আমাদের প্রিয় বেঞ্চটা, আমাদের বাড়ির সামনের হাস্নুহানা ঝোপটা। গরমের দিনের সন্ধ্যায় শুরা এটার নিচে শুয়ে থাকতে বড়ো ভালোবাসত। আমাদের বাড়ির সামনের

বারান্দা—যেখানে ও বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলার পর অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকত। আবার ওদের ফুটবল খেলার সবুজ ঘাসে ভরা মাঠটাও এঁকেছে।

আজকাল শুরা প্রায়ই "স্পেন" এর বিষয় আঁকতে শুরু করেছে। অবিশ্বাস্য রকমের নীল আকাশ, সাদা জলপাই কুঞ্জ, লালচে পাহাড়-পর্বত, কাটা কাটা খাতের দাগভরা রোদে পোড়া মাটি, বোমার টুকরোতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শহীদদের রক্তে রাঙানো—স্পেনের মাটি ওর খাতায় রূপ নিত। মনে পড়ল—ত্রেতিয়াকভ গ্যালারিতে সুরিকভ প্রদর্শনী খোলার পর গত শীতকালে শুরা কয়েকবারই সেখানে গিয়েছে। স্পেনের জলরঙ-এর ব্যবহার দেখাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময়টায় সুরিকভ আরও প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় তিনি স্পেন গিয়েছেন, দেখেছেন আর এঁকেছেন।

আরে এটা কি? বিরাট জানালা আর দরজাওয়ালা মস্ত বাড়িটা যেন চেনা চেনা লাগছে। ঠিক হয়েছে, এটা তো ২০১নং স্কুল, তার চারপাশে যে বাগান হবে—বার্চ, মেপল, ওক আর তালগাছের সারি।

বাজী

জয়া আর শুরা বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, তবুও সময় সময় আমার কাছে ওদের কি রকম ছোট মনে হয়।

একদিন সন্ধ্যায় আমি বেশ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম, আবার খানিক পরেই চমকে জেগে উঠলাম। শুনতে পেলাম জানালার সার্সির উপর কে যেন মুঠো মুঠো পাথরকুচি ছুঁড়ে ফেলছে। পরে বুঝলাম বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা-গুলো জানালার কাঁচের উপর জোরে জোরে পড়ার জন্যই ওরকম শব্দ হচ্ছে। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। দেখলাম শুরাও উঠে বসেছে।

আমরা দুজনে এক সঙ্গে বলে উঠলাম—"জয়া কোথায়?" জয়ার বিছানা খালি। তক্ষুনি যেন আমাদের প্রশ্নের জবাবে সিঁড়ির দিক থেকে চাপা গলার শব্দ আর হাসি ভেসে এলো, আর আমাদের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে জয়া আর ইরা। জয়ারই সমবয়সী পাশের ছোট বাড়ির একটি মেয়ে।

"কোথায় গিয়েছিলে? কোথা থেকে আসছো?"

জয়া নিঃশব্দে তার কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর বৃষ্টিতে ভেজা জুতো খুলতে লাগল।

শুরা চেঁচিয়ে উঠল—"কোথায় গিয়েছিলে?"

ইরা এতো বেশি উত্তেজিত হয়েছিল যে হাসবার সময় ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। ব্যাপারটা বলতে আরম্ভ করল।

সন্ধ্যা প্রায় দশটার সময় জয়া ইরাদের দরজায় গিয়ে ঘা দেয়। ইরা বেরিয়ে এলে জয়া বলল, মেয়েদের সঙ্গে ওর একটা ব্যাপারে বেশ তর্ক হয়েছে। ওরা বলেছে জয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে "তিমিরিয়াজেভ পার্কের" ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। জয়া বলেছে পারবে, ও ভয় পায় না। তারপর ওরা বাজী রেখেছে—মেয়েরা ট্রামে করে তিমিরিয়াজেভ একাডেমি পর্যন্ত যাবে, আর জয়া যাবে

পায়ে হেঁটে। জয়া বলেছে "আম গাছে দাগ দিতে দিতে যাবো।" ওরা বলেছে —"আমরা তা ছাড়াই তোমার কথা বিশ্বাস করব।" কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওরাই ভয় পেয়ে জয়াকে বারে বারে বলেছে, কাজ নেই আর গিয়ে। 'বাজী আজকের মতো বন্ধ থাক। ভয়ানক ঠাণ্ডা আর অন্ধকার হয়েছে বাইরে, আর বৃষ্টি পড়তেও শুরু হয়েছে।"

ইরা হাসতে হাসতে চেঁচাতে লাগল—"তাতে কিন্তু জয়া আরও রোখ করল। ও বেরিয়ে যেতে আমরাও রওয়ানা হয়ে গেলাম ট্রামে উঠে। আমরা অপেক্ষা করেই আছি, করেই আছি, জয়ার আর দেখা নেই। আমরা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করতেই দেখি ঐ যে জয়া...দাঁড়িয়ে হাসছে।"

আমি তো অবাক হয়ে জয়ার দিকে তাকালাম; ভিজে মোজা শুকোবার জন্যে উনুনের পাশে শুকাতে দিচ্ছে।

বললাম—"তোমার কাছ থেকে আমি এরকম আশা করিনি জয়া, কতো বড়ো মেয়ে হয়েছো তবু এরকম..."

"বোকা?"—জয়া বলল হাসতে হাসতে।

"বোকাই তো! বলেছি বলে রাগ কোরো না—কিন্তু এরকম যারা করে তারা চালাক নয়।"

শুরা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আমি হলে এটাই স্বাভাবিক হতো।" ইরা এবার নালিশের সুরে বলল—"ও আবার ফিরে আসতে চাইছিল হেঁটেই। আমাদের সঙ্গে ট্রামে আসার জন্য কতো না সাধ্যি সাধনা করতে হয়েছে।"

ইরার ভিজে সপ্‌সপে জামাকাপড়ের দিকে চেয়ে আমি বললাম—"ইরা তোমরা জামাকাপড়গুলো বদলিয়ে শীগ্‌গির আগুনের ধারে বস।"

ইরা বলল—"না আমাকেও তো বাড়ি যেতে হবে, আমার মাও রাগ করবেন।"

ইরা চলে গেলে আমরাও কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ রইলাম। জয়া মনের আনন্দে হাসছিল কিন্তু সেও কিছু বললো না। উনুনের ধারে বসে জামাকাপড় আর গা শুকাতে লাগল।

অবশেষে শুরা বলল—"বেশ কথা, তুমি তো বাজী জিতলে কিন্তু কি বাজী রেখেছিলে শুনি?"

জয়া অনুতপ্তের সুরে বলল—"আমি তো বাজীর কথা ভাবিনি, ওরা বলল পণ রাখবে, আমিও রাজী হয়ে গেলাম, জিনিসটা কি তা তো ওরা বলেনি।"

শুরা তো অবাক হয়ে গেল—"তুমি একটি চীজ বটে! তুমি তো আমার কথাও ভাবতে পারতে! যদি আমি জিতি, শুরাকে একটা নতুন ফুটবল কিনে দিও, কিংবা এরকম একটা কিছু। নিজের ভাইয়ের কথাও মনে পড়ল না!" কৃত্রিম আপশোসের ভান করে মাথা নেড়ে শুরা বলল—"কিন্তু তোমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার সত্যিই আমিও আশা করিনি। তোমাকে এরকম মেজাজ দেখাতে কে বলল—আমার পর্যন্ত মনে হচ্ছে এটা ঠিক হয়নি।"

জয়া উত্তর দিল—"আমারই কি মনে হয়নি বুঝি? কিন্তু কি করবো ওদের ভয় দেখাতে আমার এমন মজা লাগছিল। আমি গেলাম বনের মধ্য দিয়ে আর ভয় পেল কিনা ওরা!"

ও হেসে উঠল, আমি আর শুরাও না হেসে পারলাম না।

তানিয়া সলোমাখা

খুব অল্প বয়সেই আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে টাকাকড়ি বিষয়ে পরামর্শ করতে আরম্ভ করলাম।

১৯৩৭ সালে আমরা সেভিংস ব্যাঙ্কে একটা হিসাব খুললাম। প্রথম পঁচাত্তর রুবল জমা দিয়ে হিসাব খোলা হলো। যে ভাবেই আমরা মাসের শেষে কিছু না কিছু জমাতে পারতাম, পনের কিংবা কুড়ি রুবলও হোক না কেন, জয়া তা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসতো।

আমাদের খরচ করবার আরও একটা জিনিস বাড়ল। সোভিয়েত দেশের প্রত্যেক অধিবাসীই ব্যাঙ্কের ১৫৯৭৮২নং হিসাবে কিছু না কিছু জমা দিত, গণতন্ত্রী স্পেনের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করা হতো।

প্রথমে শুরাই প্রস্তাব করল—"জয়া আর আমি তো দুপুরের খাওয়ায় আরও কম খরচ করলে পারি।"

আমি বাধা দিলাম—"না, দুপুরের খাবার থেকে কিছু কমানো হবে না। একটা কি দুটো ফুটবল খেলা না দেখলেই কিছু পয়সা বাঁচবে, তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।"

আমাদের নিতান্ত দরকারী জিনিসপত্রের একটা তালিকা করলাম—জয়ার দস্তানা নেই, শুরার জুতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আমার গ্যালোশে একটা গর্ত হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া শুরার ছবি আঁকার সব রঙ ফুরিয়ে গিয়েছে, জয়ার সেলাইয়ের জন্য কিছু সুতো চাই। জিনিসপত্রের তালিকা সম্বন্ধে কথা উঠলেই তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়, ওরা চায় আমার দরকারী জিনিসটা আমি আগে কিনি।

বই কেনার খরচটাও বেশ ছিল।

বইয়ের দোকানে হানা দিতে কি মজাই না লাগে। কাউন্টারে সাজানো বইয়ের মাঝখানে ঘুরে বেড়াও, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু তাকের বইয়ের পিছন দিককার মলাটে লেখা নামগুলো পড়ার চেষ্টা কর, তাদের ভালমন্দ বিচার কর, তারপর সুন্দর পরিষ্কার কাগজে মোড়া এক বোঝা নতুন চকঝকে বই নিয়ে বাড়ি ফের। জয়ার বিছানার শিয়রের দিকে সেল্ফ্-এ যখন নতুন বই এসে শোভা বাড়াত, আমাদের তখন কি আনন্দই না হতো! বারেবারেই আমরা আমাদের নতুন কেনা বইগুলোর কথা আলোচনা করতাম, আমরা পালা করে আমাদের বই পড়তাম, কখনও বা রবিবার সন্ধ্যায় জোরে জোরে পড়তাম।

এ রকম করে একটা সত্যি গল্পের বই পড়েছিলাম তার নাম "গৃহযুদ্ধে নারী"—বেশ মনে আছে আমি মোজা রিপু করছিলাম, শুরা ছবি আঁকছিল, জয়া বইটা পড়ার জন্য খুলছে এমন সময়ে শুরা হঠাৎ বলে উঠল—"সূচীপত্র অনুসারে পড়তে যেয়ো না, বইটা প্রথম খুলতেই যেটা প্রথমে চোখে পড়বে সেটাই আমরা আগে পড়বো।"

কি করে শুরার মাথায় এই খেয়াল এল সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই কিন্তু আমরা এই নতুন পরিকল্পনাটা মেনে নিলাম। প্রথম যেটা পেলাম,

সে গল্পটার নাম হলো "তানিয়া সলোমাখা", তানিয়া একটি গ্রামের স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ছাত্র, তাঁর বড়ো ভাই গ্রীশা পোলোভিংকো আর ছোট বোন মিলে লিখেছে।

বড়ো ভাই লিখেছেন তানিয়ার ছোটবেলার কথা, কি করে বড়ো হলো, কি রকম ভালোই যে বাসত পড়াশোনা করতে। এক জায়গায় এসে জয়া হঠাৎ থেমে আমার দিকে তাকালো, তানিয়া রাত জেগে "দি গ্যাডফ্লাই" বইটা পড়ে ওর দাদাকে বলেছিল, "কিসের জন্য আমি জীবন ধারণ করছি তা কি আমি জানি না ভাবছো? মানুষ যাতে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য আমার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু আমি বিসর্জন দিতে পারি।"

হাইস্কুল থেকে ডিগ্রী নিয়ে তানিয়া কুবান গ্রামে শিক্ষকতা শুরু করে। বিপ্লবের মুহূর্তে তানিয়া গুপ্ত বলশেভিক বাহিনীতে যোগ দেয়—তারপর গৃহযুদ্ধের সময় লালফৌজ দলে।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রতি-বিপ্লবীরা যখন কোজ্‌মিনস্কোয় গ্রামে হানা দেয়—তানিয়া তখন টাইফাস্‌ জ্বরে শয্যাশায়ী। ঐ অসুস্থ মেয়েটিকেই তারা বন্দী করে তার উপর অত্যাচার চালায়—তার কাছ থেকে কথা আদায় করার জন্য, সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য।

গ্রীশা পোলোভিংকো আর তার সংগীরাও জেলে গিয়েছিলেন, তিনি সেকথাও লিখেছেন। তাঁরা তাকে দেখতে চান, তাঁদের শিক্ষিকাকে সাহায্য করতে চান। তানিয়ার সারাদেহ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তাকে এনে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করানো হলো। তানিয়ার মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, তার নির্বাক চাহনিতে দয়া বা অনুগ্রহ, এমন কি আঘাতের বেদনার চিহ্নও নেই, বড়ো বড়ো চোখ করে সে শুধু তাকিয়ে ছিল সমবেত জনতার দিকে।

হঠাৎ হাত তুলে পরিষ্কার গলায় তানিয়া চেঁচিয়ে উঠল—"তোমরা আমাকে যতো খুশি মার না কেন. এমন কি হত্যা করতেও পার. তবু জেনে রাখো সোভিয়েত বাহিনী মরেনি, তারা বেঁচে আছে,—তারা এলো বলে।"

একটা কসাক সার্জেন্ট বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তানিয়ার কাঁধটা দুফাঁক করে ফেললো, মাতাল কসাক দস্যুগুলো ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাথি, কিল রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল। "তোকে দয়া ভিক্ষে চাইয়ে ছাড়ব" —হতভাগা সার্জেন্টটা চেঁচাতে লাগল—মুখের উপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া রক্তের ধারা মুছতে মুছতে তানিয়া বলল—"পারবে না, তোমাদের কাছ থেকে আমি কোন কিছুই ভিক্ষে চাইব না।"

দিনের পর দিন, বারবার তানিয়ার উপর অত্যাচারের কাহিনী জয়া পড়ে গেল,—পড়ল, প্রতি-বিপ্লবী সৈন্যরা কি করে তানিয়া নির্বাক থাকার, দয়া ভিক্ষা না করার, অত্যাচারীদের দিকে সগর্ব চাহনিতে তাকাবার জন্য অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতো।"

জয়া বইটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল, জানালার পাশে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। ও কক্ষনো কাঁদতো না, আর কেউ ওর কান্না দেখুক এটাও চাইত না।

পড়া আরম্ভ হতেই শুরা তার ছবির এ্যালবাম ফেলে রেখেছিল, এবার বইটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। এবার তানিয়ার ছোটবোন রায়া সলোমাখা লিখেছে—"ওর মৃত্যু সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তা এই—৭ই নভেম্বর সকাল-

বেলা কসাকরা বন্দীশালায় ঢুকে পড়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে মেরে বন্দীদের সেলের বাইরে নিয়ে আসতে থাকে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তানিয়া বাদ-বাকিদের দিকে ফিরে শান্তস্বরে বলে—'বন্ধুগণ বিদায়। এই দেয়ালে যতো রক্তপাত হয়েছে তা বিফল হয় না যেন—সোভিয়েত বাহিনী আসছে।'

"কুয়াশায় ঢাকা ভোরে, সাধারণ গোচারণ ক্ষেত্রের পাশে আঠারোজন শহীদের জীবনান্ত হয়, তানিয়ার হয় সকলের শেষে, তার কথা সে রেখেছে—অত্যাচারীর কাছে সে দয়াভিক্ষা করেনি।"

এই বইটি পড়ে তানিয়া-চরিত্রের বিস্ময়কর দৃঢ়তা আর পবিত্রতার পরিচয় পড়ে কেবল যে জয়াই বিচলিত হয়েছিল তা নয়, সবাই আমরা খুবই বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম।

ওদের প্রথম উপার্জন

এক দিন সন্ধ্যাবেলা আমার দাদা আমাদের সংগে দেখা করতে এলো। চা খাওয়া, গল্প করা শেষ হলে পর সে হঠাৎ চুপ করে গেল, কাগজপত্রে ঠাসা মস্ত হাতব্যাগটা খুলতে খুলতে বেশ অর্থপূর্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। আমরা তক্ষুনি বুঝতে পারলাম—দাদা কিছু একটা আমাদের জন্য এনেছে।

জয়া জিজ্ঞেস করল—"সার্জি মামা ওতে কি আছে?" তখুনি কোন জবাব না দিয়ে, সার্জি বেশ রহস্যজনকভাবে চোখ টিপে ধীরে সুস্থে তার ব্যাগটা খুলল, কতকগুলো কাগজপত্র বার করে ড্রইংগুলো খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল—আমরাও খুব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অবশেষে সার্জি বলল—"এই নক্সাগুলো নকল করতে হবে; শুরা ড্রইং-এ কি রকম নম্বর পাও?"

জয়া জবাব দিল—"ও 'চমৎকার' পায়।"

"তাহলে বাছা শুরা, তোমার জন্য আমি একটা কাজ এনেছি, বড়োদের মতো কাজ। তা ছাড়া, কিছু উপার্জনও হবে। মাকে সাহায্য করতে পারবে। এই যে আমার যন্ত্রপাতির বাক্স, আমি কলেজে পড়ার সময় এগুলো কিনেছিলাম, এখনও বেশ ভালো কাজ করা যায় এগুলো দিয়ে। তোমার তো কালো চাইনীজ কালি আছে, না?"

জয়া জবাব দিল—"হ্যাঁ, আর নকল করার কাগজও আছে।"

"বেশ, বেশ। আর একটু সরে এসো তোমরা। ব্যাপারটা কি করে কি করতে হবে ভালো করে বুঝিয়ে দিই। কাজটা মোটেই শক্ত নয়, কিন্তু খুব নির্ভুল আর নিখুঁত হওয়া চাই।"

জয়া মামার পাশে বসে পড়লো। শুরা ছিল আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, সে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, একটা কথাও বলল না, এগিয়েও এলো না। সার্জি ওর দিকে এক নজর তাকিয়ে ড্রইংগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে বোঝাতে শুরু করল।

দাদা আর আমি দুজনেই বুঝলাম ব্যাপারটা কি?

শুরার চরিত্রের এই একগুঁয়েমির দিকটা আমাকে খুব ভাবনায় ফেলেছিল। যেমন ধরো—শুরা গান-বাজনায় বেশ ভালো, কানও বেশ সজাগ, ওর বাবার গীটারটা বেশ অনেকদিন ধরেই বাজাচ্ছে। কখনও কখনও হয়তো এমন হয় যে সুরটা ও একেবারে ধরতে পারছে না, আমি হয়তো বললাম—"ওখানটায় ভুল হচ্ছে, এ রকম হবে—" ও বেশ শান্তভাবে আমার কথা শুনল, তারপর বলল—"না আমার কাছে এই সুরটাই বেশ লাগছে", আর সেই ভুলই বাজিয়ে চলল। ও বেশ জানে আমি ঠিকই বলছি, কিন্তু এবার সে কিছুতেই সে সুরটা বাজাবে না, পরেরবার ঠিক বাজাবে। যা কিছু সে করুক না কেন, ছোট বড়ো যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামতো নেবে, কারোর নির্দেশে নয়। ওর ধারণা, ও এখন বড়ো হয়েছে, নিজেই সব বোঝে, সব করতে পারে।

কাজে কাজেই ওর মনে হলো মামার এই নির্দেশ ওর স্বাধীনতায় অকারণ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সার্জি যখন কাজটা করার নিয়মকানুন সব বলে যাচ্ছিল --ও দূর থেকে মনযোগ দিয়ে সব শুনে যাচ্ছিল,—ওর মামা অবশ্য ওর দিকে আর মন দেয়নি। বার হয়ে যাবার সময় কারোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করেই বলল--"ড্রইংগুলো কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই চাই।"

জয়া ফিজিক্স বই নিয়ে পড়তে বসল, আমি অন্য দিনের মতো ছাত্রদের খাতা নিয়ে বসলাম, শুরাও বই নিয়ে বসল। দাদা চলে যাবার কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঘরটা চুপচাপ ছিল, তারপর জয়া উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা টান করে মাথাটা একবার ঝাঁকালো, (ডান ভুরুর উপরে পড়া একগোছা চুল মাথাটা ঝাঁকিয়ে সরানো ছিল ওর অভ্যাস) দেখলাম ওর বাড়ির পড়া শেষ হয়েছে।

টেবিলের উপর ড্রইংগুলো ছড়িয়ে রাখতে রাখতে জয়া বলল--"এবার আমরা আরম্ভ করতে পারি, তাহলে আমরা আজ রাতে অর্ধেকটা শেষ করতে পারবো। পারবো না মা?"

শুরা বইটা ফেলে দিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—"বসে বসে 'মাই ইউনিভার্সিটিজ' পড় দেখি, তোমার সাহায্য ছাড়াই আমার চলবে, তোমার চেয়ে আমি ভালো আঁকতে পারি।"

(জয়া সে সময়টায় গর্কির আত্মজীবনী পড়ছিল) জয়া সে কথায় কান দিল না। দুজনে মিলে ওদের কাগজপত্র টেবিলের উপর ছড়িয়ে সারা টেবিলটাই দখল করে বসল, আমার খাতাপত্র নিয়ে আমি একেবারে এক কোণে সরে গেলাম। ছেলেমেয়েরা কাজে একেবারে ডুবে গেল। সাধারণত যে-সব কাজে খুব বেশি মনযোগ বা বুদ্ধির দরকার হয় না, যেমন সেলাই করা, কাপড় কাচা, ঘর-দরজা পরিষ্কার করা—তখন প্রায়ই জয়া শুরা গান করে থাকে—এখনও তেমনি, ধীরে ধীরে জয়া আরম্ভ করল—

হে শ্যামল শষ্পের মর্মরধ্বনি,
হে স্তেপ অঞ্চলের শ্যামল তৃণরাজি
অতীত কীর্তিগাথা
রবে অবিনশ্বর—
বজ্র নির্ঘোষের ধ্বনি বহুদিন মিলিয়ে গেলেও—

শুরা নীরবে শুনল, তারপর সেও নিচু গলায় যোগ দিল। তারপর গলায় জোর এলো, আস্তে আস্তে জয়া আর শুরার গলা এক হয়ে বেশ পরিষ্কার সুরে শোনা যেতে লাগল। অটোমান তুর্কীদের সংগে যুদ্ধে নিহত কসাক

বালিকার কীর্তিগাথা শেষ হয়ে গেলে ওরা আরম্ভ করল আমাদের সকলের প্রিয় একটি গান. আনাতোলি পেত্রোভিচও এটা গাইতে ভালোবাসতেন—

প্রশস্ত নীপারের অশান্ত গর্জন
দুরন্ত পবন ছিন্ন করে পত্রাবলী,
উন্নত বনানী আজ মস্তক করেছে নত
দুরন্ত তরঙ্গে ফুলে ওঠে বারিরাশি।

ওরা কাজের সঙ্গে গান করে চলল. ওদের কথার দিকে মনযোগ না দিয়েও বুঝতে পারছিলাম গানের সুরে। সে সুর তাল আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি আজ বেশ সুখী...

এক সপ্তাহ পরেই শুরা তার কাজগুলো নিয়ে মামার সঙ্গে দেখা করতে গেল, আর এক বোঝা ড্রইং নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো।

"ওমা মা শুনছো, ড্রইংগুলো মামার খুব পছন্দ হয়েছে. আমাদের টাকা, জেয়ার আর আমার. আমরা নিজেরা উপার্জন করেছি।"

আমি বললাম—"সার্জিমামা আর কিছু বলেনি বুঝি?" শুরা মুচকি হাসি হেসে বলল—"তিনি আরও বলেছেন—বেশ বেশ এমনি করে চালিয়ে যাও।"

এক সপ্তাহ পরে সকালবেলা উঠে দেখি. আমার বিছানার পাশে চেয়ারের উপর দু'জোড়া মোজা আর একটি ভারি সুন্দর সাদা কলার. ওদের প্রথম উপার্জনের টাকা থেকে ছেলেমেয়েরা কিনে এনেছে, বাদবাকি টাকাটা একটা খামের মধ্যে পুরে পাশে রেখে দিয়েছে।

অনেক দিন পরেও সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম. সিঁড়িতে থাকতে থাকতেই আমি শুনতে পেতাম ওদের গানের সুর। ওরা আবার ওদের ড্রইং-এ মন দিয়েছে বোঝা যেতো।

ভেরা সার্জিয়েভনা

কারো নজরে পড়ার মতো বিশেষ কিছু ঘটনা না ঘটে আমাদের জীবন বয়ে চলল স্বচ্ছন্দগতিতে। এমনি মনে হবে প্রত্যেকটা দিন যেন আগেরটার পুনরাবৃত্তিমাত্র। স্কুল আর কাজ. কোনদিন বা থিয়েটার, কি কনসার্ট, আবার পড়াশোনা, বইখাতা, খানিক বিশ্রাম,—এই বোধ হয় সব। কিন্তু আসলে এই সব নয়।

ছোট ছেলে কিংবা কিশোর জীবনে প্রত্যেকটা ঘন্টাই মূল্যবান। পৃথিবীর চারদিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে তার পরিচয় হচ্ছে. কোন কিছুই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে না নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে চায়। প্রত্যেকটি জিনিস নিজে যাচাই করে ভালোমন্দ, উঁচু নিচু, সুপথ কুপথ. বন্ধুত্ব, আনুগত্য, ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি নিজেই বিচার করে জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধেও তার আগ্রহ জন্মে। প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা তার মনে এসে দোলা দিয়ে যায়। চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে। তা ছাড়া মনের প্রতিক্রিয়াও হয় এ সময়ে গভীর।

এখন আর বই কেবলমাত্র সময় কাটানোর উপায় নয়। এখন বই হলো উপদেষ্টা, চালক। জয়া আগে বলতো "বইয়ে যা লেখা থাকে সব সত্যি।" এখন সে বইয়ের উপর ঘন্টার পর ঘন্টা ঝুঁকে পড়ে তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্নের মীমাংসা চায় বইয়ের কাছ থেকে।

তানিয়া সলোমাখার গল্পটা পড়ার পর আমরা নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কির "ইস্পাত" বইটা পড়লাম। পাভেল কুরচাগিন-এর পবিত্র অমর চরিত্র কখনও তরুণ পাঠক পাঠকপাঠিকার মনে ইস্পাতের আঁচড় দিতে কসুর করে না, আমার ছেলেমেয়েদের মনেও অবিস্মরণীয় দাগ কেটে দিল।

প্রত্যেকটি নূতন বই-ই ওদের প্রিয় ছিল। ওরা এমনভাবে তাদের পড়া বইগুলো নিয়ে আলোচনা করতো যেন তারা সত্যিই জীবন্ত চরিত্র। যে চরিত্রগুলো ওদের প্রিয় বা অপ্রিয় হয়ে উঠত তাদের নিয়ে তুমুল তর্ক শুরু করে দিত।

ভালো বই তরুণ জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। জীবন্ত মানুষও কম প্রয়োজনীয় নয়, একটি ব্যক্তির চরিত্র তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে বদলে দিতে পারে। আমার ছেলেমেয়েদের জীবনে স্কুলের প্রভাব ছিল অসীম। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের উপর তাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। বিশেষ করে ওদের স্টাডি-ডিরেক্টর—ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ রিয়াজেভ-এর কথা ওরা বলাবলি করতো।

জয়া অনেক সময়ই বলতো, "তিনি খুব বিচক্ষণ আর খুব ভালো শিক্ষক। আর কি চমৎকার মালী আমাদের বাগানের, তাকে আমরা মিচুরিন বলে ডাকি।"

ওদের অংকের শিক্ষক নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচের কথা বলতে শুরার খুব উৎসাহ। তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন ভেবেচিন্তে অঙ্ক বার করার জন্য। কেউ এলোমেলো উত্তর দিলে তিনি যেমন ধরে ফেলেন, তেমনি কেউ যদি কলের মতো নিয়মটা মাত্র শেখে তবে তাও তেমনি বুঝে ফেলেন তিনি।

তোতাপাখির মতো শুধু মুখস্থ করাকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, কেউ যদি বোঝার চেষ্টা করে সে হলো স্বতন্ত্র কথা। একটু আধটু ভুল হলে তিনি বলেন, "ঘাবড়িয়ো না, আবার চিন্তা করে দেখ—তখন উত্তর ভেবে নেওয়াটা আরও সহজ হয়ে দাঁড়ায়।"

জয়া আর শুরা দুজনেই তাদের ক্লাশলীডার (সর্দার পোড়ো) য়েকাতেরিনা মিখাইলোভনার কথা বলতো। "মেয়েটি এতো ভালো, আমাদের পক্ষ হয়ে সে সব সময়ই অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। আমি নিজেও শুনেছি, ক্লাশে যদি কেউ দুষ্টুমি করে, বা কোন গোলমাল হয় তাহলে য়েকাতেরিনা মিখাইলোভ্নাই সকলের আগে তার পক্ষ নিয়ে লড়বে।"

যিনি জার্মানভাষা শেখান, তিনি কখনো গলার সুর চড়াতেন না, সব সময়ই বেশ ঠাণ্ডা মেজাজ। তিনি খুব কড়া নন, কিন্তু তার জন্য তাঁর ছাত্রেরা কেউই বাড়ির পড়া খারাপভাবে তৈরি করতো না, তিনি ছেলেমেয়েদের ভালোবাসেন, তারাও তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দেয়, সে জন্যেই পড়ার সময়ে তাঁর ক্লাশে শৃংখলার কোন বিঘ্ন হয় না। পড়ার উন্নতিও বাধা পায় না।

যেদিন থেকে জয়া আর শুরা ভেরা সার্জিয়েভ্না নোভোশেলোভার কাছে রুশভাষা ও সাহিত্য পড়তে শুরু করলো সেদিন থেকেই ওদের জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় শুরু হলো।

জয়া শুরা কেউই বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ভালোবাসত না, বড় হওয়ার সংগে সংগে ওদের চরিত্রের এই দিকটা আরও পরিস্ফুট হতে লাগল, উচ্ছ্বাসের কথা ওরা সযত্নে পরিহার করে চলতে লাগল। ভালোবাসা, কোমলতা, আনন্দ, ক্রোধ ইত্যাদি ওরা প্রকাশ করতো ওদের হাবভাবের মধ্য দিয়ে। চোখের ভাব, মুখের চেহারা, ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে হাঁটবার ভঙ্গি থেকে বোঝা যেতো, আমার ছেলেমেয়েরা রাগ করেছে না খুশি আছে।

একবার জয়ার যখন বছর বারো বয়স, আমাদের জানালার সামনে একটা ছেলে একটা কুকুরকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতে থাকে। ঢিল ছুঁড়ে মারছিল, ল্যাজ ধরে টানছিল, এক টুকরো মাংস ওর নাকের উপর ধরে দিয়ে যেই সেটা কামড়াতে যাবে অমনি টেনে নিচ্ছিল। জয়া জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে সব দেখল, তারপর সেই শীতের শুরুতে কোট পরার জন্য সময় নষ্ট না করেই এমন একটা মুখের ভাব নিয়ে নিচে নেমে গেল, যে আমার ভয় হলো ছেলেটিকে ধরে মারই বা দেয় বুঝি! ও কিন্তু গলার সুরটা উঁচু করলো না—সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছে শুনতে পেলাম—"থাম বলছি, ছেলে তো নয় মূর্তিমান যন্ত্রণা একটি।"

বেশ ঠাণ্ডা সুরে বললেও বলার মধ্যে এমন তীব্র তিরস্কার প্রচ্ছন্ন ছিল যে ছেলেটি যেন চমকে উঠে কোন কথা না বলেই পালিয়ে গেল।

জয়া যদি কেবল মাত্র বলত—"বেশ লোকটি" তাহলেই আমি বুঝে নিতাম, উল্লিখিত ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হয়েছে।

কিন্তু ভেরা সার্জিয়েভ্নার প্রতি শুরা আর জয়ার শ্রদ্ধা তারা লুকোবার চেষ্টাও করত না। জয়া বারেবারেই শুধু বলত—তিনি যে কি চমৎকার মানুষ তা যদি খালি দেখতে?

"আচ্ছা কি রকম মানুষ তিনি? তাঁকে তোমাদের এতো ভালো লাগে কেন?"

"মনে হয় আমি বোঝাতে পারি না,—আচ্ছা ধর, তিনি যখন ক্লাশে আসেন, কোন কিছু নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন, তিনি কেবল মাত্র পড়াতে হবে বলেই যে তাঁর রুটিনের বাঁধা কাজ করে যাচ্ছেন না তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। তিনি যা বলে যাচ্ছেন তা যে বেশ চিত্তাকর্ষক আর প্রয়োজনীয় তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন। তাঁর ইচ্ছে নয় যে আমরা শুধু মুখস্থ করে রাখি, আমাদের বুঝতে হবে। ছেলেমেয়েরা তো বলে আমরা তাঁর পড়ানোর গুণে বইয়ের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত বলে মনে করি। তারা বই-এর জগতের বাইরে বেরিয়ে আসে। খুব সত্যি কথা, তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন—'কেমন লাগছে এঁকে, ভালো লাগছে? এ রকম না করে ও যদি অন্য রকম কাজ করতো তাহলে কেমন হতো বল তো?' আর আমরা বুঝতেও পারি না কখন তিনি চুপ করেছেন। আমরাই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা একজনের পর একজন করে তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিই। এরকম না হয়ে ওরকম হলে ভালো হতো। প্রত্যেকের বলা হয়ে গেলে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্য বলেন—এতো সুন্দর করে গুছিয়ে সহজ করে বলেন মনে হয় তিনি ত্রিশজনের সংগে কথা বলছেন না! তিন জনের সংগে বলছেন। তাঁর কথাগুলো বইয়ে পড়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় আমাদের। তাঁর কথা শোনার পর যখন বই পড়ি, মনে হয় আগে কতো কিছুই লক্ষ্য না করে পড়ে গিয়েছি, এবার যেন

নতুন মনে হচ্ছে...আবার দেখ তাঁর জন্য আমরা মস্কো শহর নতুন করে চিনেছি। প্রথম দিনই ক্লাশে তিনি বললেন—'লিও টলস্টয় মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলে? ওস্তংকিনো মিউজিয়ম দেখেছ?' তারপর রেগে গিয়ে বলে উঠলেন—'তোমরা আবার নিজেদের মস্কোর বাসিন্দা বলে পরিচয় দাও!' কোন্ জায়গায় আমরা তাঁর সঙ্গে না গিয়েছি। সবগুলো মিউজিয়ম দেখেছি। প্রত্যেকবারই তিনি আমাদের নতুন কিছু চিন্তার খোরাক জোগান।"

শুরা যোগ দিল—"হ্যাঁ সত্যিই তাই, তিনি ভারি ভালো।" এতো আবেগের উচ্ছ্বাসে শুরাও কম অভিভূত হয়নি। নিজের উচ্ছ্বাসকে চাপা দেবার জন্যও বটে আর তার কথাগুলো বাড়াবাড়ি শোনাবে বলেও বটে সে সবসময়ই নিচু গলায় প্রশংসা করতো, তা করতে অবশ্য তার বেশ কষ্ট হতো, তবে চোখ এবং মুখের ভাব পরিষ্কার বলে দিচ্ছিল—তিনি অতি আশ্চর্য!

ওরা যখন চেরনিশেভ্স্কি পড়তে আরম্ভ করল তখনই আমি বুঝতে পারলাম সাহিত্যের উপর, ইতিহাসের উপর অনুরাগ কাকে বলে।

উঁচু মান

জয়ার তালিকা অনুযায়ী বই দিতে দিতে লাইব্রেরিয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করল—"তোমার মেয়ে বুঝি কলেজে পড়ে?"

তালিকায় সবসময়ই অনেক রকমের বইয়ের নাম থাকতো। পারী কমিউন সম্বন্ধে কাগজে লেখার জন্য জয়া কতো বই-ই না পড়েছে! ফরাসী শ্রমিক কবি পত্তিএ আর ক্লেমোঁ-র কবিতা থেকে অনুবাদ, ঐতিহাসিক কাহিনী, ১৮১২ সালের স্বাধীনতার লড়াইয়ের সম্বন্ধেও অনেক ঘটনা পড়েছে, কুতুজভ আর বাগ্রাতিয়ন-এর কথা, তাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা পড়তে পড়তে ও তন্ময় হয়ে যেতো, তলস্তয়ের "যুদ্ধ ও শান্তি" থেকে ও মুখস্ত বলে যেতো সময় সময়। রূপকথার বীর ইলিয়া মুরোমেৎ সম্বন্ধে লেখার সময় সে এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার তালিকা দিয়েছিল, যে কয়েকটি লাইব্রেরি ঘুরে আমাকে সেগুলো খুঁজে বার করতে হয়।

জয়া যে প্রত্যেকটা কাজই একাগ্র ভাবে করে সেটা তো আমার কাছে আর নতুন খবর নয়, সব বিষয়ের একেবারে মূল অনুসন্ধান করাই ছিল তার লক্ষ্য। যে কোন বিষয় নিয়ে একবার আরম্ভ করলে সে একেবারে ডুবে যেতো। তবুও চেরনিশেভ্স্কি পড়ার আগে পর্যন্ত এরকম গভীর ভাবে নিজেকে তন্ময় ভাবে ঢেলে দিতে দেখিনি। যেদিন জয়া চেরনিশেভ্স্কির লেখার সঙ্গে পরিচিত হলো সেদিন তার জীবনে এক স্মরণীয় তারিখ।

ভেরা সার্জিয়েভনার কাছ থেকে চেরনিশেভ্স্কির জীবনী সম্বন্ধে শোনার পর জয়া এসে বলল, "মা ওঁর সম্বন্ধে সব কিছু জানতে আমার ইচ্ছে করছে, আমাদের স্কুলে তো শুধু আছে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান্' তোমাদের লাইব্রেরিতে কি আছে একবার খুঁজে দেখো না। একটা পুরো জীবনী, তার সমসাময়িকদের কাছ থেকে লেখা চিঠিপত্র, তাদের স্মৃতিকথা এসব পেলে পরে তিনি স্বাভাবিক

জীবনে কি ধরনের লোক ছিলেন সে সম্বন্ধে একটা ধারণা পাবো।" স্বল্প-ভাষী মেয়েটি হঠাৎ প্রগল্‌ভা হয়ে উঠলো। সে যা ভেবেছে, যা আবিষ্কার করেছে, জ্ঞানের যে স্ফুলিঙ্গ তাকে আলোকিত করেছে তার ভাগ আমাদের দেবার জন্য তার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

চেরনিশেভস্কির পুরনো জীবনী বার করে জয়া বলল, "এখানে বলছে দেখ, ছেলেবেলায় চেরনিশেভস্কির পড়া ছাড়া অন্য কিছুতেই মন ছিল না। কিন্তু তাঁর ভাইকে কি একখানা ল্যাটিন কবিতা অনুবাদ করতে দিয়েছেন : 'ন্যায়ের জয় হোক্ নয়তো পৃথিবী রসাতলে যাক।' একি কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনা!...এখানে দেখ দেখি পিপিন-এর কাছে লেখা চিঠিটা পড়—'কেবলমাত্র ক্ষণিক সুখের জন্য কাজ না করে পিতৃভূমির স্থায়ী গৌরবের জন্য, মানবজাতির উন্নতির জন্য কাজ করার চেয়ে উচ্চতর সম্মান আর কি আছে?' তোমাকে আর বেশি বিরক্ত করবো না মা কিন্তু শোন দেখি ডায়েরির এই পাতা—'আমার আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য আমি হাসতে হাসতে মরতে পারি, আমি যদি জানতে পারি, কেবলমাত্র বুঝতে পারি যে আমার আদর্শ মহৎ, আমার আদর্শ জয়যুক্ত হবে—তাহলে যেদিন আমার আদর্শের জয় হবে সেদিন আমি বেঁচে থাকব না বলেও দুঃখ করব না। আদর্শের জন্য মৃত্যুকে বরণীয় মনে করে বিন্দুমাত্র অনুতাপ করব না।'...এদের কথা বলতে গিয়েও তোমরা বলো তিনি কেবলমাত্র পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন!"

একবার "হোয়াট ইজ্ টু বি ডান্"—বইটা পড়তে আরম্ভ করে আর তার থেকে উঠতে পারছে না, এতো গভীর ভাবে জয়া সেটা পড়ছিল যে বোধহয় ওর জীবনে প্রথমবার খাবার গরম করতে ভুলে গেল। আমাকে আসতেও সে দেখেনি বোধহয়। একবার মাত্র বই থেকে মুখ তুলে অনির্দিষ্টভাবে তাকাল, দৃষ্টি তার সুদূরে, আবার সে বইয়ে ডুব দিল। ওকে আর বিরক্ত না করে আমি স্টোভটা জেবলে সুপ গরম করতে দিলাম কাপড় ধোবার জন্য বালতি করে জল ঢালতে লাগলাম। তখন মাত্র জয়া নড়ে বসল, লাফিয়ে উঠে আমার হাত থেকে বালতিটা নিয়ে বলল—"আমি করছি।"

সে রাত্রে খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমি আর শুরা ঘুমাতে গেলাম, রাত্রে আমার ঘুম ভাঙতে দেখলাম জয়া তখনও পড়ছে। আমি উঠে নীরবে ওর হাত থেকে বইটা নিয়ে তাকের উপর রেখে দিলাম, জয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে অনুনয়ের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো—

"আলো জেবলে রাখলে আমি ঘুমাতে পারি না, আমাকে কাল খুব ভোরে উঠতে হবে যে—" কেবলমাত্র আমার কথাই ওকে এই পড়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারতো।

পরদিন সকালবেলা শুরা দিদিকে ক্ষেপাতে আরম্ভ করলো—"জান মা জয়া তো কাল স্কুল থেকে এসেই বই-এর মধ্যে ডুব দিল, মনে হলো জয়া হারিয়ে গেছে বই-এর জগতে। আমার তো মনে হচ্ছে রাখমেতভ্-এর মতো পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করবে।"

জয়া কিছুই বললো না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা জর্জি দিমিত্রভের—রাখমেতভ্ এর গল্পের সমালোচনা লেখা বইটা নিয়ে এলো স্কুল থেকে। বিপ্লবের প্রতি প্রথম পদক্ষেপে তরুণ বুলগেরীয় শ্রমিক রুশ লেখকের এই চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। দিমিত্রভ লিখেছেন, তরুণ জীবনে এই রাখমেতভ-এর মতো দৃঢ়-

চেতা, বলিষ্ঠ হবার জন্য ছিল তাঁর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, শ্রমিক-সমাজের মুক্তির জন্য তিনিও নিজের ব্যক্তিগত জীবন বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন।

জয়ার এবারকার রচনার বিষয়বস্তু ছিল—"চেরনিশেভ্‌স্কির জীবনী"। সে অক্লান্তভাবে পড়াশোনা করে যেতে লাগলো, এমন সব ঘটনা ও কাহিনী আবিষ্কার করতে লাগলো, যাদের সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না।

সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর ভাবে জয়া চেরনিশেভ্‌স্কির কৃত্রিম ফাঁসি বর্ণনা করে গেল। বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে সকাল, ফাঁসির মঞ্চ আব থাম আর শিকল, সাদা হরফে "রাজ আসামী" লেখা কালো বোর্ড চেরনিশেভস্কির গলায় ঝুলছে...

তিন মাস ধরে তার সেই ক্লান্তিকর ভ্রমণ হাজার হাজার মাইল ধরে। অবশেষে সাইবেরিয়ার দূরপ্রান্তে অবস্থিত 'কাদাইয়া' কলোনীতে গিয়ে আশ্রয় নেন, সেখানেও নির্বাসিত বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নির্বাপিত করার জন্য জার সরকারের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না।

কোন একটা বইয়ে জয়া, যেখানে চেরনিশেভ্‌স্কি বাস করতেন সেখানকার নির্বাসিত কোন রাজনৈতিক নেতার হাতে আঁকা কালির কয়েকটা আঁচড়ে তার একটা ছবি পায়। শুরা জয়ার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তার খাতায় সেই ছবিটা নকল করে নিয়ে তাতে আসল জিনিসগুলো অর্থাৎ তার পারিপার্শ্বিক যোগ করে দেয়। পরিত্যক্ত শীতার্ত প্রদেশ, হতাশার মূর্তিমান রূপ, দিক্‌-চক্রবালের রেখা, পাতলা বনের ছবি, কবরের উপর ক্রুশের চিহ্ন, সবই যেন নিচু হয়ে আকাশের কাছে হার মানছে, ছোট কুটিরটিও যেন ভেঙে পড়ছে, তার ভিতরে যেন কোন সান্ত্বনা, কোন আরাম, কোন আনন্দ নেই।

বছরের পর বছর এই নিরানন্দ নির্জন পরিবেশে কেটে গেল।...কি হতাশা-ভরা জীবন। তার থেকেও অবিশ্বাস্য ছিল নিকোলাই গাভিলোভিচ্‌ চেরনি-শেভস্কির স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিগুলো, তারা বরফ আর রাত্রির অন্ধকারে দুই মাসের পথ অতিক্রম করে আসতো, কিন্তু তারা বয়ে আনতো আশার আলো, প্রেম, ভালোবাসা আর কোমলতা।

এমনি করে কেটে গেল দীর্ঘ সাতটা বৎসর। মুক্তির ঠিক আগে তাঁর স্ত্রী ওলগা সক্রেরোভ্‌নার কাছে চেরনিশেভ্‌স্কি একটি চমৎকার চিঠি লেখেন।

"প্রিয় বন্ধু আমার, আমার জীবনের আনন্দ, আমার প্রেম আর কল্পনার উৎস—আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে আমি তোমার কাছে চিঠি লিখছি। আমার জীবনের মূর্তিমতী আনন্দ তুমি, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, আগামী ১০ই আগস্ট থেকে তোমার আর ছেলেমেয়েদের কাছে আমি আর কেবলমাত্র অলস আর অপদার্থ হয়েই থাকবো না। আগামী শরৎকালেই বোধহয় আমি 'ইরকুৎস্কে' জায়গা খুঁজে নেব, আর তাহলেই আমি আগেকার মতো কাজ করতে পারবো। শীঘ্রই সবকিছুই আবার আগের মতো হবে...আগামী শরতে..."

প্রত্যেকটি চিঠির কথায় আবার তাদের শীগগিরই দেখা হবে এই আশাই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু তার বদলে এলো আবার ভিলুয়িস্ক-এ নির্বাসন—দীর্ঘ তের বছরের নিঃসঙ্গ জীবন। তুন্দ্রা অঞ্চলের শৈবালাচ্ছন্ন জলাভূমিতে বছরের ছয়মাসই শীত, এই দুরন্ত কারাবাসের দিনগুলিতে মুক্তির কণামাত্র আশার আলোকও দেখা যেতো না। সম্মুখে অনন্ত অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা, তুষার আর কিছুই নাই। তার...

কর্নেল ভিনিকভ এসে চেরনিশেভস্কির কাছে সরকারের প্রস্তাব জানালেন

—তিনি যেন সরকারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে দরখাস্ত পাঠান, তার বদলে আসবে মুক্তি আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

চেরনিশেভস্কি উত্তর দিলেন—"ক্ষমাপ্রার্থনা করবো কেন সেটাই তো প্রশ্ন!... পুলিশবাহিনীর নেতা শুভালভের মস্তিষ্ক থেকে আমার মস্তিষ্কে পদার্থ কিছু কম আছে বলে কি আমি নির্বাসিত হয়েছি! আর তারই জন্য কি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে? তোমাকে এই কষ্ট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ,...মুক্তি ভিক্ষা করতে আমি একেবারেই অস্বীকার করছি!"

আবার দিনগুলোকে টেনে নিয়ে চললেন—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল।

মনে ছিল তাঁর কর্মপ্রেরণা আর সাহস—সৃষ্টি করা ছিল তাঁর উৎসাহ, দূর ভবিষ্যৎ দেখার ছিল ক্ষমতা। রুশ কৃষকদের প্রতি যে ভাবাবেগপূর্ণ ঘোষণাপত্র লেখা হয় তা তাঁরই হাতে লেখা। তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল হার্টজেন-এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা, তিনি তাঁর 'কলোকলে' প্রার্থনার আহ্বান না জানিয়ে যেন রাশিয়াকে কুঠার হস্তে লড়াই করার আহ্বান জানান। তাঁর সারাটা জীবন তিনি একই লক্ষ্যের উদ্দেশে নিয়োজিত করেছেন—শোষিত সমাজের মুক্তি। তাঁর নববিবাহিতা বধূকে পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন একবার "আমার জীবন আমার নিজের নয়। আমি এমন একটি পথ বেছে নিয়েছি যাতে জেল অথবা নির্বাসনের ভয় আমার সর্বদাই থাকবে।" আর এই লোকটিই কিনা তাঁর সবথেকে পীড়াদায়ক যন্ত্রণা—কর্মহীনভাবে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন! এমন কি তাঁর মুমূর্ষু বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে একবার দাঁড়াতেও তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

নেক্রাসভ মৃত্যুশয্যায়—চেরনিশেভস্কির কাছে এই খবর যেন শক্তিশেলের মতো বাজলো। পিপিন-এর কাছে তিনি লিখলেন—"যখন তুমি আমার এই চিঠি পাবে তখনও যদি নেক্রাসভ বেঁচে থাকে তাহলে তাকে বলবে—আমি তাকে মানুষ হিসাবে অত্যন্ত ভালোবাসি, আমার প্রতি তার অনুরাগের জন্য ধন্যবাদ জানাই, তার যশ বিশ্ব বিস্তৃতি লাভ করবে এই দৃঢ় ধারণা নিয়ে আমি তার জন্য পাঠালাম আমার চুম্বন, রাশিয়ার জন্য তার ভালোবাসা, রাশিয়ার কবিশ্রেষ্ঠ নেক্রাসভ-এর নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—আমি তার জন্য দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছি..."

তিনমাস পর যখন এই চিঠি নেক্রাসভের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, তখনও তিনি জীবিত, মুমূর্ষু কবি জানালেন—"নিকোলাই গাভ্রিলোভিচ্‌কে জানিও—তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, তাঁর চিঠির মূল্য আমার কাছে অন্য যে কারোর কথার চেয়ে মূল্যবান্, আমি এখন তৃপ্ত।"

কুড়ি বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্বাসনে কাটাবার পর চেরনিশেভস্কি অবশেষে মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন। প্রচণ্ড অধৈর্যে ভরা তাঁর মন। কোথাও না নেমে একেবারে একদমে তিনি বন্ধুর পথ অতিক্রম করে চলে এলেন। 'আস্ত্রাখান'এ এসে পৌঁছলেন। আর একটি নিষ্ঠুর আঘাত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এখানেও, দাগী সরকারী আসামীর লেখা কাগজে ছাপবার দায়িত্ব কে নেবে? চেরনিশেভস্কি আবার কাজ থেকে বঞ্চিত হলেন, আবার কর্মহীনতা, নিঃশব্দতা আর চারিদিকে অনন্ত শূন্যতা!

চেরনিশেভস্কির মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে লেখক কোরোলেঙ্কো তাঁর

সঙ্গে দেখা করতে যান, তিনি লিখে গিয়েছেন নিকোলাই গাভ্রিলোভিচ্ দয়া নিতে অস্বীকার করতেন, তাঁর নিজের উপর সম্পূর্ণ দখল ছিল, যেখানে তাঁর নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা পাওয়ার কথা, সেখানে তিনি সে দুঃখযন্ত্রণাকে কারও সঙ্গে ভাগাভাগি না করে মাথা উঁচু করে সহ্য করতেন।"

জয়া রচনাটি আমাদের পড়ে শোনালো। শুরা আর আমি দুজনেই যা মনে হলো বললাম—"ভারী সুন্দর".

শুরা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বললো—"আমি ভেবেছিলাম একটা মস্তো বড়ো ছবি আঁকব। এটার নাম দেব—'চেরনিশেভস্কির বেসামরিক হত্যাকাণ্ড'।"

জয়া তাড়াতাড়ি বললো—"হার্টজেনও একথা বলেছেন, তিনি লিখেছেন—'চেরনিশেভ্স্কি কাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে' এই ছবিটা কি কেউ আঁকবে না? তিনি বলেছেন, এই ছবি থেকেই প্রকাশ পাবে মানুষের চিন্তাধারাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করতো ঐ জনতার শত্রুরা।"

জয়াকে শেষ করতে না দিয়েই শুরা বলে চললো—"আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মেয়ে দুটি চেরনিশেভ্স্কিকে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে, পাশে দাঁড়ানো কর্মচারী চেঁচিয়ে উঠলো—'বিদায়'। সেই মুহূর্তে যখন চেরনিশেভস্কির মাথায় ঘাতকের খড়্গ উদ্যত হলো, তার তখনকার মুখের চেহারাও দেখতে পাচ্ছি...চেরনিশে-ভস্কিকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করলেও তাঁর অন্তরকে সে জয় করতে পারে নি, পারবেও না; তা তাঁর মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।"

পরেরদিন আমি ঘরের দরজায় পা দিতেই শুরা চেঁচিয়ে উঠলো, "মা ভেরা সার্জিয়েভ্না জয়াকে ডেকে পাঠিয়ে চেরনিশেভস্কির জীবন ও কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকেন—"

"তাই নাকি?"

"চমৎকার মা চমৎকার! গোটা ক্লাশ যেন হাঁ হয়ে সব শুনলো, আমি তো আগে থেকেই সব জানতাম, তবুও আমি আবার শুনলাম, ভেরা সার্জিয়েভ্না তো বেজায় খুশি হয়েছেন।"

জয়া রচনাতেও 'চমৎকার' পেয়েছে।

আমি বললাম—"ওর এটা প্রাপ্য"।

শুরা চেঁচিয়ে উঠল—"নিশ্চয়ই!"

অনেকেই হয়তো ভাবতে পারে এই 'চমৎকার' বিশেষণ পেয়ে জয়া কাজকর্ম একেবারে বন্ধ করে দেবে, কিন্তু আসলে তা নয়। চেরনিশেভস্কির জীবন, তাঁর বই, তাঁর কাজকর্ম জয়াকে আকর্ষণ করেছিল, তাঁর কাজকর্মের আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। রচনা লেখার ফলে জয়ার এটাই সবচেয়ে বড়ো লাভ হয়েছিল।

কেমিস্ট্রিতেও চমৎকার

কতকগুলো বিষয় কঠিন লাগলেও জয়া খুব ভালো পড়াশোনা করতো, কখনও অংক আর ফিজিক্স নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত খাটতো, শুরাকে সাহায্য করতে দিত না।

একটা পরিচিত ছবি দিচ্ছি। সন্ধ্যা হয়েছে। অনেকক্ষণ আগেই শুরার পড়া শেখা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু জয়া এখনও পড়ার টেবিলে বসে আছে।

"কি করছ?"

"এলজেব্রা. কিছুতেই অংকটা হচ্ছে না।"

"দাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"না, আমি নিজেই করবো।"

আধঘন্টা—একঘন্টা কেটে গেল।

শুরা রেগে বললো—"আমি শুতে যাচ্ছি, এই নাও তোমার জবাব. আমি করে তোমার টেবিলে রেখে দিলাম।"

জয়া তার মাথাটা ঘোরালো না পর্যন্ত। শুরা কাঁধ বাঁকিয়ে রেগে শুতে চলে গেল। জয়া অনেক রাত পর্যন্ত বসে অংক কষতে লাগলো। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলে সে ঠান্ডা জল দিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এসে আবার বসলো। প্রশ্নের জবাব তার হাতের কাছে তৈরি, হাতটা বাড়ালেই হয়।...কিন্তু জয়া সেদিকে তাকিয়েই দেখলো না।

পরের দিন 'এলজেব্রা'য় জয়া 'চমৎকার' পেল, ওর ক্লাশের কেউ মোটেই আশ্চর্য হলো না। শুধু আমি আর শুরাই জানতাম এই 'চমৎকার' পাবার জন্য তাকে কি মূল্য দিতে হয়েছে।

শুরা সব জিনিস তাড়াতাড়ি বুঝতে পারতো, সেজন্য প্রায়ই অসাবধানভাবে পড়া তৈরি করে 'মোটামুটি ভালো' নম্বর নিয়ে বাড়ি আসতো। আর শুরার প্রত্যেকটা 'মোটামুটি ভালো' তার নিজের চেয়েও জয়াকে ব্যথা দিত বেশি।

"তোমার কাজে তুমি অবহেলা করছ? তুমি জানো না কি তোমার কাজ তোমাকেই করতে হবে?"

শুরা শুধুমাত্র ভুরু কুঁচকে নিঃশ্বাস ফেলতো, কখনও বা রেগেমেগে বলতো —"তুমি কি মনে কর এইসব গভীর জ্ঞানের কথা আমি কিছুই বুঝি না?"

"তা যদি বোঝ, প্রমাণ কর না কেন? খালি একটা বই একবার দেখে ফেলে দিলেই তো আর হলো না! একবার আরম্ভ করলে শেষ অবধি পড়, তখনই না বোঝা যাবে তোমার কত ক্ষমতা! কেউ যদি কোন কাজ যে কোনরকম করে শেষ করে, তাতে আমার ভারি বিরক্তি বোধ হয়!"

"জয়া, এতো মেজাজ খারাপ দেখাচ্ছো কেন?"

জয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিল—"আমি কেমিস্ট্রিতে 'চমৎকার' পেয়েছি।"

বিস্ময়ে আমার মুখের চেহারা এমনি হলো যে শুরা সশব্দে হেসে ফেললো। নিজের কানকে আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি কি বলতে চাইছ যে 'চমৎকার' পাওয়াতে তোমার দুঃখ হয়েছে?"

জয়া অবাধ্য ভঙ্গিতে চুপ করে রইলো। "দেখ না, জয়ার ধারণা ও কেমিস্ট্রি ভালো জানে না. তাই 'চমৎকার' পাওয়া ওর উচিত হয় নি।" শুরা বিরক্তির সুরে বললো। কনুয়ের উপর ভর দেওয়া হাতদুটোর উপর চিবুক রেখে বিমর্ষ চোখে জয়া একবার আমার দিকে. একবার শুরার দিকে তাকাতে লাগলো।

জয়া বললো "শুরা ঠিক কথাই বলেছে মা, এই 'চমৎকার' পেয়ে আমার মোটেই আনন্দ হয় নি। অনেক ভেবে ভেবে শেষে আমি গিয়ে ভেরা আলেক-জান্দ্রোভনার কাছে বললাম, 'আমি তো ঐ বিষয়টা অতো ভালো জানি না।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এরকম যে তুমি বলতে পেরেছ তার মানে হলো তুমি শীগগিরই বিষয়টা ভালো বুঝতে পারবে, তাই তোমাকে ঐ 'চমৎকার' নম্বরটা আমি আগেভাগেই দিয়ে রাখলাম'।"

শুরা রেগেমেগে বললো, "আর তিনি হয়তো ভাবছেন, তুমি চালাকি করছ।"

জয়ার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, "তিনি তা ভাবেন নি"। শুরোর কথাগুলো জয়াকে আহত করেছে বুঝতে পেরে আমি বললাম, "ভেরা আলেক্‌জান্দ্রোভনা তো বেশ জ্ঞানী আর ন্যায়বান, তিনি যদি বুঝে থাকেন তাঁর ছাত্রছাত্রীরা কি ধরনের লোক. তাহলে জয়ার সম্বন্ধে তিনি কখনও এরকম ভাববেন না"।

জয়া কোন কাজে বেরিয়ে গেলে শুরা আবার কেমিস্ট্রির নম্বর নিয়ে পড়লো। অস্বাভাবিক গম্ভীর সুরে শুরা বললো, "মা আমি আজ জয়াকে খামাকা দোষ দিই নি"। জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল শুরা, হাতের তালু দুটো ছিল জানালার তাকের উপর. ভুরুগুলো কুঁচকানো। তাতে রাগের চিহ্ন বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

বেশ অবাক হয়েই আমি কি ঘট্‌বে তার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

"জান মা, জয়া কখনো কখনো এমন ব্যবহার করবে যা কেউ বুঝতে পারে না। ধর এই নম্বরের ব্যাপারটাই। আমাদের ক্লাশে এমন কোন ছাত্র নেই যে এই 'চমৎকার' পেয়ে খুশি না হয়, তারা কেউ ভাববেও না এই 'চমৎকারটা' পাবার সে ঠিক উপযুক্ত কিনা। কেমিস্ট্রির মাষ্টারমশাই দিয়েছেন, ব্যস্‌ তাহলেই হলো। জয়া নিজেকে খুব কঠিন ভাবে বিচার করছে। ধর না এক দুইদিন আগের কথা। বোরিয়া ফোমেনকভ বেশ ভালো একটি রচনা লিখেছে, ও জানে ও বিস্তর ভুল করে. তাই শেষে পুশকিন থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিয়েছে—'হাস্যবিহীন প্রবালরক্তিম ওষ্ঠের মতো ব্যাকরণের ভুল না থাকলে আমি আমার মাতৃভাষা পছন্দ করি না'। সবাই হেসে উঠল, শুধু জয়া হাসল তো নাই-ই. আবার ওকে শাসন করে বললো, এটা তার কর্তব্যকাজ, এটা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করা মোটেই উচিত নয়।......"

খুব গরম সুরে শুরা বলতে লাগলো, "আমার রাগ হয় কেন জান? ঠাট্টা-তামাসা জয়া বেশ পছন্দই করে, কিন্তু স্কুলে জয়া ঠাট্টাতামাসার কথা ভাবতেই পারে না। কারোর খালি একবার মজা করতে আরম্ভ করার অপেক্ষা"...আমার চোখের দিকে চেয়ে ভাষাটা বদলে নিল শুরা—"একটু ঠাট্টা করা আর কি, এতে আর এমন কি দোষ বলো—জয়া অমনি তাকে লম্বা এক বক্তৃতা ঝেড়ে বসলো। গতকাল ক্লাশে কি গোলমাল, যদি শুনতে! কাল, শ্রুতলিপি ছিল একটি মেয়ে জয়াকে একটা শক্ত বানান জিজ্ঞাসা করলো, ভাবো দেখি—জয়া তাকে বলে দিতে অস্বীকার করলো ; ঘণ্টা বেজে গেলে পর গোটা ক্লাশ অর্ধেক অর্ধেক করে দুটো ভাগ হয়ে গেল, কেউ জয়াকে দোষ দিল—জয়া সাথী হিসাবে অত্যন্ত

মন্দ। অন্যরা চেঁচাতে লাগলো—জয়া আদর্শ কাজ করেছে। দু'দলে দারুণ ঝগড়া লাগে আর কি।"

"তুমি কোন পক্ষ নিলে?"

"হায় হায়, আমি কোন পক্ষই বা নেব। কিন্তু জান, আমি যদি জয়া হতাম তাহলে, একজন সহপাঠীকে বলে দিতে কক্ষনো আপত্তি করতাম না।"

এক মিনিট চুপ করে থেকে আমি বললাম—"শোন শুরো, অনেকদিন আগে জয়া যখন অংক করতে পারতো না, তখন কি ও তোমার সাহায্য নিত? তুমি কিন্তু অনেক আগেই শেষ করে ফেলতে।"

"না, ও আমাকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করতো না। মনে আছে এলজেব্রার সেই কঠিন অংকটা করার জন্য জয়া ভোর চারটে পর্যন্ত বসে ছিল সে রাত্রে?"

"তাই কি?"

"তাহলে আমার মনে হয় নিজের উপর যে এতো বেশি কড়া সে অন্যের সম্বন্ধেও তাই হবে। আমি জানি, অনেক ছেলেমেয়েই বলেদেওয়াকে তাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখনও এই রকম ছিল। কিন্তু এই নিয়মটা পুরনো আর খারাপ। যারা বলে দেওয়া আর মুখস্ত করার উপর নির্ভর করে তাদের আমি দেখতে পারি না, আর এজন্যই জয়া নিজের মত সাহসের সংগে প্রকাশ করতে পারে দেখে আমার বেশ ভালো লেগেছে।"

"কতক ছেলেমেয়ে এ কথাই বললো। তারা বললো, জয়া বেশ স্পষ্টবাদী, যা সে ভাবে তাই বলেছে। পেতিয়া বলেছে, কোনকিছু বুঝতে না পারলে জয়া বুঝিয়ে দিতে কখনও অস্বীকার করবে না, কিন্তু পরীক্ষার সময় বলে দেওয়া অসাধুতা। তাহলেও......"

"তাহলেও!"

"তাহলেও, এটা বন্ধুত্বের পরিচায়ক নয়।"

"জয়া যদি বুঝিয়ে দিতে বা সাহায্য করতে আপত্তি করতো, সেটাই বন্ধুত্বের পরিচায়ক হতো না, কিন্তু পরীক্ষার সময়ে কাউকে বলে দিতে আপত্তি করাটাই আমার মতে বন্ধুত্বের পরিচায়ক। নির্ভীক এবং দৃষ্টান্ত।"

বুঝলাম শুরো তার সিদ্ধান্ত বদলায়নি, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে খালি তার বই-এর পাতা ওল্টাতে লাগল, মনে হলো নিজের মনের সংগে তার দ্বন্দ্ব তখনও চলছে।

তা হলেও শুরার কথাগুলোয় ভাবনা হলো।

জয়া বেশ হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল মেয়ে, ও থিয়েটার দেখতে খুব ভালোবাসতো। যদি কখনও আমাদের বাদ দিয়েই থিয়েটার দেখতে যেতো, ফিরে এসে যা দেখেছে শুনেছে তা এমন গভীরভাবে, অনুভূতি দিয়ে বর্ণনা করতো যে আমার আর শুরার মনে হতো আমরা নিজেরাই দেখেছি ঐ নাটকটা। জয়ার তামাসা করবার ক্ষমতা ছিল বরাবর। তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে হঠাৎ সরস তামাসা ঝলকানি দিয়ে উঠতো। তার বাবার কাছ থেকে সে এটা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। এক এক সন্ধ্যায় আমরা তার তামাসা বা রসিকতায় এমন হেসে উঠতাম যে সারাসন্ধ্যা ধরে আমাদের সে হাসি আর থামতো না।... হয়তো জয়া বেশ স্বাভাবিক সুরেই কথাবার্তা বলে যাচ্ছে...হঠাৎ মুখে হাসির

ভাব মোটেই না এনে, জয়া গলার সুর বদলে ফেললো, মুখের চেহারার পর্যন্ত পরিবর্তন এসে গেল...কাকে অনুকরণ করছে তখনি বুঝে ফেলে আমি আর শুরা এমন হাসতে লাগলাম যে চোখে জল না আসা পর্যন্ত আর সে হাসি থামলো না।

দেখছি পিঠটা একটু বাঁকিয়ে, ঠোটদুটো একটু চেপে বেশ শান্ত স্বরে থেমে থেমে জয়া বলতে লাগলো—"বাছারা, দোষ দিও না, কিন্তু এই বলে দিচ্ছি... তোমরা ছেলেমানুষ, তোমরা তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু বেড়াল যদি রাস্তা পার হয়—তাহলে নিশ্চয়ই কোন বিপদ হবে..."

চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আমাদের পাশের ফ্লাটের বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার আবক্ষ মূর্তি—শুরা চেঁচিয়ে উঠলো—"আকুলিনা বোরিসোভ্‌না।"

এবার জয়া ফাঁপাগলায় কঠোর সুরে বললো—"কি হচ্ছে এসব? থামাও বলছি শীগগির! না হলে আমি কিন্তু কড়া ব্যবস্থা করতে বাধ্য হব।"

আস্পেন বনের স্কুল পাহারাদারকে দেখতে পেয়ে আমরা হেসে উঠ্‌লাম।

লোকজন বেড়াতে এলে তাদের যেমন জয়া ভালোবাসত, বড়োদের সঙ্গে সহজে মিশতেও পারতো তেমনি। সার্জিমামা, কি ওল্‌গা মাসী, নয়তো বা আমার কোন সহকর্মী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো, জয়া তো ভেবেই পেত না কোথায় তাদের বসাবে, কি তাদের খেতে দেবে? উত্তেজিত হয়ে ঘুরে বেড়াতো, নিজের রান্না খাবার ওদের খেতে দিতো, আর যদি তাদের বসার সময় না থাকতো তাহলে ভীষণ দুঃখিত হতো।

কিন্তু স্কুলে তার সমবয়সীদের সঙ্গে জয়ার ব্যবহার বড়ো গম্ভীর, অসামাজিক. তাতেই আমাকে ভাবিয়ে তুলতো।

একবার তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা তোমার কোন বন্ধু নেই কেন?"

জয়া জবাব দিল—"তুমি বুঝি আমার বন্ধু নও? শুরা বুঝি আমার বন্ধু নয়? ইরার সঙ্গে আমার ভাব নেই বুঝি?" একটু থেমে একটু হেসে বললো—"শুরার তো ক্লাশের অর্ধেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব। আমার ওসব আসে না।"

নিরিবিলি

"জয়া, কি লিখছো?"

"বিশেষ কিছু নয়!"

তার মানে মোটা বাঁধানো চৌকো একখানা খাতা আর ডায়েরীর উপর ঝুঁকে লিখছে।

আজকাল জয়া ডায়েরীতে বেশি লেখেটেখে না।

শুরা বললো—"দেখি একবার"

জয়া মাথা নাড়লো।

"তাহলে তুমি তোমার আপন ভাইকেও দেখাতে চাওনা এটা? আচ্ছা বেশ।"

শুরার রাগ আর ভয়-দেখানো সুরটা অবশ্য ঠাট্টা, কিন্তু ওতে কিছুটা অভিমানও ছিল।

"আমার আপন ভাই এটা পড়ে হাসতে আরম্ভ করবে" বললো বটে জয়া, আবার একটু পরেই বেশ শান্ত স্বরে আমাকে বললো, "ইচ্ছে করলে দেখতে পার।"

ডায়েরীটা বড়ো অদ্ভুত, বারো বছরের জয়ার ডায়েরীর মতো কিছুই নয়। কোন ব্যক্তিগত ঘটনা নেই তাতে, হয়তো একটা-দুটো কথা, কিংবা কোন বইয়ের একআধটা উদ্ধৃতি, না হয় কবিতার এক লাইন। কিন্তু এই কথা বা লাইনের ভিতর দিয়েই আমি আমার মেয়ের তখনকার মনের অবস্থা, চিন্তাধারা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

অন্যগুলোর সঙ্গে এটাও ছিল ঃ

"বন্ধুত্ব মানে সব কিছুর ভাগ নেওয়া, এমন কি চিন্তা বা কর্মপন্থা পর্যন্ত এক থাকা, দুঃখ আনন্দের ভাগ নেওয়া। তাতে মনে হয় বইয়ে যে লেখে বিপরীতধর্মী লোকেদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়, এটা ভুল। যতো বেশি মিল থাকে ততই ভালো। এমন বন্ধুই লোকে চায়, যাকে বিশ্বাস করা যায় সব গোপন কথা বলে। আমার তো ইরার সঙ্গে বেশ ভাব আছে, আমরা বয়সেও সমান, কিন্তু তবু যেন মনে হয় ও আমার চেয়ে ছোট।"

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি থেকে এই উদ্ধৃতিটা ছিল ঃ "মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি হলো জীবন আর এই জীবন মানুষ মাত্র একবারই পায়, কাজেই তার এমনভাবে জীবন কাটানো উচিত যাতে ভুলপথে কাটানো অতীতের জন্য কখনো অনুতাপ না করতে হয় ; এমনভাবে কাজ করবে যাতে মরার সময় বলতে পার—'আমার সারাজীবন, সমস্ত শক্তি আমি ব্যয় করেছি পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদনে, মানবজাতির মুক্তির জন্য'।"

আবার এই কথাগুলোও ছিল—এগুলো জয়ার লেখা না উদ্ধৃতি, তা আমার জানবার কোন উপায় ছিল না ঃ

"যে নিজের কথা খুব বেশি ভাবে না—সে নিজে যা মনে করে তা অনেক ভালো।"

আরও ছিল ঃ

"নিজেকে শ্রদ্ধা করবে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বেশি উঁচু ধারণা পোষণ করবে না। শামুকের মতো নিজের খোলের মধ্যেই ঢুকে থেকো না আবার এক-তরফা হয়ো না। লোকে তোমাকে সম্মান দেয় না বা তোমার যথার্থ মূল্য বোঝে না বলে চেঁচিয়ে, আরও কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে নিখুঁত কর, তাতে তুমি আরও বেশি আত্মবিশ্বাস পাবে।"

কি রকম এক অদ্ভুত জটিল অনুভূতি নিয়ে আমি খাতাটা বন্ধ করলাম। এর থেকে আমার মনে হলো, কেউ যেন রাস্তা খুঁজে কখনও সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে, আবার পেয়ে হারিয়ে আবার খুঁজেছে। মন আর প্রাণের প্রতিটি চিন্তধারা যেন এই আয়নার মতো খাতার বুকে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমি ঠিক করলাম—জয়ার ডায়েরী আর পড়ব না। খানিকটা সময় নিজের চিন্তাধারা নিয়ে নাড়াচাড়া করা, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখা—অন্যের সন্ধানী চোখ, হোক না সে চোখ মায়ের—এড়িয়ে নিজের কাজকর্ম নিয়ে মনে মনে আলোচনা করা—এটা ভালোই।

জয়াকে বললাম—"আমাকে বিশ্বাস করে দেখতে দিয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু তোমার ডায়েরী অন্যের পড়া চলবে না।"

নেতৃত্বের শপথ

১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মের শেষে জয়া যুবসঙ্ঘে প্রবেশ করার জন্য তৈরি হতে লাগলো। নিয়মকানুনগুলি বারেবারেই পড়ে, শুরাকে বলতো তার পড়াগুলো ঠিকমতো মুখস্থ হয়েছে কিনা দেখবার জন্য।

এই সময়ের সঙ্গে আমার ভারী একটা স্মরণীয় ঘটনা জড়িত আছে।

একদিন শুরা বললো, "মা দেখ, কি পুরনো একখানা খবরের কাগজ, একেবারে হলদে হয়ে গিয়েছে। দেখ তারিখটা, ১৯২৪ সাল।"

খবরের কাগজটা হলো প্রাভ্দা—তারিখ ১৯২৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি। নিঃশব্দে আমি কাগজটা তুলে নিলাম, বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে পড়লো সেদিনের কথা, কুয়াশাচ্ছন্ন ফেব্রুয়ারির একটি দিন, গ্রামের পাঠাগার লোকে লোকারণ্য, পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে আনাতোলি পেত্রোভিচ্ গ্রামের কৃষকদের কাছে স্তালিনের শপথবাণী পড়ে শোনাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—"কোথায় পেলে কাগজটা?"

"তুমি যে বললে বাবার ড্রয়ারে আমি আমার স্কুলের বইপত্র রাখতে পারি, ড্রয়ারটা খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ দেখতে পেলাম, ভাঁজ খুলে দেখি..."

"হ্যাঁ, তখন আমি এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। জয়া তখনও ছয়মাসের হয় নি, আমি চেয়েছিলাম জয়া বড়ো হয়ে পড়বে।"

জয়া বললো—"তাহলে এটা আমার কাগজ?"

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এতো পুরনো হয়ে গিয়েছে যে হাত দিলে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা। সাবধানে ছড়িয়ে এটার উপর নিচু হয়ে জয়া পড়তে আরম্ভ করলো।

শুরা বললো—"চেঁচিয়ে পড়।"

সেই সুদূর অতীতের কথাগুলো আমার এতো পরিষ্কার মনে ছিল—তারা আবার কানের কাছে গুনগুনিয়ে উঠল।

"মহাসাগরে অবস্থিত প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো, চারদিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ দিয়ে ঘেরা আমাদের দেশ দাঁড়িয়ে আছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে তার গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে একেবারে অতলে ডুবিয়ে দেবে, কিন্তু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে অটুট স্থৈর্যে, এতো শক্তি ও পেল কোথায়?"

জয়ার এ বাণীটা মুখস্থ ছিল। কিন্তু এখন যেন নতুন অর্থ নিয়ে জয়ার কাছে এরা ধরা দিল, পুরনো দিনের সাক্ষী এই হলদে খবরের কাগজের পাতাটা সেই সময়কার গাম্ভীর্য আর মাধুর্য সেই শব্দসম্ভার নিয়ে এলো বয়ে।

জয়া ধীরে ধীরে পড়লো—"কমরেড লেনিন, আমরা শপথ করছি, যে এই প্রতিজ্ঞাও আমরা সার্থকভাবে পরিপূরণ করবো।"

পরের দিন ক্রেমলিন সামরিক বিদ্যালয়ে একটি স্মৃতিসভায় জোসেফ স্তালিনের বক্তৃতা—জয়া লাইব্রেরী থেকে বাড়ি নিয়ে এলো। মনে আছে এমনি করে জয়া ঠিক এইভাবে স্তালিনের লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল দেখে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। স্তালিনের বক্তৃতাগুলোর ভাব আর দৃষ্টান্তগুলো এমনি স্বচ্ছ আর বিশ্বাসযোগ্য, ছোট ছোট নতুন পড়ুয়ার কাছে তো এগুলো এতো সহজ যে আমাদের এই নেতার চিন্তাধারা আমার পনেরো বছরের মেয়ের মনে গেঁথে গেল।

আমাদের অবিস্মরণীয় এই হলদে খবরের কাগজটি যে বিরাট লম্বা এক বইয়ের তালিকার মধ্যে কি কি নাম জুগিয়েছিল তা আমার ঠিক মনে নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিক পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্তালিনের রিপোর্ট জয়া পড়ে ফেললো, সোভিয়েত রাশিয়ার বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে গঠনতন্ত্রের উপরে স্তালিনের বক্তৃতাও পড়া হলো তারপর। যা পড়েছে তা সত্যি সে বুঝেছে কিনা যাচাই করে নেওয়াটা জয়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এবার আমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি,—এটা বলাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ডায়েরীতে আবার নতুন আঁচড় পড়লো, জয়া এবার আমাকে দেখালো—হেনরি বারবুসের "স্তালিন" বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি।

কার্ল মার্কস আর লেনিনের মুখের পাশে, যে মানুষটির মুখের চেহারা আঁকা হয় লাল পতাকায়, তিনি প্রত্যেকটা জিনিস এবং প্রত্যেকটি লোকের বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন, আজ যা হয়েছে তাও যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন, কাল যা হবে তাও তেমনি তিনি সৃষ্টি করবেন। তুমি যে কেউ হও না কেন, তাঁর বন্ধুত্ব তোমার প্রয়োজন। যেই হও না তুমি, এই মানুষটির হাতেই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশাভরসা নির্ভর করছে, পোশাকে সাধারণ সৈনিক, চেহারায় শ্রমিক, মেধাবী বিশ্বান্ এই মহামানব প্রহরা দিচ্ছেন সকলকে আর কাজ করে যাচ্ছেন সকলেব জন্য।

যা না বললেও চলে

শরৎকালে আবার স্কুল শুরু হতে শুরা আমাকে বললো, "এখন আমি দেখছি আমাদের ক্লাশের সবাই জয়াকে শ্রদ্ধা করে, আরও কয়েজন যুবসঙ্ঘের সদস্য হবার জন্য তৈরি হয়েছে ; তারাও আলোচনা করার জন্য তার কাছে আসতো। যুবসঙ্ঘের সদস্যপদে তার আর বেশি কি উন্নতি হবে, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বাসী, দায়িত্বসম্পন্ন, সব গুণেই জয়ার আছে। সাধারণ সভায় জয়া তার জীবনী পড়লো, বেশ পবিত্র আর গুরুগম্ভীর সে সভা। তারা অনেক ধরনের প্রশ্ন করেছিল, তার জবাব পেয়ে তারা জয়ার দরখাস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করছে। প্রত্যেকটি সভ্য বললেন—'জয়া সৎ, স্পষ্টবাদী, আদর্শ কমরেড, সামাজিক কাজকর্মও করে, পিছিয়ে যারা পড়ে থাকে, তাদের সাহায্য করে'..."

মনে পড়লো, জয়া যখন তার আত্মজীবনী লিখতে বসে একপাতাতেই সব শেষ করে ফেলে, বড়ো চিন্তিত দেখাচ্ছিল তাকে। বলেছিল—"কিছুই তো আমার লেখার নাই, জন্মেছি, স্কুলে ভর্তি হয়েছি, এখন পড়াশোনা করছি... আমি বিশেষ কি করেছি? কিছুই না।"

সেদিন জয়ার চেয়ে শুরার উৎসাহ বিন্দুমাত্র কম ছিল না। এরকম অবস্থায় আমি ওকে আগে কখনো দেখি নি। জেলা কমিটির বাইরে অপেক্ষা করছিল শুরা। অনেক দরখাস্ত পড়েছিল প্রার্থীদের প্রায় সকলের শেষে জয়ার ডাক পড়েছিল। শুরা পরে বলেছিল—"আমি তো অপেক্ষা করে করে প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম।"

আমিও আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। জানালা দিয়ে বারেবারেই তাকিয়ে দেখছিলাম ওরা আসছে কিনা। রাত হয়ে আসছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি হলো!

তারপর আমি রাস্তায় বেরিয়ে জেলা কমিটির দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম। কয়েক পা যেতে না যেতেই ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে বেশ উত্তেজিত হয়েই আমাকে এসে জড়িয়ে ধরলো। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—"গৃহীত হয়েছে। সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।"

সুখের লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা জয়াকে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম, কি কি ঘটেছে তা সব এইবার বলতে শুরু করলো।

"জেলা কমিটির সভাপতি এতো ছেলেমানুষ আর এতো হাসিখুশি মা! আমাকে তিনি এতো এতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন—কমসোমল (যুবসংঘ) কি? স্পেনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কি জানি? মার্কসের কি বই পড়েছি? আমি বললাম শুধু সাম্যবাদীর ফতোয়া পড়েছি। প্রায় শেষের দিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'নিয়মাবলীর মধ্যে তোমার মতে কোন বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?' আমি ভেবে বললাম, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যুবসংঘের সভ্য তার দেশের জন্য সমস্ত শক্তি ঢেলে দেওয়া প্রয়োজন, নয় কি?' কিন্তু তিনি বললেন—'আর পড়াশোনা করে যুবসংঘের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা তাহলে কি?' আমি তো অবাক—বললাম—'তা তো আর বলে দিতে হবে না'—তখন তিনি পর্দা সরিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—'ওখানে কি?' আমি আবার আশ্চর্য হয়ে বললাম—'কিছু না!' 'কিন্তু দেখছ কি কতো সুন্দর সুন্দর তারা আছে আকাশে? প্রথমে তাদের দিকে চোখ পড়ে না কেন জান—কারণ ওরা স্বভাবতই ওখানে থাকে বলে। আর আর একটা কথা মনে রেখো, জীবনে যা কিছু মহৎ, যা কিছু বৃহৎ, সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে ছোট ছোট তুচ্ছ জিনিসের উপর ভিত্তি করে। কখনও যেন একথাটা ভুলো না!' বড়ো চমৎকার করে বলেছেন কথাটা, না মা?"

শুরা আর আমি সমস্বরে বললাম—"খুব"।

জয়া বলে চললো—"তারপর—তিনি আমাকে বললেন, যুবসংঘের তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিনের বক্তৃতা আমি পড়েছি কিনা?" আমি বললাম—"নিশ্চয়ই পড়েছি।"

"মনে আছে কিছু?"

"মুখস্থ আছে।"

"মুখস্থ থাকলে, সব থেকে স্মরণীয় জায়গাটা শোনাও তো?"

আমি বললাম, "কাজেই, আজ যাদের পনের বছর বয়স, যারা আগামী দশ বিশ বছরে সাম্যবাদী সমাজে বাস করবে, তারা শিক্ষার দায়িত্ব এমনিভাবে পালন করবে যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দিনের পর দিন তরুণসমাজ যৌথ-শ্রমের সমস্যার বাস্তব সমাধান করতে থাকবে, তা সে শ্রম যতোই সামান্য, যতোই সাধারণ হোক না কেন।"

আমার প্রশ্নের উত্তর জয়া দিতে পারবে না জেনেই আমি প্রশ্ন করলাম—"কবে তুমি ভ্লাদিমির ইলিচ্-এর তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতার কথা প্রথম শোন, মনে আছে জয়া?"

কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল।

জয়া একটুও ইতস্তত না করে বললো—"তখন আমি গ্রীষ্মশিবিরে, আগুনের পাশে বসে।"

আমরা চা খেতে বসলাম—জয়া সেদিনের আরও খুঁটিনাটি সব ঘটনা মনে করে বলতে লাগলো, শুতে যাবার সময় বললো—"মনে হচ্ছে আমার জীবনে যেন কিছু পরিবর্তন এসেছে—আমি যেন এখন নতুন মানুষ।"

হাসি চাপতে না পেরে আমি বললাম—"এস তাহলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করে নিই"—কিন্তু জয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠাট্টা করার সময় এ নয়, তখন আমি বললাম—"আমি বেশ বুঝতে পারছি, জয়া।"

স্তারোপেত্রোভস্কি স্ট্রীটের বাড়ি

আলেকজান্দার হার্টজেন একবার বলেছিলেন—"মানবতার প্রতি গভীর অনুরাগ জাগ্রত হলে তরুণকে যেমন মহৎ করতে পারে এমন আর কিছুই পারে না।" যখন ভাবি আমার সাথী আর ছেলেমেয়েরা কিভাবে বেড়ে উঠেছে তখন মনে হয়ঃ সত্যিই, এই জিনিসই তাদের মনের তারুণ্যকে অনুপ্রাণিত করে সুন্দরতর করে তুলেছিল। আমাদের দেশের ভিতরে ও সীমানার বাইরে যা কিছু ঘটেছে—সবই ওদের মনকে নাড়া দিয়েছিল, ওদের একান্ত নিজেদের বিষয় হয়েছিল।

জয়া আর শুরা দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছে- শুধু দর্শকের মতো ওরা চেয়ে থাকে নি, প্রত্যেকটি কাজে নিজেরাও যোগ দিয়েছে। নতুন তৈরি কারখানা, সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অসমসাহসী পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সংগীত প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত সংগীতজ্ঞদের সাফল্য,- সবই ওদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। এগুলো নিয়ে ওরা এত ভাবতো : ওদের স্কুলে বাড়িতে, প্রায় সবসময়ই এইগুলো ওদের মনের মতো আলোচনার বিষয় ছিল, আর এইভাবে ওরা শিক্ষা পেয়েছিল।

জেলা কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে কথাবার্তা জয়ার শুধু যে মনে ছিল তাই নয়, তার স্মৃতিতে সেটা গাথা হয়ে গিয়েছিল, জয়ার নতুন জন্মমুহূর্তে সেক্রেটারীর প্রতিটি কথা তার জীবনে দেববাক্যে পরিণত হয়েছিল।

কর্তব্য পালনে জয়া চিরদিনই আশ্চর্যভাবে নিখুঁত, দায়িত্বশীল ছিল। কিন্তু এখন তার প্রতিবিন্দু শক্তি-সামর্থ্য, সারা মনপ্রাণ দিয়ে, তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে তা পালন করতো, কারণ এখন তার স্থির বিশ্বাস ছিল, তাকে যা কাজ দেওয়া হয়েছে, ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ্ সর্বসাধারণের হিতার্থে সকলকে যা কাজ দিয়েছেন, এটা তারই অংশমাত্র।

কমসোমলের সভ্যদের ভর্তি হওয়ার খুব অল্পদিনের মধ্যেই জয়া একটি কমসোমল দলের ব্যবস্থাপক পদে নির্বাচিত হলো। সে তৎক্ষণাৎ কমসোমলের নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলোর তালিকা তৈরি করতে লেগে গেল, তার নীতি ছিল—নিজেকে যারা কমসোমল সভ্য বলে পরিচয় দেবে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কমসোমল-এর কাজ করতে হবে, প্রত্যেককেই সে জিজ্ঞাসা করতো কি কাজ করতে তার ইচ্ছা আর কি কাজে তার উৎসাহ। আমাকে বলেছিল—"তাহলে

কাজ বেশ ভালো চলবে।" ক্লাশের বন্ধুদের সে বেশ ভালো করে নজরে রেখেছে, কাজেই কে কি জবাব দেবে তা জয়ার প্রায় জানাই ছিল। কর্তব্যের তালিকা ছিল বেশ লম্বা—আর খুঁটিনাটিতে টানা—কেউ স্কুলের কাজের জন্য দায়ী, কেউ শারীরিক ব্যায়ামচর্চা, আরেকজন দেয়াল পত্রিকার জন্য দায়ী। প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু কাজ ছিল। জয়া আর অন্য কয়েকজন সভ্যের কাজ ছিল স্তারোপেত্রোভস্কি স্ট্রীটের একটি বাড়ির নিরক্ষর মহিলাদের পড়ানো।

আমি জয়াকে বললাম—"এটা কঠিন কাজ, বাড়িটা বেশ দূরে—আর তুমি তো আর একবার ধরলে আর ছেড়ে দিতে পারবে না—সেকথা ভেবেছ কি?"

জয়া লাফিয়ে উঠল—"তুমি বলছ কি মা, ছেড়ে দেব, কাজটা একবার আরম্ভ করে..."

তার প্রথম কর্মহীন সন্ধ্যায় জয়া স্তারোপেত্রোভস্কি স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। ফিরে এসে আমাদের বলল, তার ছাত্রী একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক, লিখতে বা পড়তে মোটেই জানে না, কিন্তু লেখাপড়া শেখার আগ্রহ আছে।

জয়া বলল—"ভেবে দেখ দেখি, নিজের নামটাও ভাল করে লিখতে পারে না, ঘরকন্নার কাজ, ছেলেমেয়ের কাজ ইত্যাদিতে তার গলা পর্যন্ত ঠাসা, কিন্তু আমি জানি সে পড়াশোনা করবে। আমাকে দেখে সে ভারী খুশি হয়েছে। আমাকে বলে, 'আমার সোনা লক্ষ্মী'।"

আমার কাছ থেকে একখানা বড়োদের পড়া আর লেখা শেখাবার বই ধার করে নিয়ে জয়া অনেক রাত অবধি জেগে পড়াশোনা করল, সপ্তাহে দুদিন করে ছাত্রীর বাড়ি যেতে লাগল—তা সে ঝড়বৃষ্টি, তুষারপাত, ক্লান্তি সব কিছু উপেক্ষা করে।

শুরা বলল—"ভূমিকম্প হলেও জয়া ঠিক যাবে, আগুন লাগলেও হয়তো বলবে তার ছাত্রীকে অবহেলা করতে পারে না।" যদিও শুরার গলায় মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসার সুর থাকত, প্রায়ই জয়ার পড়ানোর পর বাড়ি ফেরার সময় ও যেত তাকে এগিয়ে আনতে। সেবারের শরৎকালটা বড়ো বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে ছিল, জলে কাদায় ভিজে, জয়াকে অন্ধকারে একলা বাড়ি আসতে হবে বলে আমরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়তাম, শুরা তো জয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসতে ভালোবাসত। ভাবখানা—জয়া দেখুক একবার—ভাই থাকার মানেটা কি,—ভাই তার রক্ষাকর্তা, কাজের সহায়, পরিবারের রীতিমতো একজন পুরুষ!

শুরার চওড়া কাঁধ, শক্তসমর্থ চেহারা, লম্বায়ও সে জয়ার চেয়ে বড়ো। প্রায়ই বলত—"দেখ তো কী রকম পেশীগুলো আমার।"

জয়াও খুশিমেশানো গর্ব নিয়ে আশ্চর্যের সুরে বলত—"সত্যি মা দেখ তো কি চমৎকার ওর পেশীগুলো যেন পেটানো লোহার তৈরি!"

একদিন কনজারভেটরীর গ্রেট হলে এক জলসায় যাব বলে তিনখানা টিকিট কিনে নিয়ে এলাম। চাইকভ্স্কির "পঞ্চম সিম্ফনি" বাজানো হবে, জয়ার এটা বিশেষ প্রিয় ছিল, বলত যতবারই সে এটা শোনে, সুরটা যেন তাকে ততই নতুন নতুন আনন্দের শিহরণ জাগায়।

একবার আমাকে বলেছিল—"সুরটা যত চেনা হবে, ততই তোমার উপর তার প্রভাব পড়বে, আমি কতবার যে এর প্রমাণ পেয়েছি!"

টিকিট নিয়ে আসায় জয়া তো প্রথমে ভারী খুশি হয়ে উঠল, তারপরই

হঠাৎ এমন মুখের চেহারা করল যেন মনে ভারী দুঃখ হয়েছে, হাতের তর্জনী-টাকে বারকয়েক কামড়াল, কোন কিছু ভুলে যাওয়া জিনিস মনে পড়লে ও প্রায়ই এরকম করত।

চেঁচিয়ে বলে উঠল—"কিন্তু মা, আমি তো যেতে পারব না। কনসার্ট যে বৃহস্পতিবার, লিদিয়া ইভানোভ্‌নাকে যে পড়াতে যাই আমি সেদিন।"

শুরা বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলে উঠল—"একবার মাত্র না গেলে কি এমন কান্নাকাটি পড়ে যাবে শুনি!"

"না, তা হয় না, আমার জন্য সে অপেক্ষা করে থাকবে এ আমি ভাবতেই পারি না।"

"আমি গিয়ে বলে আসব যে তুমি যাবে না সেদিন।"

"একবার একটা কাজ আরম্ভ করলে তা শেষ করতে হয়, আমি পড়াতে যাব বলে ও অপেক্ষা করে থাকবে আর আমি কিনা কনসার্ট শুনতে যাব। না তা হবে না।"

জয়া সত্যিই চাইকভস্কি কনসার্টে গেল না।

দিদির উপরে সহজাত শ্রদ্ধার সংগে নিজের রাগ মিশিয়ে বারেবারেই শুরা বলতে লাগল—"তুমি একটা আশ্চর্য লোক বটে!"

নববর্ষ

নববর্ষের সন্ধ্যা, ১৯৩৯ সাল।

স্কুল থেকে ফিরে জয়া আমাকে বলল, ওদের ক্লাশের মেয়েরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে নববর্ষের শুভকামনা জানিয়ে একটা কাগজ লিখছে। কাগজটা পুড়িয়ে ক্রেমলিনের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারটা বাজার সংগে সংগেই ছাই-গুলো খেয়ে ফেলতে হবে।

শুরা তো বিদ্রূপ করে উঠলো, "মেয়েগুলোও যেমন!"

জয়া হেসে বলল—"মনে হচ্ছে ওগুলোর খুব মিষ্টি স্বাদ হবে না–তাই আমি ওগুলো খাব না–কিন্তু পড়তে আমার আপত্তি নেই।"

পকেট থেকে সযত্নে ভাঁজ করা খামে আঁটা এক টুকরো কাগজ বার করে জয়া জোরে জোরে পড়তে লাগল—"জয়া মানুষকে অত কঠোর ভাবে বিচার করতে নেই। সব ব্যাপারকেই খুব তলিয়ে দেখো না, জেনে রেখো—অল্পবিস্তর প্রায় সব মানুষই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, খোসামুদে, ও কপট, তাদের উপর নির্ভর করতে পার না, তাদের কথায় কান দিও না, নববর্ষের এই রইল তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছা।"

পড়তে পড়তে জয়ার ভুরু কুঁচকে এল, শেষ হবার সংগে সংগে দলা পাকিয়ে রাগের সংগে ফেলে দিল কাগজখানা। বলল—"মানুষের সম্বন্ধে যদি এরকম ধারণাই করতে হয় তাহলে বাঁচতে চাও কেন?"

নববর্ষের রকমারি খেয়ালমতো পোশাক পরে নাচের উৎসবের জন্য তৈরি হওয়ায় জয়া শীগগিরই ডুবে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাষ্ট্রের

জাতীয় পোশাকে ওরা নাচবে ঠিক হয়েছে। জয়াকে কি সাজে সাজাব, আমরা অনেক সময় ধরে ভাবতে লাগলাম।

শুরা জানালো—"উক্রেনিয়ানদের মতো জয়ার চোখ আর ভুরুগুলো দেখতে, তাহলে কালোভুরুওয়ালা উক্রেনীয় মেয়ে সাজুক না কেন! কাজ-করা ব্লাউজ আর স্কার্ট তো ওর আছেই, পুঁতির মালা আর ফিতে হলেই বাস্।"

পরে সন্ধ্যাবেলা যখন খালি শুরা আর আমি ছিলাম—তখন শুরা আমাকে বলল—"শোন মা, জয়াকে নতুন জুতো কিনে দেওয়া দরকার, ক্লাশের সব মেয়েরই বিশেষ ধরনের হীলওয়ালা জুতো আছে—হিল বেশি উঁচু নয়, কিন্তু..."

"মাঝারি রকমের..." বলে দিলাম।

"ঠিক তাই, আর জয়া ছেলেদের মতো জুতোই পরে।"

"এ মাসে তো আমরা কিনতে পারব না শুরা।"

"কিন্তু আমার তো নতুন সার্ট দরকার নেই, আর আমার টুপিটার সত্যিই প্রয়োজন নেই।"

"তোমার টুপিটার দিকে যে আর তাকানো যায় না।"

"কিন্তু মা, আমি হলাম ছেলে, আর জয়া মেয়ে, তার উপর বড়ো হয়েছে—ওর তো ওসব দরকার-ই।"

সত্যিই ওসব দরকার বেশিই ওর পক্ষে—

মনে পড়ে একবার বাড়ি ফিরে জয়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার একটা জামা গায়ে দিচ্ছে দেখতে পাই, আমার পায়ের শব্দ শুনে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল—"কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?"

আমার জামাকাপড় পরতে ও খুব ভালোবাসত, নতুন কোন কিছু কেনায় ওর ভারী আনন্দ হতো। কখনও ও আমাকে বলে নি ওকে কিছু কিনে দিতে, আমি যা দিতাম তাতেই ও খুশি থাকত। তাহলেও শুরা ঠিক কথাই বলেছে —নিজের উপরে খানিকটা নজর পড়বে এটা তো খুব স্বাভাবিক।

আমরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে টাকাটা জোগাড় করলাম—আর অনেক তর্কবিতর্কের পর জয়া গিয়ে নিজের জন্য মাঝারি হীলওয়ালা একজোড়া জুতো নিয়ে এল।

ফিতে আর পুঁতি মিলিয়ে নববর্ষের পোশাক তৈরি করলাম। শুরার সার্টটা কেচে ইস্ত্রী করে একটা নতুন টাই দিয়ে ওর গলা বেঁধে দিলাম। বেশ কেতাদুরস্ত হয়ে আমার ছেলেমেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে স্কুলে চলে গেল, অনেক-ক্ষণ ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে আমি ওদের যেতে দেখলাম।

সন্ধ্যাটা ভারী আশ্চর্য শান্ত আর কর্মহীন লাগছিল। বাইরে হালকা ফোলা ফোলা তুষার ঝরে পড়ছে। জয়া আর শুরা এই তুষার স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে যাবে, রঙীন, আলোঝলমল আনন্দ-উচ্ছল তরুণ জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আমি কামনা করলাম, সারা বছরটাই যেন এমনি উজ্জ্বল, আনন্দমুখর হয়ে ওঠে ওদের জীবনে।

ভোর হব-হব সময়ে ওরা ফিরে এল। বেশ ভালো পার্টি হয়েছিল। শুরার কথায় বলতে গেলে "গান আর নাচ, নাচতে নাচতে পা ভেঙে না পড়া পর্যন্ত নাচো।"

"আমরা পোস্ট অফিস খেলা খেলছিলাম, একটা ছেলে তো জয়ার চোখ বেশ সুন্দর বলে চিঠি লিখতে আরম্ভ করে দিল, সত্যিই তাই, আর শেষ পর্যন্ত তার কবিতা উথলে উঠল, এই যে শোন না—"

শুরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ঢং করল, হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে পড়তে লাগল—

"স্বচ্ছ নয়না বালিকা তোমাতে
হৃদয় আমার মরিতে চায়,
মহান গভীর অন্তর তোমার
আঁখিমাঝে তব প্রকাশ পায়।"

আমরা তিনজনেই সশব্দে হেসে উঠলাম।

শীতের শেষে একটা ঘটনা ঘটল। যে মেয়েটি নববর্ষের শুভকামনায় জয়াকে জানিয়েছিল মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, মানুষের উপর নির্ভর করা যায় না, সেই মেয়েটাই তার গৃহিনীছাত্রীকে পড়ানো বন্ধ করে দিল।

তার দলের সংগঠন জয়াকে সে জানাল—"অনেক দূরের রাস্তা, বাড়ির পড়া এত থাকে যে পড়াতে যাবার সময়ই করে উঠতে পারি না, আমার উপর থেকে এ দায়িত্ব তুলে নাও।"

আমাকে এই কথা বলতে বলতে জয়ার চোখদুটো রাগে কালো হয়ে উঠল। "এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, কাজের ভার নিয়ে শেষে ছেড়ে দিল, তার মাথায়ও এল না যে এরকম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সে শুধু নিজেরই নয় অন্য সকলেরই মাথা হেঁট করছে। এই কি 'কমসোমল বালিকার' পরিচয় ? মনে কর রাস্তায় সেই মহিলার সঙ্গে তার দেখা হলো, সে কি করে তার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবে, ক্লাশের অন্য মেয়েদেরই বা কি করে মুখ দেখাবে ?"

জয়া নিজে একবারও তার পড়ানো বন্ধ করেনি। এক বৃহস্পতিবারে জয়ার খুব মাথা ধরেছিল, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠে রোজকার মতোই পড়াতে গেল।

জয়ার ছাত্রীর যে কোনরকম উন্নতির খবরই আমি আর শুরা পেয়ে যেতাম তৎক্ষণাৎ।

"লিদিয়া ইভানোভ্না সব অক্ষর চিনে ফেলেছে..."

"লিদিয়া ইভানোভ্না গড়গড় করে পড়তে শিখছে..."

অবশেষে জয়া বিজয়ীর ভঙ্গিতে এসে আমাদের জানালো, "মনে আছে, সে তার নিজের নাম সই করতে পারত না ? আর এখন হাতের লেখা বেশ সুন্দর হয়েছে।" সে রাত্রে ঘুমাতে যাবার সময় জয়া বলল—"জান মা সারা সপ্তাহ ধরে ভেবেছি, আমার কি যেন একটা শুভ ঘটনা ঘটেছে, হঠাৎ মনে পড়ল লিদিয়া ইভানোভনা পড়তে শিখেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, তুমি কেন শিক্ষিকা হয়েছ।"

দুঃখের দিন

১৯৪০ সালের শরৎকালটা নিতান্ত আকস্মিকভাবেই বেদনাদায়ক হয়ে উঠল আমাদের কাছে।

জয়া ঘর মুছে দিচ্ছিল। বালতির মধ্যে ন্যাকড়া ডুবিয়ে, নীচু হতে গিয়েছে যেই, হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ল, কাজ থেকে ফিরে এসে আমি ওকে এই অবস্থায়

মৃতের মতো বিবর্ণ দেখতে পেলাম ; শুরাও ঠিক এই সময়েই ঘরে ঢুকেছিল, দৌড়ে অ্যাম্বুলেন্স আনতে গেল, অ্যাম্বুলেন্স এসে জয়াকে বোৎকিন হাসপাতালে নিয়ে গেল। রোগ নির্ণয় হলো—"মেনিনজাইটিস।"

শুরা আর আমার জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। সারাদিনরাত আমরা শুধু একটা কথাই ভাবতাম, জয়া বাঁচবে কি? জীবন তার সংকটাপন্ন, আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ডাক্তার যিনি ওর দায়িত্ব নিয়েছেন সবসময় কিরকম গম্ভীর হয়ে থাকতেন মনে হতো কোন আশাই নেই।

শুরা অনেকবার হাসপাতালে যেত প্রতিদিন। ভাবনাহীন সরল মুখখানা ওর দিনে দিনে চিন্তাকুল অন্ধকারময় হয়ে উঠছিল।

জয়ার রোগটা বেঁকে দাঁড়াল, মেরুদণ্ডে ইনজেকশন দিতে হলো। এখানে—অপারেশন। বড়ো বেদনাদায়ক।

একবার এরকম ইনজেকশনের পরে শুরা আর আমি জয়া কিরকম আছে দেখতে গেলাম। নার্স আমাদের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল—"এক্ষুনি ডাক্তার এসে তোমাকে সব বলবেন।"

ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল।

"কি হয়েছে ওর?" আমার গলার স্বরটা নিশ্চয়ই ভয়ার্ত শোনাচ্ছিল—কারণ সেই মুহূর্তেই প্রফেসর তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন—"ভয় পাবেন না খবর সব ভালো, আপনার মেয়ে সেরে উঠবার দিকে এগিয়ে চলেছে। বেশ তাড়াতাড়ি সব ঠিক হয়ে আসছে। আপনার মেয়ে কিন্তু খুব সাহসী আর কষ্টসহিষ্ণু—আশ্চর্য তার সহ্য করার ক্ষমতা, একটু কাঁদেও না কাৎরায়ও না," শুরার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন—"তুমিও কি এরকম ভালো?"

সেদিনই জয়ার সঙ্গে আমাকে প্রথম দেখা করতে দিল, একেবারে চুপচাপ শুয়ে ছিল, তার মাথা তোলার পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল না, ওর পাশে বসে হাতটা ধরলাম। চোখ থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, সে দিকে আমার কোন খেয়ালই ছিল না।

জয়া চেষ্টা করে শান্তভাবে বলল—"কেঁদোনা, আমি অনেক ভালো আছি।" ওর অবস্থা এখন ভালোর দিকেই যাচ্ছিল, শুরা আর আমি শান্তি পেলাম। মনে হলো এতদিন ধরে যে দুর্ভাবনা আমাদের পেয়ে বসেছিল, তার থেকে হঠাৎ মুক্তি আমাদের চরম অবসন্নতা এনে দিল। জয়ার অসুখের সময় আমরা যত ক্লান্ত হয়েছিলাম, তত আমরা আগে কখনও হই নি। অনেক দিন ধরে অসহ্য বোঝা আমাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপেছিল, তা থেকে হঠাৎ মুক্তি পেলাম বটে, তবে আমাদের পিঠ সোজা করে নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতাটা সেই মুহূর্তেই ফিরে এল না।

কয়েক দিন পরেই জয়া বলল—"আমাকে কিছু বই এনে দাও না।"

আরও কতকদিন পরে ডাক্তার ওকে বই পড়তে দিলেন, জয়াও খুশি হলো। কথা বলতে তখনও ওর খুব কষ্ট হতো, খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তবুও সে পড়ত।

গাইদার-এর "দি ব্লু কাপ" আর "দি ফেট্ অব দি ড্রামা" এনে দিলাম।

"দি ব্লু কাপ" পড়ে বলল—"কি চমৎকার গল্পটা, কোন উত্তেজক ঘটনা ঘটছে না তবুও পড়া ছেড়ে উঠতে পারা যায় না।"

জয়া সারছিল খুব ধীরে ধীরে, প্রথমে তাকে বসতে দিল, আরও কতদিন পরে হাঁটার অনুমতি পেল।

ওয়ার্ডে সকলের সঙ্গেই জয়া ভাব করে নিয়েছিল, জয়ার পাশের বিছানার বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা একবার আমাকে বলেছিলেন, "তোমার মেয়েকে বিদায় দিতে আমাদের কষ্ট হবে, এত সুন্দর মেয়েটি, খুব খারাপ রোগীকেও ও চাঙ্গা করে দিতে পারে।"

আর জয়ার ডাক্তার তো প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন—"জয়াকে পুষ্যি নিতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।"

নার্সরাও জয়ার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল, তাকে বই এনে দিত পড়তে। প্রফেসর যখন জয়াকে একটু সবল হলে পর খবরের কাগজ পড়তে এনে দিতেন, ওয়ার্ডের রোগীদের জোরে জোরে পড়ে শোনাত।

খুব শীগগিরই শুরার সঙ্গে জয়াকে দেখা করতে দেওয়া হলো। ওদের দুজনের অনেকদিন দেখা হয় নি, ভাইকে দেখামাত্রই জয়া বিছানার উপর উঠে বসল, উত্তেজনায় তার মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। আর শুরা সব সময়ে যেমন এখনও তেমনি ওয়ার্ডের অপরিচিতদের সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ; জয়ার চারদিকে প্রতিবেশীদের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল, মুখচোখ লাল হয়ে কপালে ঘাম জমে উঠল, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিল একবার আর শেষে কোন্‌দিকে পালাবে বুঝতে না পেরে ওয়ার্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জয়া বলতে লাগল—"আর শুরা, এখানে বসে চট্‌পট বল দেখি স্কুলের সব খবরাখবর। ওরকম বোকার মতো তাকাস্‌না তো!" তারপর চুপিচুপি বলল—"তোকে কেউ দেখছে না রে!"

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জয়ার বারবার "স্কুলের কথা বল শীগগির"-এর উত্তরে শুরা বুকপকেট থেকে একটা ছোট বই বার করে দেখাল, তার উপরে লেনিনের মূর্তির ছাপ, ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জয়া যেরকম পেয়েছিল এও ঠিক সেই জিনিস।

জয়া চেঁচিয়ে উঠল—"কমসোমল কার্ড!"

"তোমাকে আগে বলি নি, চমকে দেব বলে, জানতাম তুমি খুশিই হবে।" শুরা বলল।

এবার চারদিকের অস্বাভাবিক পরিবেশের কথা ভুলে শুরা সাধারণ সভার খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়ায় মেতে গেল, তাকে কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, জেলা কমিটিতে কি বলল, সেক্রেটারী কিভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি জয়া কসমোদেমিয়ানস্কায়ার ভাই? ওকে আমার মনে আছে, তাকে আমার প্রীতি জানিও।"

আবার বাড়িতে

জয়ার অসুখের সময় শুরা অনেক ড্রয়িংএর কাজ করত। শেষ রাত পর্যন্ত ড্রয়িং তো করতই, কখনো কখনো স্কুলের আগে ভোরবেলাও আঁকত। ড্রয়িং-গুলো দিয়ে টাকা নিয়ে আসত, কিন্তু আগের মতো এবারে টাকা আর আমাকে দিত না।

টাকাগুলো দিয়ে ও কি করতে চায় তা সময়মতো বলবে জানতাম, তাই আমি আর এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতাম না। আমার অনুমানে ভুল হয় নি, জয়াকে হাসপাতাল থেকে আনতে যাবার আগের দিন শুরা আমাকে বলল— "এই যে মা, জয়ার একটা নতুন পোশাক কেনার টাকা। ভেবেছিলাম আমিই কাপড়টা কিনে আনব, থাকগে, ওকেই কিনতে দাও, ওর পছন্দমতো ও কিনে নিক।"

রোগা, দুর্বল দেহে জয়া ওয়ার্ড থেকে এসে আমাদের সঙ্গে মিলল, চোখ-গুলো ওর জ্বলজ্বল করছে. আমাকে আর শুরাকে জড়িয়ে ধরল, শুরা চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল কেউ দেখছে কিনা।

জয়া তাড়াতাড়ি বলল—"এস তাড়াতাড়ি, আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে—" ওর যেন ভয় ওরা আবার তাকে নিয়ে ওয়ার্ডে পুরবে।

আমরা খুব আস্তে চলতে লাগলাম. একটু পরে পরে দাঁড়াতে লাগলাম, পাছে জয়া ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জয়া কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যেতে চাইছিল, প্রত্যেকটা জিনিসের দিকেও এমন ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল যেন অনেকদিন ধরে ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। উজ্জ্বল শীতের সূর্যের দিকে তাকিয়ে জয়া একটু হাসল। বেশ বুঝতে পারছি জয়ার পায়ের নীচে বরফ মড়মড়িয়ে গুঁড়ো হওয়ার শব্দে ও খুব খুশি হয়ে উঠছে, পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা বরফে ঢাকা গাছগুলো. হাওয়াতে নাচা ছোট্ট ছোট্ট তুষারবিন্দু. সবই ওকে আনন্দ দিচ্ছে—ফিকে গোলাপী আভা ফুটে উঠল তার গালে।

বাড়ি এসে ধীরে ধীরে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াল. প্রত্যেকটা জিনিসকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল. বালিশটা সমান করল, টেবিলঢাকনাটা একটু পালিশ করে দিল, আলমারীর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিল. একটা দুটো বইয়ের পাতা-গুলো একটু খুলে দেখলো. সবার সঙ্গে যেন নতুন করে ওর পরিচয় হচ্ছে। শুরা এবার কাছে এসে দাঁড়াল, ভাবখানা ওর বেশ গম্ভীর অথচ লাজুক।

টাকাটা বার করে শুরা সামনে ধরে বলল—"এই যে তোমার একটা নতুন পোশাক কেনার টাকা।"

জয়াও গম্ভীরভাবে জবাব দিল—"অনেক ধন্যবাদ।" বরাবরের মতো এবার আর সে তর্কবিতর্ক শুরু করে দিল না। ওর জন্য নতুন কিছু কেনার কথা উঠলেই ও নানারকম তর্ক আরম্ভ করে দিত, কিন্তু এবার মনে হলো জয়া বেশ খুশি হয়েছে, অভিভূতও হয়েছে খানিকটা।

শুরা আদেশ করল—"এবার শুয়ে পড়, তুমি ক্লান্ত হয়েছ।" জয়াও লক্ষ্মী মেয়ের মতো কৃতজ্ঞ হয়ে শুয়ে পড়ল।

জয়াকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্হা করেছিলাম. ও আর স্কুলে গেল না, আমি সাবধানে বললাম—"এখনও জোর দিয়ে পড়ার সময় হয় নি তোমার।"

জয়া অবাধ্য মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—"না কোন মতেই নয়। কিন্তু স্যানাটোরিয়াম থেকে ফেরার পর আমি বাঘের মতো গোগ্রাসে পড়তে শুরু করব। (জয়া একটু হাসল, এই 'বাঘের মতো গোগ্রাসে' কথাটা শুরার একটা বুলি) গরমের ছুটিতেও কিন্তু আমি খুব পড়ব—ক্লাশের সংগে সমান হতে হবে তো। না হলে শুরা আমার চেয়ে ছোট হয়ে আমার আগে স্কুল শেষ করে বেরিয়ে যাবে, কি চমৎকারই না হবে! আমি কিছুতেই সে হতে দিতে পারি না।"

প্রাণের আশঙ্কা থেকে সদ্য মুক্ত হয়ে জয়া বেঁচে থাকার আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে গান করত—আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে, ঘর মুছতে মুছতে, সেলাই করতে করতে...

প্রায়ই বিটোফেনের 'ক্ল্যারখেনের গান' গাইত, এটা তার বড়ো প্রিয়।

দামামা বাজছে দামামা বাঁশীতে তান ধরেছে—
প্রিয় আমার চলেছে রণাংগনে
তার নির্দেশে আগুয়ান সেনাদল
আমারও হৃদয় আগ্রহে চঞ্চল
শিরস্ত্রাণ আর বর্ম আমি যদি পেতাম,
আমার জন্মভূমিকে রক্ষায় আমিও যেতাম
যেখানেই ওরা যাক, ওদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হতাম
দেখ, শত্রুবাহিনীর ব্যূহ ভেঙে পড়ছে
সাহসী সেনা হওয়া কি গৌরবের কথা!

বাঁচার আনন্দে জয়ার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠত, ওর গলায়, এমন কি "মাউন্টেন হাইট"-এর বিষাদময় সুরগুলো পর্যন্ত যেন আনন্দে আর আশায় ভরপুর হয়ে উঠত।

ধূলিবিহীন পথ
একটি পাতাও নড়ছে না উপত্যকায়
দাঁড়াও ক্ষণেক, কর প্রার্থনা,
বিশ্রাম নাও ক্ষণিকের তরে।

শুরা জয়াকে জানালার কাছে বসিয়ে এইসময় তার ছবি আঁকত। একবার চিন্তিতভাবে বলেছিল—"জান আমি একবার পড়েছিলাম, ছোটবেলা থেকে সুরিকভ মানুষের মুখের রেখা ভালোভাবে নজর করতেন, কি করে কোন জায়গায় চোখগুলো বসানো আছে, তাদের আকৃতির বৈশিষ্ট্য কোথায়, কিভাবে গড়ে উঠেছে? এভাবে তিনি আবিষ্কার করেন যেখানে সব আকৃতি বা গঠন-গুলি তার নিজের নিজের জায়গায় মানানসই হয়েছে সেখানেই প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এজন্যই খাঁদানাক আর উঁচু চোয়াল নিয়েও মুখের চেহারা যেখানেই মানানসই হয়েছে সেখানেই সে মুখ সুন্দর হয়ে উঠেছে।"

জয়া হেসে উঠল—"আমার বুঝি খাঁদা নাক? তুমি কি তারই সন্ধান করছ?"

শুরা তার স্বভাববিরুদ্ধ কোমল তামাসার সুরে লজ্জিত হয়ে বলল—"না, আমি বলতে চাইছি তোমার চেহারার সামঞ্জস্যের কথা, তোমার কপাল, চোখ মুখ প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটার সংগে কেমন মিলে গিয়েছে...

শীগ্‌গিরই জয়া স্যানাটোরিয়ামে চলে গেল। এই স্বাস্থ্যনিবাসটা হলো সোকোলনিকিতে—মস্কো থেকে বেশি দূরে নয়। প্রথম যেদিন ছুটি পেলাম ওকে দেখতে গেলাম।

দৌড়ে আমার দিকে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করবার আগেই শুরু করল—"মা, জান এখানে কে বিশ্রাম নিতে এসেছে?"

"কে রে?"

"গাইদার, লেখক গাইদার, এই যে আসছে।" হাসিখুশি ভরা লম্বা, চওড়া কাঁধওয়ালা, ছেলেমানুষের মতো মুখ, এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছিল পার্কের ভিতর থেকে।

জয়া ডাকল—"আর্কাদি পেত্রোভিচ, এদিকে এসে আমার মার সঙ্গে আলাপ করুন।"

ওর বড়ো বড়ো শক্ত হাত ধরে নাড়া দিয়ে আমি ওর কৌতুকোচ্ছল হাস্যময় চোখদুটোর দিকে তাকালাম, আর সেই মুহূর্তেই মনে হলো 'দি ব্লু কাপ', 'তাইমুর এণ্ড হিজ স্কোয়াড'-এর লেখকের আমি ঠিক এই চেহারাই কল্পনা করেছিলাম।

বললাম—"অনেকদিন আগে আমি ও আমার ছেলেমেয়ে আপনার প্রথম বই পড়ি, তখন জয়া বারেবারেই জিজ্ঞেস করত—আপনি কেমন লোক, কোথায় থাকেন, ও আপনাকে দেখতে পাবে কিনা এইসব।"

"খুব একটা কিছু দেখবার নেই, তাই না? থাকি আমি মস্কোতে, সোকোলনিকিতে আসি বিশ্রাম নিতে, সারাদিন ধরেই ও আমাকে দেখতে পারে ইচ্ছা করলে।" হাসতে হাসতে জানালেন গাইদার।

এমন সময় কেউ এসে ডাকাতে তিনি আমাদের দিকে একটু হেসে তাদের সঙ্গে চলে গেলেন।

বরফে ঢাকা রাস্তার উপর দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে যেতে জয়া বলল—"জান কি করে আমাদের পরিচয় হলো? একদিন পার্কের ভিতর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একজন মস্ত বড়ো লোক বরফ দিয়ে একটা মানুষ তৈরি করছে, আমার মনে হলো, এই ভদ্রলোক সত্যিকার অনুভূতি নিয়ে আন্তরিক ভাবে ছোট ছেলের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে এটা করছেন। পিছনে দুই এক পা হঠে গিয়ে চেয়ে দেখে তারিফ করছেন নিজের কাজের...আমি সাহস করে সোজা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম—'আমি আপনাকে চিনি, আপনি গাইদার, লেখক, আপনার সব বইগুলোর সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে।' আর তিনি জবাব দিলেন—'আমিও তোমাকে চিনি, আর তোমার সব বইগুলোও কিসেলেভ-এর এলজেব্রা, সকোলোভ-এর ফিজিক্স, রিবকিন-এর ট্রিগনোমেট্রি!"

আমি হেসে ফেললাম—কিসেলেভ, সকোলোভ, রিবকিন এ'রা সব জয়ার স্কুলের বইএর লেখক। তারপর জয়া বলল—"এস আর একটু হাঁটি, তিনি কি তৈরি করেছেন তোমাকে দেখাই এসো। গোটা দুর্গ একটা।"

আর সত্যিই এটা একটা দুর্গের মতো। পার্কের মাঝখানে বরফে তৈরি সাতটা মানুষ। দাঁড়িয়ে আছে একই লাইনে, প্রথমটি সত্যিই দৈত্যের মতো বড়ো

তারপর ক্রমশ ছোট হতে হতে একেবারে ছোটটি একটি চৌকো উঁচু মঞ্চের পিছনে বসে আছে, তার সামনে পড়ে আছে ঝাউ-এর ডাল, আর পাখির পালক।

জয়া হাসতে হাসতে বুঝিয়ে দিল—"এটা শত্রুর দুর্গ। আর্কাদি পেত্রোভিচ্ বরফকীলক দিয়ে বোমা ফেলেন ওদের ওপর। আমরা সবাই তাঁকে সাহায্য করি. জান সব এত মজার খেলা কিছুতেই ছেড়ে থাকা যায় না।" হঠাৎ জয়া তার বক্তব্য শেষ করে ফেলল—"আমি প্রায়ই ভাবতাম যে-লোক এমন চমৎকার গল্প লিখতে পারে, সে নিজেও নিশ্চয়ই খুব চমৎকার হবে। আর এখন দেখছি সত্যিই তাই।"

আর্কাদি গাইদার আর জয়া দুজনের বন্ধুত্ব হলো। দুজনে একসঙ্গে স্কেটিং. স্কিইং করতে যেত, সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে গান গাইত, নিজেদের পড়া বইয়ের সমালোচনা করত. জয়া তার মনের মতো কবিতা আবৃত্তি করত। আবার যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো তিনি বললেন তোমার মেয়ে গ্যেটের কবিতা ভারী সুন্দর পড়ে।

জয়া কতকটা আশ্চর্যভাবেই বলল—"জান গ্যেটে পড়ার সময় তিনি আমাকে বলতেন. 'মর্ত্যে নেমে এস. মর্ত্যভূমিতে অবতরণ কর' : আচ্ছা এতে তিনি কি বোঝাতে চাইতেন?"

স্যানাটোরিয়াম ছাড়বার অল্প কিছুদিন আগে জয়া আমাকে বলেছিল, "জান মা. কাল আমি বলেছিলাম, 'আর্কাদি পেত্রোভিচ্ সুখ কাকে বলে? আপনার "চুক আর গেক" বইয়ে যেমন লিখেছেন. যার যার অভিরুচি মতো সুখের মানে করে নেয়. তা বলেই যেন আমাকে বিদায় করবেন না। প্রত্যেকের জন্যই মহত্তর কোন সুখ আছে পৃথিবীতে. তাই না?' তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন. বললেন—'নিশ্চয়ই আছে। সেরকম সুখ তা হলে এমন কিছু একটা জিনিস যার জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে. যার জন্য প্রাণ দেয়। কিন্তু সারা পৃথিবীতে সেটা প্রতিষ্ঠিত হতে এখনও কিছু দেরি হতে পারে।' তখন আমি বললাম, 'যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তো।' তিনি বললেন. 'নিশ্চয়ই হবে'।"

কিছু দিন পর আমি জয়াকে বাড়ি নিতে এলাম. গাইদার আমাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। হাতে হাত মিলিয়ে তিনি আমাদের বিদায় দিয়ে জয়াকে একটি বই দিলেন।

"এটা আমার লেখা—স্মারক হিসাবে দিলাম।" মলাটের উপরে দুটো ছেলে ঝগড়া করছে. একজন নীল পোশাকপরা রোগা, আর একজন মোটাসোটা ধূসর রঙের পোশাক পরা। ওরা হলো চুক আর গেক! খুশিতে ডগমগ হয়ে জয়া তাকে ধন্যবাদ দিল, আমরা গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম, গাইদার দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন। শেষ বারের মতো পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, ধীরে ধীরে তিনি বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছেন।

হঠাৎ জয়া থেমে গেল—"মা তিনি বোধহয় আমাকে কিছু লিখে দিয়েছেন।"

খুলবে কি খুলবে না খানিক ইতস্তত করে জয়া শেষে খুলল বইটা। মলাটের দ্বিতীয় পাতায় বড়ো বড়ো পরিষ্কার করে আমাদের অতিপরিচিত শব্দ কয়টি লেখা—

"সুখ কাকে বলে?—প্রত্যেকে যার যার রুচি অনুযায়ী সুখের মানে করে নিল। কিন্তু প্রত্যেকেই জানত যে তারা সসম্মানে বাস করবে, কঠোর পরিশ্রম

করবে, প্রিয় মাতৃভূমি সোভিয়েত দেশকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে—তাহলেই সুখের সন্ধান পাবে।"

জয়া ধীরে ধীরে বলল—"আমার প্রশ্নের জবাব।" স্বাস্থ্যনিবাস থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর স্কুলে যেতে আরম্ভ করল, আরও একবৎসর বিশ্রাম করার কথা সে মোটেই শুনল না।

ক্লাসের বন্ধু

জয়া বলল—"ওরা আমাকে স্কুলে যেতে দেখে ভারী খুশি হয়েছে। ওরা এমন দরদী,—আমাকে যেভাবে দেখতে লাগল তাতে মনে হলো আমি যেন কাঁচের তৈরি, হাত দিলেই ভেঙে যাব, তবুও এত সাবধানী হতে দেখলে ভালোই লাগে।"

একদিন জয়া কাতিয়া আন্দ্রিয়েভনা নামে ওদের একটি ক্লাশের পড়ুয়াকে নিয়ে এল আমাদের বাড়ি। মুখটা তার গোলগাল, গালদুটো গোলাপী, সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য।

হেসে আমার হাতে নাড়া দিয়ে সে বলল—"এই যে কেমন আছেন?"

জয়া বলল—"কাতিয়া আমাকে অংক শিখিয়ে দেবে।"

"শুরা কি পারত না? কেন কাতিয়াকে কষ্ট দেবে শুধু শুধু।"

কাতিয়া গম্ভীর ভাবে বলল—"দেখুন লিউবোভ তিমোফিয়েভ্না, শুরার শেখাবার ক্ষমতা নেই, জয়ার অনুপস্থিতিতে আমরা এত বেশি পড়ে ফেলেছি, সেগুলো পরপর শুরাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আস্তে আস্তে। কিন্তু শুরার পড়ানো আমি শুনেছি......এক দুই তিন এইরকম হলো ব্যাপারটা। এভাবে তো চলবে না।"

"তা, শুরা যখন পড়াতে পারেই না......।"

"হেসোনা মা, শুরা সত্যিই ভালো করে বোঝাতে পারে না।" জয়া বলল, "কিন্তু দেখো কাতিয়া কি সুন্দর পারে......।"

শীগগিরই বুঝতে পারলাম কাতিয়া সত্যিই বোঝানোতে খুব পটু। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিশ্চিত বুঝতে পারছে যে ব্যাপারটা জয়ার মাথায় ঢুকেছে, ততক্ষণ সে বুঝিয়ে দিত, তাড়াহুড়ো করত না। একবার শুনতে পেলাম জয়া বলছে, "আমার জন্য এত সময় কেন যে নষ্ট করছ......"

কাতিয়া রেগে জবাব দিল—"কি বলছ তুমি! তোমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমারও এত ভালো শেখা হয়ে যায় যে আমাকে আবার বাড়ি গিয়ে করতে হয় না। ব্যাপারটা একই তো দাঁড়াচ্ছে।"

জয়া খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ত, এটা কাতিয়ার চোখ এড়ায় নি। ও বইগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বলতো, "আমার বড়ো একঘেয়ে লাগছে, চল খানিকক্ষণ অন্য কিছু গল্প করি।"

কখনও বা ওরা বাইরে বেরিয়ে যেত, একটু হেঁটে আবার এসে পড়াশোনা করতে বসত।

শুরা একদিন ঠাট্টা করে বলল—"তুমি কি শিক্ষিকা হবে বলে ঠিক করেছ?"

কাতিয়া গম্ভীর ভাবে বলল—"ঠিক তাই"।

কেবলমাত্র কাতিয়াই যে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসত তা নয়, ইরা আসত, ছেলেরাও আসত, বিনয়ী লাজুক ভানিয়া নোসেনকভ্ পেতিয়া সিমোনোভ্, ফুটবল খেলা আর তর্কাতর্কির বিষয় পেলে তার কিছুই আর লাগত না ; খুশি আর উৎসাহে ভরপুর। ওলেগ্ বালাসোভ্ ভারী সুন্দর দেখতে, বিশেষ করে ওর কপালটা ছিল বেশ চওড়া। মাঝে মাঝে আসত য়ুরা ব্রাউদো। ও ছিল ওদের পাশাপাশি ক্লাশের ছাত্র, লম্বা রোগা ছেলেটি, মুখে তার একটু যেন বিদ্রূপের ভাব। আর আমাদের ঘরটা তখন শব্দে আর হাসিতে ভরে যেত, মেয়েরা পড়ার বই গুছিয়ে রাখত আর একসঙ্গে সবকিছু বিষয় আলাপ চলতো।

"জান তোমরা, কেবলমাত্র তারাসোভাই যে 'অ্যানা কারেনিনা'র ভূমিকায় অভিনয় করে তা নয়, ইলানস্কায়া বলে আরও একজন অভিনেত্রী আছে," বলে হয়ত ইরা শুরু করল আর লেগে গেল তুমুল তর্কবিতর্ক, কোন্ অভিনেত্রীর ভাব বেশি, কার তলস্তয়ের মর্মকথা বুঝবার ক্ষমতা বেশি, এই সব।

একবার ওলেগ—তার স্বপ্ন ছিল সে বিমানচালক হবে, সিনেমা থেকে সোজা আমাদের এখানে এসে উপস্থিত, সেখানে চ্কালভের সম্বন্ধে একটা ছবি দেখে সে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

বারবারই বলতে লাগল—"একটা মানুষ বটে! শুধুমাত্র অসাধারণ বিমান-চালক নয়, সত্যিকারের আশ্চর্য মানুষ! কি সুন্দর তার রসিকতা-জ্ঞান। শোন, ১৯৩৭ সালে যখন সুমেরু অতিক্রম করে আমেরিকা গিয়ে পৌঁছান, সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা চ্কালভ, আপনি কি ধনী?" "হ্যাঁ, ভয়ানক বড়োলোক, আমার আছে একশত সত্তর লক্ষ।" মার্কিনীরা তো একেবারে হাঁ, "একশো সত্তর লক্ষ? কি—রুবল, না ডলার?" চ্কালভ নিতান্ত ঠাণ্ডা মেজাজে বললেন—"যেমনি করে আমি আমার দেশবাসীর জন্য কাজ করে যাচ্ছি ঠিক তেমনি করে একশো সত্তর লক্ষ দেশবাসী আছে আমার সহায়তা করতে।"

ছেলেমেয়েরা হেসে উঠল।

আরেকবার ভানিয়া "দি জেনারেল" নামে একটা কবিতা পড়েছিল—স্পেনের যুদ্ধে নিহত মাতে জালকার স্মৃতিতে এই কবিতাটি লেখা—সে সন্ধ্যাটা আমার বেশ মনে আছে, ভানিয়ার মুখ ভাবগম্ভীর, সে বসেছিল টেবিলের কাছে, অন্য সবাই কেউবা ছিল বিছানায় বসে, কেউবা জানালার ধারে—

> পাহাড়ে আজ দুরন্ত শীত,
> বহুদিনের প্রহরায় পরিশ্রান্ত
> শীতার্ত, ক্লান্ত হাত দুখানি
> শিবির বহ্নিশিখায় গরম করে নিচ্ছিল
>
> ধীরে ধীরে টগবগ করছে কফির পাত্র
> ক্লান্ত সেনানীরা অচেতন নিদ্রায়
> আরাগ' বনানী ঝকমক করে—
> ঝিমন্ত পত্রগুচ্ছ মর্মর ধ্বনি করে।

হঠাৎ তন্দ্রাভঙ্গ হলো অধিনায়কের
বনানীর সীমারেখা হলো বিস্তৃত
প্রিয় মাতৃভূমি হাঙ্গেরীর লেবুগাছগুলো যেন
তার মাথার পরে ফিস ফিস করে।

ভানিয়া পড়ছিল সহজ, সুন্দর করে, যথাসাধ্য বেদনার ছায়া চেপে রেখেছিল সে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হচ্ছিল ঐ সংযত কবিতাটির মধ্যে বয়ে চলেছে হৃদয়ের তীব্র স্পন্দন। ভানিয়ার দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকম গভীর আর দৃঢ় হয়ে এল—তার মধ্য দিয়ে দূর আরাগ° রাত্রির দিকে গর্বোদ্ধত দুঃখের সঙ্গে তাকিয়ে থাকা বালকটির চেহারা ফুটে উঠল—

মাতৃভূমি তার সুদূরে
যেখানেই থাকনা কেন সে
হাঙ্গেরীর আকাশ থাকে তার মাথার 'পরে—
হাঙ্গেরীর মাটি তার পায়ের নীচে।

হাঙ্গেরীর গৈরিক পতাকা
জ্বল জ্বল করছে তার হাতে
যেখানেই সে লড়াই করুক তার লড়াই
সবই হলো মাতৃভূমি হাঙ্গেরীর জন্য।

আর এই সামান্য কিছু দিন মাত্র পূর্বে
শোনা গেল মস্কোর অনেকের মুখে
জার্মান বোমার আঘাতে
ওয়েস্কার যুদ্ধে সে বীর হয়েছে নিহত।

সে গুজবে বিশ্বাস করি না আমি
জানি আমি সে লড়ছে স্পেনে
আর মৃত্যুর পূর্বে তাকে সাদরে বরণ করবে
তার দেশবাসী, আবার বুদাপেস্তে।

সে বেঁচে আছে ওয়েস্কার কাছাকাছি কোথাও
যেখানে ক্লান্ত সৈনিকেরা নিদ্রা যায়,
তার মাথার উপরে লরেল পত্রগুচ্ছ চকচক করে
আর ঝিমন্ত পাতার খস খস ধ্বনি শোনা যায়।
তাই হঠাৎ চমক দিয়ে অধিনায়কের মনে হয়
বনানীর সীমারেখা হলো বিস্তৃততর,
প্রিয় মাতৃভূমি হাঙ্গেরীর লেবুগাছগুলি যেন
তার মাথার পরে ফিস ফিস করে।

ভানিয়া থামল। কেউই একটি কথাও বলল না। নড়ল না পর্যন্ত, যেদিন "মাদ্রিদ", "গুয়াদালাজারা", "ওয়েস্কা" এ সব নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতো, দূর সীমান্তের প্রতিটি খবর যেদিন আমাদের হৃৎস্পন্দন করত দ্রুততর, প্রতিটি ঘটনা আমাদের মনপ্রাণকে করত আন্দোলিত সেদিনের ঘটনাপ্রবাহ যেন আমাদের

চোখের সামনে এসে উপস্থিত হলো, ঐ করুণ সুর যেন আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল।

নীরবতা ভঙ্গ করে শুরা বলল—"আঃ কি চমৎকার!" তক্ষুনি চারদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগল—"কে লিখেছে, কোথায় পেলে?"

"১৯৩৭ সালে লেখা হয়েছে এটা, কিন্তু অল্প কিছুদিন আগে মাত্র একটা কাগজে পেয়েছি. বেশ ভালো, নয়?"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"আমরা টুকে নেব।"

ভানিয়া মন্তব্য করল—"স্পেন...স্পেনের মতো এরকম বিপর্যয় আর একটাই ঘটেছে—সে হলো পারীর পতন।"

জয়া বলল—"হ্যাঁ, গ্রীষ্মের সেদিনটার কথা আমার বেশ মনে আছে, খবরের কাগজ এল—আর তাতে লেখা—পারীর পতন হয়েছে, কি ভীষণ. কি লজ্জা।"

ধীরে ধীরে ভানিয়া বললো—"আমারও সেদিনটা বেশ মনে আছে—ফ্যাসিস্টরা পারীর রাজপথে সবুট পদক্ষেপে মার্চ করে বেড়াচ্ছে. এ কি সহজে বিশ্বাস করা যায়! কমিউনার্ডদের পারী. নাৎসীপদানত পারী... ।"

পেতিয়া সিমোনোভ শান্তস্বরে বলল—"আমি যদি সেখানে থাকতাম—আমাদের লোকেরা যেমন করে স্পেনে লড়েছে—তেমনি করে আমার শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে আমি লড়তাম পারীর জন্য।" কেউই বিস্মিত হলো না তার কথায়।

শুরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো—"আমিও এরকম স্বপ্ন দেখেছি. প্রথমে স্পেনে, পরে হোয়াইট ফিনদের বিরুদ্ধে—কিন্তু কোনটাই পারি নি।"

আমি ওদের কথা শুনতে শুনতে ভাবতাম, কি চমৎকার সব মানুষই তৈরি হচ্ছে।

সেবারের শীতে আমি জয়া আর শুরার বন্ধুদের বেশ ভালো করে চিনে ফেললাম. আমার ছেলেমেয়েদের যে যে চরিত্রগুণ লক্ষ্য করতাম, সেই সব ওদেরও মধ্যে লক্ষ্য করে আমি ভাবতাম—এরকমই তো হওয়া উচিত. পরিবার তো আর তালাবন্ধ বাক্স নয়. স্কুলও তা নয়, স্কুল, পরিবার, ছেলেমেয়ে সবারই জীবন দেশের উত্থান পতন, ভাবনা চিন্তা, আশা নিরাশার সঙ্গে মিলিয়ে। চারদিকের ঘটনাপ্রবাহও আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে সাহায্য করে।

ধর যেমন. অতীতের কত বিখ্যাত বিখ্যাত জিনিসের আবিষ্কারকদের নাম পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু এখন যে-কেউ কঠোর পরিশ্রম করলে. কোন বিদ্যা-বুদ্ধির কাজ দেখালে বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক আবিষ্কর্তাদেরই দেশের লোকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে অভিনন্দিত করে তোলে। এই ধর যে মেয়েটি অনেক গুণ বেশি শক্ত, সুন্দর কাপড় তৈরি করার নতুন যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে, তার দৃষ্টান্তে সারা সোভিয়েত দেশের শ্রমিকরা অনুপ্রাণিত। এই ট্রাক্টরচালক মেয়েটি এত নিপুণতার সঙ্গে কাজ করে যে আগে তার নাম লোকে না জানলেও এখন সে পায় সবারই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই যে ছেলেমেয়েদের নূতন বই "তাইমুর এ্যান্ড হিজ স্কোয়াড"—এ তো সম্মান. বন্ধুত্বের অনুভূতি, মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই রচিত হয়েছে। নতুন ছবি "দি ডন অব পারী"-র বিষয়বস্তু ফ্রান্সের জনগণ, পোলিশ দেশ-প্রেমিক ডমব্রোস্কি যিনি নিজের দেশের স্বাধীনতা ও সুখের জন্য পারীর ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা এই সব সৎ. সাহসী, বীরত্বপূর্ণ সহৃদয় আদর্শে ভরা এই সব ছবি দেখে, বই পড়ে, তারা

এ সব পড়ার জন্য এতই উন্মুখ হয়ে থাকে যেন পাওয়া মাত্র গিলে ফেলতে চায়। এও দেখেছি যে, আমার ছেলেদের এবং তাদের বন্ধুদের কাছে যদিও তাদের জন্মভূমির চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই, তবুও এই বিশাল পৃথিবীটাও তাদের প্রিয়। তাদের কাছে ফ্রান্স পেত্যাঁর আর লাভাল-এর দেশ নয়, কমিউ-নার্ডদের ফ্রান্স, স্তঁদাল আর বালজ্যাক-এর দেশ ফ্রান্স। তাদের চোখে ইংরেজরা শেকস্পীয়রের বংশধর, আমেরিকানরা লিংকন্ আর ওয়াশিংটন, মার্ক টোয়েইন আর জ্যাক লন্ডনদের জাতভাই মাত্র। আর তারা যদিও জানে জার্মানি বর্বরের মতো লড়াই করেছে—পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধিয়েছে, ফ্রান্স চেকো-শ্লোভাকিয়া, নরওয়ে দখল করেছে,—তবুও তাদের কাছে সত্যিকারের জার্মানির পরিচয় হিটলার গোয়েবল্‌সের জন্মদাত্রী হিসেবে নয়, তাদের জার্মানি বিঠো-ফেন-এর দেশ, গ্যেটে আর হাইনের দেশ, কার্ল মার্কসের মাতৃভূমি জার্মানি। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি এক তীব্র, জ্বলন্ত ভালোবাসা বিকাশের সংগে সংগে অন্য লোকের প্রতি শ্রদ্ধা, পৃথিবীর অন্য সব জাতির যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো তার প্রতিও ওদের জাগ্রত সম্মানবোধের বিকাশ হচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা চারদিকে যা দেখেছে, স্কুলে যা শিক্ষা পেয়েছে, তাতে তাদের মনে জাগিয়েছে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আর জাগিয়েছে গড়ে তোলার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা—ধ্বংস করার জন্য নয়।

আমি তাদের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি, আশা রাখি তারা সকলেই সুখী ও উজ্জ্বল জীবন গড়ে তুলবে।

যৌবনের রঙ সবুজ

দিন কেটে যায়। জয়া স্বাস্থ্য ফিরে পেল, আমরাও খুব খুশি হলাম। আবার সে বেশ শক্তসমর্থ হয়ে উঠেছে, এখন আর অত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। ক্রমশ—তার বন্ধুদের ধন্যবাদ—ও ক্লাশের বাকি পড়াগুলো শিখে ফেলেছে। যে কোন রকম দয়া বা বন্ধুত্বের নিদর্শনকে জয়া বিশেষ মূল্য দিত, বন্ধুদের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

মনে আছে একবার জয়া আমাকে বলেছিল, "জান মা আমি বরাবরই স্কুলে যেতে খুব ভালোবাসতাম কিন্তু এখন..."

ও নীরব হয়ে রইল কিন্তু সে নীরবতার মধ্যে কথার চেয়েও বেশি অনুভূতি প্রকাশ পেল। একটু পরে আবার বলল—"জানো—নিনা স্মোলিওনোভার সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, সে আমাদের সমান ক্লাশের ছাত্রী। মেয়েটি আমার একেবারে মনের মতন, বেশ গভীর হৃদয় আর স্পষ্ট বক্তা। একদিন আমরা লাইব্রেরিতে আমাদের প্রিয় বই, প্রিয় বন্ধুদের সম্বন্ধে খুব আলোচনা কর-ছিলাম, দেখলাম প্রত্যেক ব্যাপারেই আমরা একমত। খুব শীগগিরই আমি তোমাকে তার সংগে পরিচয় করিয়ে দেব।

কয়েকদিন পরে ভেরা সার্জিয়েভ্না নভোসেলোভার সংগে দেখা হলো রাস্তায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"জয়া কি রকম পড়াশোনা করছে।"

"আমার বিষয় সে অনেকদিন আগেই সব শিখে নিয়েছে, ও এত পড়াশোনা করেছে...ও যে ক্রমশ ভালো হয়ে উঠেছে, আগের থেকে বল পেয়েছে দেখে আমরা বেশ খুশি হয়েছি, ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই আমি ওকে দেখি, মনে হচ্ছে নিনার সঙ্গে ওর বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে, তারা দুজনেই এক স্বভাবের। মানুষ সম্বন্ধে অথবা পড়ার বিষয়ে ওদের দুজনের মতামত প্রায় একই রকম, সব কিছুই গভীরভাবে দেখে।"

ভেরা সার্জিয়েভ্‌নার সঙ্গে স্কুল পর্যন্ত গেলাম, বাড়ি ফেরার পথে আমি ভাবলাম—"কি ভালো করেই তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের চেনেন।"

বসন্ত এল সেবার—হঠাৎ তার সবুজ রঙ নিয়ে। আমার ঠিক মনে নেই, সেবার নবমশ্রেণীর ছাত্রেরা কি একটা খারাপ কাজ করেছিল—তবে এটুকু মনে আছে গোটা ক্লাশের ছাত্রছাত্রীরা অনুতপ্ত হয়ে অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, তাদের শাস্তি না দিয়ে, স্কুল বাগানের সব চেয়ে শক্ত জায়গায় চারা লাগাবার কাজ দেওয়া হোক।

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ্ রাজী হলেন, তবে তিনি কোনই দয়া দেখালেন না, সত্যি সত্যিই সব চেয়ে শক্ত জায়গায় তিনি তাদের কাজ দিলেন, যেখানে স্কুলের লাগোয়া নতুন তিনতলা বাড়িটা সবেমাত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে—ইঁটের কুঁচিতে জায়গাটা একেবারে ঠাসা।

জয়া আর শুরা সেদিন দেরি করে বাড়ি ফিরল। ওদের সারাদিনের কাজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিল।

কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে নবমশ্রেণী ক বিভাগ লেগে গেল জমি পরিষ্কার আর সমান করতে, জঞ্জাল বয়ে নিয়ে যাওয়া, গর্ত খোঁড়া আরম্ভ হয়ে গেল। অধ্যক্ষ নিকোলাই কিরিকভ, ওদের সঙ্গে কাজ করছিলেন--পাথরকুচি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, মাটি খুঁড়ে গর্ত করছিলেন। হঠাৎ একজন রোগা লম্বামতন লোক ছেলেদের সামনে এসে উপস্থিত। "হ্যালো"—বলে উঠলেন তিনি।

"হ্যালো"—বলল ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে।

"অধ্যক্ষকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার ?"

কিরিকভ আগন্তুকের দিকে ফিরে, ময়লা হাতদুটো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—"এই যে আমি।"

জয়া হাসতে হাসতে বলে উঠল—"তিনি দাঁড়ালেন সর্বাঙ্গে কাদামাখা, হাতে একটা কোদাল, যেন এই-ই নিতান্ত স্বাভাবিক, যেন অধ্যক্ষের কাজই হলো ছাত্রদের সঙ্গে মিশে গাছ লাগানো।"

দেখা গেল রোগা লোকটি শিশু-সাহিত্যিক, আর 'প্রাভদার' সংবাদদাতা। প্রথমে তো তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে এই চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটিই ২০১নং স্কুলের অধ্যক্ষ ; তারপর তিনি হাসলেন, তিনি যে অন্য কোন বিশেষ কাজে এসেছিলেন স্কুলে সে কথা ভুলে সারা বিকালটা সে জায়গা ছেড়ে আর উঠলেন না। ছেলেমেয়েদের তৈরি নতুন ফলের বাগানটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। র‍্যাস্পবেরীর ঝোপ, গোলাপের চারা দেখে দেখে তিনি বললেন স্বপ্নালু চোখে—"আশ্চর্য...মনে কর মাঝামাঝি ক্লাশে থাকতে একটা আপেল-গাছ লাগালে তোমরা, স্কুলবাগানে নিজ হাতে। তোমাদের বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বড়ো হলো টিফিনের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে তার দিকে নজর করে যাচ্ছ, মাটি খুঁড়ে, জল দিয়ে, পোকামাকড় নষ্ট করে এর যত্ন করছ, এখন

যখন তোমার স্কুল ছাড়ার সময় হলো, আপেল গাছে তার আগেই ফল ধরতে শুরু করেছে...চমৎকার...।"

জয়াও বলল আবার স্বপ্নালু চোখে—"চমৎকার, এখন নবম শ্রেণীতে পড়ছি আমি, আজ একটা লিণ্ডেন গাছ লাগিয়েছি আমি আর আমার গাছ একই সঙ্গে বেড়ে উঠব...তৃতীয় গাছটা হলো আমার পোঁতা, মনে রেখো মা আর চতুর্থ গাছটা কাতিয়া আন্দ্রিয়েভনার।"

কয়েকদিন পর "প্রাভদা"য় প্রকাশিত হলো কি করে ২০১নং স্কুলের নবম শ্রেণী বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজস্ব বাগান তৈরি করেছে, উপসংহারে সাংবাদিক বলছেন ঃ

"স্কুলের শেষ পরীক্ষা হয়ে এল। তরুণ ছাত্রছাত্রীরা স্কুল শেষ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে, তাদের শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়, উন্নত ; স্কুলে খোলামাঠের তুষার, ঝড়ঝাপ্টা তারা সহ্য করতে শিখেছে। এই স্কুলের ছাত্রেরা কাজ করতে, উচ্চ শিক্ষা নিতে, লালফৌজে যোগ দিতে শুরু করবে,—নেক্রাসভ-এর গানে যেমন পাই বনানীর শ্যামল গতি, এরাও তেমনি অরণ্যের সবুজের মতো হবে অপরাজেয়।"

নাচ

২১শে জুন দশম শ্রেণীতে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি পার্টির ব্যবস্থা হলো। নবম শ্রেণী ক বিভাগের সবাই এতে যোগ দেবে স্থির করল।

শুরা বলল—"প্রথমত তারা আমাদের বন্ধু, তাদের মধ্যে ভালো ভালো অনেকে আছে, ভানিয়া বেলিখ একাই তো এক ডজনের সমান।"

কাতিয়া বলল—"আর দ্বিতীয়ত ওদের ব্যাপারটা কি রকম উৎরায়, পরের বছর হয়ত আমরা আরও নতুন রকম করে করব।"

নাচের জন্য, অতিথি হিসাবে, দর্শক হিসাবে, অংশগ্রহণকারী হিসাবে, আর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেও বটে ওরা তৈরি হলো, মনে মনে ওদের ইচ্ছা আগামী বছর ওরা এমন চমৎকার নাচের আয়োজন করবে যে কোন স্কুল কোনদিন, এমন চমৎকার নাচের কথা ভাবেই নি, শোনা তো দূরের কথা।

ড্রয়িং মাস্টার নিকোলাই ইভানোভিচ স্কুল সাজানোয় সাহায্য করলেন। ২০১নং স্কুলের যা বিশেষ প্রয়োজন সেই নিপুণ করিৎকর্মা হাতদুটির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রত্যেকবারই তিনি নতুন নতুন ঢং-এ স্কুল সাজিয়ে দিতেন অক্টোবর বিপ্লববার্ষিকীর দিনে, নববর্ষে, মে-দিবসে, প্রত্যেক বারই নতুন, অসাধারণ কিছু ভেবে বার করতেন। তাঁর কথামতো কাজ করতে শিশুরা দারুণ উৎসাহ বোধ করতো।

শুরা বলল—"এবার তিনি যথাসাধ্য করবেন।"

সন্ধ্যাটা বেশ ঝরঝরে আর গরম ছিল, আমি দেরি করে প্রায় দশটার সময় বাড়ি ফিরলাম। ছেলেমেয়েরা আরও আগেই নাচের পার্টিতে বেরিয়ে গেছে। একটু পরে আমি আবার বাইরে গেলাম, বাইরের বারান্দায় নিশ্চিন্তে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, নিস্তব্ধ রাত্রিতে সতেজ পাতার গন্ধে অভিভূত হয়ে আনন্দিত

মনে আমি বসেছিলাম, ঠিক কোন কিছু ভাবছিলাম না। এবার আমি উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে স্কুলের দিকে এগিয়ে গেলাম. আমার ইচ্ছে ছিল কেবলমাত্র দূর থেকেও যদি একবার দেখতে পেতাম নিকোলাই ইভানোভিচ্ তাঁর নিজের ক্ষমতাকে হার মানিয়ে কি রকম করে স্কুল সাজিয়েছেন, ছেলেমেয়েরা কি রকম আনন্দ পাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে কেন যে গেলাম তা আমি জানি না। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম—এই পর্যন্ত জানি।

মেয়েলী গলায় শোনা গেল—"২০১নং স্কুলটা কোথায় বলতে পারেন?"

আমি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই মোটা গলায় দরদীভাবে যেন জবাব দিল—"কিরিকভের স্কুল? সোজা গিয়ে বাঁক ঘুরলেই কোণায় দেখতে পাবেন। ঐ যে গান শুনতে পাচ্ছেন না?"

আমিও গান শুনতে পাচ্ছিলাম. মোড় ঘুরতেই দেখলাম গোটা বাড়িটা আলোয় ঝলমল করছে। জানালাগুলো খোলা।

আমি ভিতরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে নজর দিলাম। হ্যাঁ, নিকোলই ইভানোভিচ্ খুবই চমৎকার সাজিয়েছেন, সাজানোর গুণে মনে হচ্ছে যেন গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হয়েছে স্কুলে। সর্বত্রই ফুল আর সবুজের মেলা। ফুলদানীতে, টবে, পাত্রে, মেঝেতে, দেয়ালে, জানালায়, প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি সিঁড়িতে, গোলাপের তোড়া, গাঢ় সবুজ ফারের মালা, লাইলাকের বড়ো বড়ো গোছা, বার্চের লেসের মতো কারুকার্যময় শাখা ফুল আর ফুল সর্বত্র...।

গান, হাসি আর হল্লার দিকে এগোলাম, হলের বিরাট খোলা দরজাটায় থামলাম, এত আলো, এত সব তরুণ উজ্জ্বল মুখ, চোখ আমার ঝলসে গেল। শুরা যার কথা বলেছিল, সেই ভানিয়াকে চিনতে পারলাম। ও ছিল ছাত্র-সমিতির সভাপতি, চমৎকার কমসোমল-সভ্য, লেখাপড়ায়ও চমৎকার। রাজ-মিস্ত্রীর ছেলে নিজেও চুনবালির কাজে ওস্তাদ, বেশ বুদ্ধিমান আর নিপুণ হাত দুখানা তার...। নীচের শ্রেণীতে জয়া আর শুরাকে যিনি পড়াতেন, সেই লিদিয়া নিকোলাইয়েভ্নার ছেলে ভলোদিয়া য়ুরিয়েৎকেও দেখলাম। ছেলেটির উজ্জ্বল চোখ, উঁচু ভুরু, মুখের গভীর পবিত্র ভাব আমাকে চিরকাল অবাক করেছে, এখন কিন্তু সে নাচতে নাচতে ঘুরে যাওয়া জোড়া জোড়া ছেলেমেয়েদের উপর রঙীন কাগজের কুচি ছুঁড়ে ফেলছে। ছোট শিশুর মতো হেসে গড়িয়ে পড়ছে...এইবার আমি শুরাকে চিনতে পারলাম, দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সোনালী চুলওয়ালা একটি মেয়ে তার সঙ্গে ওয়ালজ নাচার জন্য শুরাকে ডাকছে, ছেলে আমার সলজ্জ হেসে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে।

ঐ যে জয়া, কালো ফুটকিওয়ালা লাল টুকটুকে একটা জামা গায়, শুরার দেওয়া টাকাটা দিয়ে সে এই জামাটা কিনেছে। তারো জামাটা ভারী মানিয়েছে, প্রথমবার দেখে শুরা খুব খুশি হয়ে বলেছিল—"জামাটা তোমায় খুব মানাচ্ছে।"

লম্বা কালো একটি ছেলের সঙ্গে জয়া গল্প করছে, ওর নাম আমি জানি না। হাসিতে ভরা উজ্জ্বল চোখ, গালদুটো লাল।

ওয়াল্জ্ শেষ হওয়ায় জোড়া ভেঙে সবাই আলাদা হয়ে এল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই আনন্দচঞ্চল কণ্ঠে কে যেন আদেশ দিল, "সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও।"

আবার নীল, গোলাপী, সাদা জামাগুলো ঝলমল করে উঠল, হাসিমাখা মুখগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও কৌতুকময় হাসির ফোয়ারা ভেঙে পড়ছিল, রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াতে বেড়াতে আমি ধীরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। জয়া আর শুরাকে প্রথম স্কুলে নিয়ে যাবার দিনটা আমার মনে এল—কি রকম বড়ো হয়ে উঠেছে ওরা, ওদের বাবা যদি দেখতে পেতেন!

মস্কোতে গরমের দিনের রাতগুলি খুব ছোট। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙে না, মাঝে মাঝে শোনা যায় পথিকের পদশব্দ, হঠাৎ হয়ত গাড়ি আসে কোথা থেকে আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। ক্রেমলিনের ঘন্টার রেশ ধ্বনি তোলে ঘুমন্ত নগরীর উপরে।

কিন্তু জুনের সেই রাতটাকে কোনমতেই নিস্তব্ধ বলা চলে না। সশব্দ হাসি, কণ্ঠস্বর, দ্রুতপায়ে চলার হাল্কা শব্দ অন্ধকারের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছিল, হয়ত একটা গানেরই কলি শোনা গেল। মানুষ এই অনভ্যস্ত সময়ে হঠাৎ জেগে উঠে জানালা খুলে উঁকি মারল, মৃদু হাসি খেলে গেল তাদের ঠোঁটে। কেউ জিজ্ঞাসা করল না কেন এই রাত্রে এত তরুণ তরুণী রাস্তায় চলাফেরা করছে, কেন ছেলেমেয়েরা দশ পনেরজন মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেনই বা তারা হাসি আর গান চাপতে না পেরে উচ্ছ্বল হয়ে উঠেছে, কেনই বা ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে কলরব করতে করতে চলেছে। সবাই জানত তরুণ মস্কো আজ ডিপ্লোমা পাবার দিনটিতে উৎসবে মত্ত।

জানালা দিয়ে নবীন সূর্যের প্রভাতরশ্মি উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ খুললাম, রাতটা এত ছোট, ২২শে জুন ছিল সেদিন।

শুরা তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছিল, ওর সাবধানী টিপে টিপে চলা পায়ের শব্দেই নিশ্চয় আমার ঘুম ভেঙেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"জয়া কোথায়?"

"ইরার সঙ্গে একটু বেড়াতে গিয়েছে।"

"বেশ ভালো পার্টি হয়েছে শুরা?"

"ও চমৎকার! আমরা আগেই গিয়ে বিদায়ী ছাত্রদের শিক্ষকদের সঙ্গে নিরিবিলি কথাবার্তা বলতে ছেড়ে দিলাম, একটু ভদ্রতা করেই আর কি বুঝলে না—শিক্ষকদের কাছ থেকে যাতে ভালো করে বিদায় নিতে পারে তাই।"

শুরা বিছানায় ঢুকল। আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকলাম। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে গলার আওয়াজ ভেসে এল।

শুরা চুপি চুপি বলল—"জয়া আর ইরা।"

মেয়েদুটি জানালার নীচে এসে সোজা দাঁড়ালো, কোন কিছু নিয়ে খুব তর্ক হচ্ছিল তাদের—

ইরার গলা ভেসে এল..."নিজেকে সে সময় মনে হবে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী।"

"তা ঠিক, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যাকে শ্রদ্ধা করি না তাকে কি করে ভালোবাসতে পারি।" জয়া প্রতিবাদ করে উঠল।

ইরা আহত হয়ে বলে উঠল—"তুমি কি করে এ রকম বলতে পার...এত বই পড়ার পরেও!"

"তার জন্যই তো বলছি—যাকে শ্রদ্ধা করি না, তাকে ভালোওবাসি না।"

"কিন্তু বইয়ে তো প্রেম সম্বন্ধে এ রকম লেখে না, বইয়ে লেখে প্রেমই হলো সুখ....এ এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি..."

"তা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু...।"

গলার স্বর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

শুরা আস্তে আস্তে বলল—"ইরাকে বাড়ি দিয়ে আসতে গেছে।" তারপর বড়ো ভাইয়ের মতো উদ্বিগ্ন স্বরে বলল—"জীবন ওর কঠিন হবে মা, সব কিছুই ও বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে দ্যাখে।"

আমি বললাম—"ভেবো না, এখনো ও অনেক ছোট। সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে শুরা।"

সিঁড়িতে জয়ার সতর্ক পায়ের শব্দ শোনা গেল, আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে ভিতরে এসে জিজ্ঞাসা করল—"তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছ?"

আমরা জবাব দিলাম না. নিঃশব্দে জয়া জানালার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রভাতের আলোয়-ধোয়া আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

২২শে জুন

সেদিনের প্রতিটি ঘটনা আমার কি পরিষ্কার মনে আছে!

২২শে জুন রবিবার, সামরিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় আমি দেখা-শোনার ভার নিয়েছিলাম। পরিষ্কার-রোদে ঝলমল সকাল, আমি ট্রাম ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম, জয়া আমাকে বিদায় দিতে এসেছিল, আমার পাশে পাশে হাঁটছিল জয়া, বেশ বেড়ে উঠেছে। লম্বা, পাতলা চেহারা,—গালে হাল্কা গোলাপী আভা, সুন্দর হাসির ঝিলিক দিয়ে যায় ওর ঠোঁটে, সূর্যের কিরণের দিকে তাকিয়ে, চারদিকের সতেজ চেহারায় মুকুলে-ভরা লেবুগাছের দিকে চেয়ে ও মুগ্ধ চোখে হাসছিল।

আমি ট্রামে উঠলাম, আমাকে হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে এক সেকেণ্ডটাক দাঁড়িয়ে থেকে পিছন ফিরে বাড়ির পথ ধরল।

প্রায় এক ঘণ্টা লাগল সামরিক বিদ্যালয়ে পৌঁছতে। সাধারণত আমি ট্রামে কিছু পড়ি কিন্তু সে সকালটা এত সুন্দর ছিল যে আমি প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েও নতুন গ্রীষ্মের মধুর বাতাস প্রাণভরে নিচ্ছিলাম নিশ্বাসের সংগে। পথচলার সব রকম বাধা অগ্রাহ্য করেও চলন্ত ট্রাম-বাসের ভিতরে বইছে এই হাওয়া, প্ল্যাটফরমে ভীড় করা ছেলেমেয়েদেরও সোনালী চুলগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে, আমার পাশের যাত্রীরা ওঠানামা করছে, তিমিরিয়াজেভ একাডেমির স্টপে এসে ছাত্ররা নেমে পড়ে যার যার পথে পা বাড়াল। পরীক্ষার ভীড় রবিবার মানে না। তিমিরিয়াজেভ-এর মূর্তির পাশে, রঙীন ফুলের রাশির মাঝে মাঝে, বেঞ্চের উপর বসে থাকা দলবদ্ধ ছেলেমেয়েদের উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। মনে হলো পড়ছে ওরা। হয়ত এদের মধ্যে পরীক্ষা পাশকরা ভাগ্যবানের দলও খুঁজলে পাওয়া যাবে। পরের স্টপ-এ প্ল্যাটফরম এবং ট্রেনে চমৎকার পোশাক আর লাল টাইপরা ছেলেমেয়ের ভিড়। খুব অল্প বয়সী চশমা চোখে শিক্ষিকা

একজন নজর রাখছে ওদের উপর, কেউ যেন বেশি গোলমাল না করে, সিঁড়িতে না দাঁড়ায়, জানালা গলিয়ে বাইরের দিকে মাথা না বাড়ায়।

চওড়া কাঁধওয়ালা এক তরুণ জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা মতলবটা কি মারিয়া ভাসিলিয়েভ্না? ক্লাশেও চুপ করে থাকব, এখানেও কথা বলব না—আমরা তো এখন ছুটিতে যাচ্ছি!"

শিক্ষিকার জবাব দেবার আগ্রহ নেই মোটেই। তার বদলে এমনভাবে তার দিকে তাকালেন যে সে বেচারার চোখ আপনা হতে নীচু হয়ে এল. নিঃশ্বাস ফেলে বেচারা চুপ করে গেল।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে গাড়িতে নেমে এল পবিত্র নীরবতা। তারপর একটি উজ্জ্বল সোনালী চুলওয়ালা মেয়ে, চোখে তার দুষ্টুমির হাসি, সারা মুখে তার কৌতুকের ছটা, তার সঙ্গিনীকে কনুয়ের খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে কি বলল—আর শুধু হয়ে গেল পরের মুহূর্তেই সকলের চাপা হাসি আর ফিস-ফিসানি। গাড়ির মধ্যে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল মৌমাছির চাকের মতো মৃদু গুঞ্জন।

ট্রাম থেকে নামলাম। পরীক্ষা আরম্ভ হতে আরও আধ ঘন্টা বাকি ছিল, চওড়া রাস্তা ধরে আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। বইয়ের দোকানের জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি—শুরাকে বলতে হবে, এখানে এসে দশম শ্রেণীর জন্য মানচিত্র আর পড়ার বইগুলো কিনে নেবে। স্কুলের শেষ পরীক্ষার জন্য আমাদের আগেই প্রস্তুত হওয়া ভালো। আর এই যে শিল্পপ্রদর্শনী যেখানে আসবার জন্য আমরা জল্পনা কল্পনা করছি...

স্কুলে পৌঁছে আমি তিনতলায় উঠলাম, এত খালি দেখাচ্ছে যে পরীক্ষার সময় বলে মোটেই মনে হচ্ছে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসবার ঘরে অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা হলো।

তিনি বললেন—"লিউবোভ তিমোফিয়েভনা, আজকের মতো পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে—কেন জানি না ছাত্রছাত্রীরা এখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি।"

তবুও কিছুই সন্দেহ না করলেও আমার মনে হলো যেন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, আমার ছাত্রেরা সৈন্যের মতো কঠোর নিয়মশৃংখলার ভক্ত, তবে তারা কেন ঠিক পরীক্ষার দিনটিতে অনুপস্থিত? ব্যাপার কি? কেউ তো বলতে পারে না।

রাস্তায় আবার বেরিয়ে গিয়েও যেন আমার দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল, পথিকদের—সকলেরই যেন মুখে চোখে চিন্তার ছায়া, কোথায় গেল সেই সকালের সতেজ প্রসন্নতা, কোথায় সেই আনন্দচঞ্চল ছুটির নেশায় পাওয়া মস্কোর জনতা! প্রত্যেকেই যেন কোন কিছুর প্রতীক্ষা করছে—ধৈর্য ধরা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছে—যেন ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছি—

ঘড় ঘড় শব্দে লোকভর্তি ট্রাম চলেছে—প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই আমাকে হেঁটে আসতে হলো, বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা ট্রামে উঠে পড়ায় কমরেড মলোতভের বক্তৃতাটা শুনতে পেলাম না। কিন্তু বাড়ি পৌঁছনোর পরমুহূর্তে যে কথাগুলো কানে এল, তাতে সেই স্মরণীয় সকালের দমবন্ধকরা ঝড়ো আব-হাওয়া ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

আমার দিকে দৌড়ে আসতে আসতে আমার ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল—"যুদ্ধ, মা, যুদ্ধ!" দুজনেই তারা একসঙ্গে কথা বলতে লাগল—"যুদ্ধ লেগেছে

—জার্মানি আমাদের আক্রমণ করেছে—সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা না করে তারা সীমান্ত লঙ্ঘন করে আক্রমণ শুরু করেছে।"

জয়ার মুখ রাগে লাল, রাগ চাপবার চেষ্টা মাত্র না করে রাশ ছেড়ে দিয়ে বলে চলেছে জয়া, শুরা নিজেকে শান্ত সংযত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

চিন্তামগ্নভাবে বলল—"এ রকম ঘটবে আশঙ্কাই করা হয়েছিল, ফ্যাসিস্ট জার্মানি কিসের পিছনে ধাওয়া করছে তা তো আমরা জানতামই।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধতা এল।

জয়া যেন আপনার মনে বলার ভঙ্গিতে চাপা সুরে বলল—"হ্যাঁ, জীবনের গতি ঘুরে গেল।"

শুরা চমকে ওর দিকে ফিরে বলল—"তুমি বোলো না যেন, তুমি সীমান্তে যাবার ফন্দী আঁটছ।"

খুব রাগতভাবে আগেরই মতো কাউকে সম্বোধন না করেই বলল জয়া—"ঠিক তাই আমি করব ভাবছি।" নিতান্ত আকস্মিকভাবে, পাক খেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

আমরা জানতাম, যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নেবে, যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, দুঃখ, বেদনা। কিন্তু তখনকার সেই দুর্দিনে আমাদের সত্যিকার বীভৎসতার সঙ্গে পরিচয় ছিল না বিশেষ। বিমান আক্রমণ কাকে বলে, বিমান আক্রমণের সময়ে আশ্রয়স্থান কি, ট্রেঞ্চ কাকে বলে—আমরা কিছুই জানতাম না,—শীগগির আমাদের এসব তৈরি করতে হবে। এখনও পর্যন্ত আমরা বোমার শব্দ, বোমা ফাটার শব্দও শুনি নি। আমরা এত জানতাম না যে বোমার টুকরো জানালার শার্সি চুরমার করে ভেঙে দিতে পারে, তালাবন্ধ দরজাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারে। বাসস্থান ত্যাগ করে যাওয়া কাকে বলে, ছেলেমেয়ে নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে যাওয়া, সেই ট্রেন যাকে শত্রুরা বেশ ঠাণ্ডামাথায় বোমার আঘাতে চুরমার করে দিতে পারে, মাটিতে মিশিয়ে যাওয়া গ্রামের কথা, ভাঙা ইঁটের স্তূপে পরিণত শহরের কথা আমরা তখনও শুনি নি। ফাঁসীর মঞ্চ, তদন্ত, অত্যাচার, ভয়াবহ গর্ত আর কবর, যেখানে শত শত মানুষকে হত্যা করা যায়—হোক সে ছেলে বুড়ো, ছেলেকোলে মা—এসব কিছুরই হদিশ আমরা জানতাম না তখন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে পুড়িয়ে মারার চুল্লীর কথাও শুনি নি তখনও। মৃত্যুশকট, মানুষের চুলে তৈরি জাল, মানুষের চামড়ায় বাঁধানো বই-এর কথা স্বপ্নেও শুনি নি কখনো, আরও কত কিছুর নাম যে জানতাম না! মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ছেলেমেয়ের প্রতি ভালোবাসা, ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ এমনি সব ধারণা নিয়ে আমরা বড়ো হয়েছি, তখনও আমরা জানতাম না, মানুষের দেহধারী পশুরা মায়ের স্তন থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে, কতদিন যে এই যুদ্ধ চলবে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না।

হ্যাঁ, আরও কতকিছু আছে যা আমরা জানতাম না

যুদ্ধের দিনগুলি

আমাদের বাড়ি থেকে প্রথম যুদ্ধে গেল য়ুরা ইসাইয়েভ। তার যাত্রা আমি দেখলাম। স্ত্রীর সঙ্গে হাঁটছিল সে, একটু পিছনে কখনও রুমাল দিয়ে কখনো এপ্রন দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আসছিলেন তার মা। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে য়ুরা পিছন ফিরে দেখল। প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আমাদের মতো ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ঘন সবুজ ঝোপের আড়ালে আমাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা তার বাসিন্দারা, নিশ্চয়ই ওর মনে বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল। এত ঘনিষ্ঠ, এত প্রিয় এই পিছনে ফেলে-যাওয়া স্মৃতি...। জানালায় আমাকে আর জয়াকে দেখে হেসে টুপি নেড়ে সম্ভাষণ জানাল—চেঁচিয়ে বলল—"কল্যাণ হোক তোমাদের।"

জয়া জবাব দিল—"সৌভাগ্য ঘিরে থাকুক তোমাকে"—য়ুরা পিছনে তাকাতে তাকাতে চলল, যেন পিছনে ফেলে রাখা সব কিছুকেই সে স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে চায়—বাড়ির প্রতিটি থাম, খোলা জানালা, চারদিকের, সবুজ, ঝোপ—সবই প্রিয়বন্ধুর মতো তাকে টানছে...

বেশিদিন হয় নি সার্জি নিকোলিনকে যেতে হলো। তার স্ত্রী ফ্যাক্টরিতে কাজে ছিল, বিদায় দিতে আসতে পারে নি, তাই তাকে একলাই যেতে হলো। একটু দূরে গিয়ে সার্জিও য়ুরার মতো পিছন ফিরে তাকাল। কত রকম লোক, বাইরে দেখতে একের অন্যের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই কোথাও, কিন্তু এই বিদায়ের মুহূর্তে তাদের সকলের চোখই দেখাল একই রকম। ভালোবাসা আর উদ্বেগ-মাখানো সে চোখে ছিল তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি, যতটুকু সম্ভব, এই চোখ ভরেই নিয়ে যেতে হবে দূরে—আর কোন উপায় নেই মনে রাখার।

জীবনের গতি একেবারেই বদলে গেল, কঠোর আর বিপর্যস্ত হয়ে উঠল আমাদের জীবনযাত্রা, ওলটপালট হয়ে গেল সব। জানালার পাটগুলোতে কাগজ লাগিয়ে রাখা হলো। সব জানালার একই প্যাটার্ন দাঁড়িয়ে গেল—কোনাকুনি সাঁটা দুই সারি কাগজে দেখাত গুণচিহ্নের মতো, দোকানের জানালাগুলো তিনপিস কাঠ দিয়ে মুড়ে বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা হলো, বাড়িগুলো যেন পাহারায় ঘেরা নিরানন্দ মূর্তিতে কটমট করে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

আমাদের বাড়ির উঠানে আমরা একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়তে আরম্ভ করে দিলাম, নিজের নিজের চাল থেকে কাঠের টুকরো এনে দেয়াল করা হলো তার, আমাদের একজন প্রতিবেশী অন্যদের চেয়ে জোর গলায় চেঁচাতে লাগলেন এই বলে যে জনগণের স্বার্থে সব কিছুই ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু মজা এই যে নিজের বাড়ি থেকে তিনি একটুকরো কাঠও আনেন নি, বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন। উপরন্তু একটি বাচ্চা ছেলে আর মেয়ে (ওদের বাবা গিয়েছেন যুদ্ধে, মা গিয়েছেন কাজে) খেলা করছিল বলে ওদের উপর চড়াও হয়ে বললেন শীগগির যেন ওরা বাড়ি গিয়ে তক্তা নিয়ে আসে। জয়া তার প্রতিবাদ করে শান্তভাবে স্পষ্ট গলায় বলল—"শুনুন একটা কথা, আপনার গুদাম খুলে এখনি আমাদের কিছু তক্তা দিন, ওগুলো দিয়ে কাজ করতে করতে ওদের মা

এসে পড়বেন আর যা যা দরকার সবই তিনি করবেন, তার জন্য আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ছেলেমেয়েদের উপর তম্বি করা খুব সোজা!"

যুদ্ধের প্রথম দিকেই আমার ভাইপো শূলাভা বিদায় নিতে এসেছিল আমাদের কাছে, বিমানবাহিনীর পোশাক পরা, সার্টের হাতায় বসানো বিমানের পাখা।

আমাদের জানাল—"চললাম যুদ্ধ করতে, দয়া করে মনে রেখো।" মুখ-চোখে ওর সে কি উল্লাস, যেন বনভোজন করতে চলেছে।

আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম দৃঢ়ভাবে, আধঘন্টাটাক আমাদের সঙ্গে থেকে চলে গেল শূলাভা।

ওর চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে জয়া বলল—"কি দুঃখের কথা—ওরা মেয়েদের নেয় না সৈন্যদলে!" ওর কথায় তিক্ততা আর স্থিরপ্রতিজ্ঞা এত বেশি পরিমাণে ফুটে উঠল যে শুরা পর্যন্ত ওর বরাবরের অভ্যাস এই নিয়ে একটু মজা করা, ঠাট্টা করা বা তর্ক করার সাহস পেল না।

সোভিয়েত সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বেতার ঘোষণা না শুনে আমরা কখনও শুতে যেতাম না। প্রথম কয় সপ্তাহে সেগুলি মোটেই আনন্দদায়ক হতো না, জয়া দাঁত ভুরু কুঁচকে সে সব শুনত, আর কখনও বা আমাদের ফেলে রেখে উঠে চলে যেত, কিন্তু একবার ও চেঁচিয়ে উঠল—"আমাদের পবিত্রভূমিকে হতভাগারা অপবিত্র করছে!"

সেই একবার মাত্র জয়ার দুঃখের কান্না আমি শুনেছি।

বিদায়

১লা জুলাই সন্ধ্যার দিকে আমাদের দরজায় ঘা পড়ল। পিছন থেকে ভেসে এল—"আমি কি শুরার সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

জয়া টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করল—"পেতিয়া সিমোনোভ? শুরাকে চাই কেন?"

রহস্যজনক সুরে পেতিয়া বলল—"তাকে আমাদের দরকার।"

ঠিক এই মুহূর্তে শুরা বাইরে বেরিয়ে কমরেডের দিকে চেয়ে সম্ভাষণ জানাল, কোন কথা না বলে নীরবে বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে, আমরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম শুরার সমবয়সী ক্লাশের বন্ধুরা, কয়েকজন নীচে অপেক্ষা করছে তাড়াতাড়ি খানিকটা তর্কবিতর্ক হলো নীচুগলায়, তারপর তারা দলবেঁধে চলে গেল—

জয়া চিন্তিতভাবে আপন মনে বলল—"স্কুলের দিকে গেল! ভাবছি কি তাদের এমন গোপন কথা।"

শুরা অনেক রাত করে ফিরল, সকালবেলায় পেতিয়ার মতোই ওর মুখ গম্ভীর, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

জয়া জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার; এত গোপনতাই বা কেন? তোমাকে ডেকেছিল কেন?"

শুরা স্থির গলায় জবাব দিল, "আমার বলার অধিকার নেই।"

জয়া কাঁধঝাঁকানি দিয়ে সোজা হয়ে নিল। পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতেই জয়া দৌড়ে স্কুলে গেল, ফিরে এল বিরক্ত চেহারা নিয়ে, আমাকে বলল—

"ছেলেরা চলে যাচ্ছে, কোথায় বা কেন কিছুতেই বলল না ওরা, মেয়েদের নেবে না ওরা কিছুতেই, আমি এত করে বললাম, আমি তো গুলি চালাতে পারি, আমার গায়ে তো বেশ জোর আছে, তা ওরা শুনবে না, বলল শুধু ছেলেরাই যাবে।"

জয়ার মুখচোখের চেহারা দেখে বোঝা গেল কত কষ্টে আর কত ব্যথায় সে ওদের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছে।

শুরা দেরি করে ফিরে এসে নিতান্ত স্বাভাবিকসুরে যেন অসাধারণ কিছুই ঘটে নি এমনভাবে বলল—"মা আমায় কিছু গেঞ্জি প্যান্ট গুছিয়ে দাও, আর কিছু খাবার, খুব বেশি চাই না।"

কিন্তু তারা কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে, সে নিজেও সে সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা, তা কিছুই ওর কাছ থেকে বার করতে পারলাম না।

বলল—"যদি আমার মগজ থেকে সবকথা তোমাদের বার করে দিয়ে কাজ করা আরম্ভ করি, তাহলে আমি কি ধরনের সৈনিক বলে পরিচিত হব বল দেখি?"

জয়া নীরবে চলে গেল।

বাঁধাছাঁদা করতে বেশি সময় লাগল না। পথে খাবার জন্য বিস্কুট, মিষ্টি আর সসেজ এনে দিল জয়া। আমি ওর বিছানার চাদর-টাদর সব নিয়ে একটা পোঁটলা করে দিলাম, বিকেলে শুরাকে বিদায় দিতে গেলাম আমরা।

তিমিরিয়াজেভ পার্কে নানা স্কুল থেকে অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে, প্রথমে সবাই একসঙ্গেই গল্পগুজব করছিল, তারপর ওদের স্কুল অনুসারে ভাগ করা হলো। মা আর বোনেরা একদিকে পোঁটলাপুঁটলি, সুটকেশ পিছন-দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে ঝোলানো ব্যাগের মতো রাকস্যাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যারা যাচ্ছে তাদের প্রায় সবারই চওড়া কাঁধ লম্বা চেহারা, কিন্তু মুখের চেহারা কৌতুকোচ্ছল বালসুলভ, ভাবখানা দেখাচ্ছে যেন বাড়িঘর মা-বোন ছেড়ে চলে যাওয়াটা নিতান্তই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেউ কেউ সময়-পেয়ে পুকুরে একটা ডুব দিতে গিয়েছে, কেউ বা আইসক্রীম খাচ্ছে, ঠাট্টাতামাসা করছে, নিতান্ত অনিচ্ছায়ও যেন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। যাদের মা-বোনেরা এখনও বাড়ি ফিরে যায় নি তারা যেন অস্বস্তিবোধ করছিল, কি ভীষণ প্রয়োজনে তারা যাচ্ছে—অথ ওরা কিনা বাচ্চা ছেলের মতো মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছে! আমাদের উপস্থিতি শুরাকে বিরক্ত করবে ভেবে আমি আর জয়া গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চে একটু দূরে বসে রইলাম।

প্রায় চারটার সময় কয়েকটা খালি ট্রাম এসে দাঁড়াল চত্বরে। তাড়াতাড়ি খুব সোরগোল করতে করতে ছেলেরা আপন জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রামে উঠতে লাগল। মায়ের কাছ থেকে যারা বিদায় নিচ্ছিল, তাদের বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ, আমি আমাদের শেষ মুহূর্তকটি কেঁদে নষ্ট করতে চাই নি, বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে শুরার হাতদুটোতে জোরে চাপ দিলাম, মনের ব্যথা লুকাতে চাইলেও শুরা যে কি রকম অভিভূত হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

"আমাদের গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো না তোমরা, জয়া মাকে

দেখো।" বলতে বলতে শুরো লাফিয়ে গাড়িতে উঠল—জানালা দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে যেন বলতে চাইল—"তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না।"

কিন্তু শুরাকে সেখানে রেখে চলে যেতে আমাদের মন সরছিল না, দূর থেকে আমরা ট্রামের কম্পন, আওয়াজ আর ঘর্ঘর শব্দ করে যাত্রা করতে দেখলাম। শেষ ট্রামটা আমাদের চোখের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা জায়গা থেকে নড়তে পারলাম না।

যে পার্কে এত শব্দ এত কোলাহল ছিল, তা যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, বিশাল ওকগাছগুলির তলায় বেঞ্চ পাতা, তাতে কেউ বসে নি, হাসির শব্দ বা দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ নেই, সব নির্জন—নীরব...

আমরা ধীরে ধীরে গলিপথ ধরলাম, ওপরের ঘন পাতার আড়াল দিয়ে সূর্যের কয়েকটি রশ্মি উঁকি দিচ্ছিল। নিজের নিজের ব্যথাভারে বিব্রত আমরা পুকুরের পাশে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

হঠাৎ জয়া বলে উঠল—"কি চমৎকার! জানো মা ছবি আঁকবার জন্য শুরা প্রায়ই এখানে এসে বসত, ঐ ছোট্ট পুলটা শুরা এঁকে রেখেছে।"

আমাকে সম্বোধন করে বললেও মনে হচ্ছে জয়া যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা বলছে—শান্তস্বরে, ধীরে ধীরে ভাবুকের মতো মনে করে বলতে লাগল—"বেশ চওড়া খালটা—তবুও কিন্তু কতবার যে সাঁতরে পার হয়েছে তার ঠিক নাই! জানো মা একবার কি হয়েছিল, অনেকদিন আগের কথা, শুরার বয়স মাত্র বারো বছর তখন। যেমন সে বরাবর করে, বসন্তকালে অন্যদের চেয়ে অনেক আগে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিল। জল ছিল ভয়ানক ঠাণ্ডা, হঠাৎ তার পায়ে ধরল খিল, পারের কাছে আসতে তখনও অনেক দেরি। একপায়ে সাঁতরাতে লাগল, অন্যরা তো ভয়ে বোবা হয়ে গেল একদম। কোনমতে ও পারে এসে উঠল, তোমাকে যাতে না বলে দিই শুরা আমাকে অনেক করে বলেছিল, তখন আর বলি নি। এখন তো আর বলতে কোন বাধা নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আর পরের দিন আবার গিয়ে জলে নামল...না?"

"নিশ্চয়ই, ও তো সকাল-সন্ধ্যায় সাঁতরাত, শীত না আসা পর্যন্ত বৃষ্টি-বাদলেও ও থামত না। আর ঐ যে ঝোপটার পাশে শীতকালে সব সময়ই বরফের চাঁইয়ের ভিতরও গর্ত আছে একটা, মনে আছে মা? আমরা মাছ ধরতাম ওখানে, প্রথমে টিন দিয়ে, পরে জাল দিয়ে। মনে আছে তোমাকে কি রকম মাছভাজা খাইয়েছিলাম?"

জবাব দেবার জন্য ওর রোদেপোড়া হাতের উপর চাপ দিতে দিতে আমি বললাম—"লক্ষ্মী মেয়ে।"

হঠাৎ আমার হাতের তলায় জয়ার হাতের শক্ত সরু আঙুলগুলো মুঠো হয়ে পাকিয়ে এল,—

"লক্ষ্মী মেয়ে! কি রকম ভালো মেয়ে বল দেখি?" লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়া। এতক্ষণ ধরে কি দুঃসহ বেদনায় জয়ার অন্তর জ্বলছিল তা সেমুহূর্তে আমি বুঝে ফেললাম—"পড়ে রইলাম পিছনে, কি করে কাজের হলাম শুনি? ছেলেরা গেল যুদ্ধ করতেই বোধহয়, আমি কিছু না করে কি করে থাকি?"

"প্রিয় বন্ধুগণ, আমার বাণী তোমাদেরই লক্ষ্য করে বলছি"

"মা মা তাড়াতাড়ি, ওঠ!"

আমি চোখ খুললাম, আমার সামনে খালি পায়ে কাঁধে একটা তোয়ালে জড়িয়ে জয়া দাঁড়িয়ে আছে।

আমার ভীতিবিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে জয়া বলল—"কিছু বিপদ হয় নি, কমরেড স্তালিন বেতার বক্তৃতা করবেন—শীগ্‌গির—ঐ শোন..."

লাউডস্পীকারে মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দের পরই নিস্তব্ধ—তারপর হঠাৎ শোনা গেল—

"বন্ধুগণ! দেশবাসীগণ! ভাইবোনেরা! আমাদের বিমান ও সৈন্য-বাহিনীর লোকেরা! হে প্রিয় বন্ধুগণ, আমার এই কথাগুলো তোমাদের সম্বোধন করেই বলছি...।"

আমরা সবকিছু ভুলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। জয়া কঠিন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুঠি তার দৃঢ়বদ্ধ, চোখের দৃষ্টি রেডিওর উপর নিবন্ধ, মনে হচ্ছে যেন ঐ যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে সে বক্তাকে দেখতে পাচ্ছে—তাঁর সুসংযত বেদনা, প্রেম আর বিশ্বাস, শক্তি আর বিরাগ সবই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে জয়ার কাছে।

"আমাদের স্বদেশ সব চেয়ে হীন, সব চেয়ে ধূর্ত শত্রুর কবলে পড়েছে, জার্মান ফ্যাসিস্টদের মৃত্যুবেষ্টনীতে আক্রান্ত, শত্রুপক্ষ নির্মম, দুর্ধর্ষ...।"

আমাদের নেতা জার্মান শত্রুদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন, তাদের উদ্দেশ্য আমাদের মাতৃভূমিকে দখল করে, আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল গ্রাস করে জমিদারী-শাসন কায়েম করা, সোভিয়েত দেশের স্বাধীন মুক্ত মানুষকে জার্মান শাসনাধীন করা,...

তিনি বললেন—"কাজেই এখন জীবন মরণের প্রশ্ন, সোভিয়েত রাষ্ট্র-সমূহের মরণ-বাঁচনের সমস্যা, সোভিয়েত দেশের মানুষ মুক্ত হবে, না দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে—সোভিয়েতের মানুষকে এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—আমাদের সব কাজই যুদ্ধের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনের কাছে আর সব প্রয়োজনকেই খর্ব করতে হবে—লালফৌজ, লাল নৌ-বাহিনীর প্রত্যেককেই সোভিয়েতভূমির প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে রক্ষা করতে হবে—আমাদের গ্রাম শহরকে বাঁচাবার জন্য শেষ রক্তবিন্দুটি থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে... ।"

আমাদের নেতা আরও বললেন—"শত্রু-অধ্যুষিত জেলায় জেলায় গেরিলা-বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, শত্রুকবলিত আমাদের দেশের মাটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে হবে—"

তাঁর শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করল। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি সোভিয়েত দেশবাসীর কাছে কি বিশ্বাস নিয়ে এল! তিনি আরও বলেছেন এটা কেবলমাত্র দুই শত্রুদলের মধ্যে সাধারণ একটা যুদ্ধ নয়, আমাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন কেবলমাত্র আমাদের দেশের ভাবী বিপদকেই দূর করা নয়, জার্মান ফ্যাসিস্ট-কবলগ্রস্ত গোটা ইউরোপের দেশ-গুলিকে সাহায্য করাও আমাদের কাজ হবে।

বেতারযন্ত্র নীরব হয়ে যাবার পরও আমরা নড়লাম না, একটাও কথা বললাম না, যেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের মনের ভাবটাকে একবিন্দুও নষ্ট করতে চাই নি।

যাঁকে আমরা আমাদেরই একজন, আমাদের বুদ্ধিদাতা বলে মনে করি, তিনিই এইমাত্র আমাদের কাছে বক্তৃতা করলেন, সব বিষয়ে, সব কাজেই আমরা তাঁর উপর নির্ভর করি। আমরা জানি তিনি যা যা বললেন সবই নিতান্ত প্রয়োজনীয়, আর তাঁর এই অনুরোধ আমাদের প্রত্যেকেরই কাছে। আমাদের মাতৃভূমিকে কি বিপদ এসে ঘিরেছে, কি করে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের শক্তিকে এক উপায়ে অনুভব করালেন তিনি, মুক্তিকামী একতাবদ্ধ জনতার শক্তিতে তিনি জানালেন আস্থা–

আমি বললাম—"ভাবছি শুরা শুনেছে কিনা..."

জয়া স্থিরবিশ্বাসের সুরে বলল—"সারা দেশজুড়ে সকলেই শুনেছে তাঁর বাণী, চুপি চুপি প্রগাঢ় অনুভূতি মাখানো সুরে বলল জয়া—"প্রিয় বন্ধুগণ— আমার এই কথাগুলো তোমাদেরই লক্ষ্য করে বলছি!"

প্রথম বোমা

জয়া আর আমি টেবিলের কাছে বসেছিলাম, আমাদের সামনে পড়েছিল এক টুকরো মোটা সবুজ কাপড়, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য আমরা ব্যাগ তৈরি করছি, সৈন্যদের জন্য কলারও তৈরি করছি, হয়ত কাজটা খুব সাধারণ, সাংঘাতিক কিছু প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে কিন্তু রণক্ষেত্রের জন্য কিছু করছি আমরা আর এমন একজনের প্রয়োজনে এগুলো লাগবে, যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করবার জন্য লড়ছে। ব্যাগটাও সৈন্যদের জন্য। জিনিসপত্র রাখবে সৈন্যরা তার মধ্যে, ওদের প্রয়োজনে লাগবে, মার্চ করবার সময় কাজে লাগবে জিনিসটা...

আমরা না থেমে নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলাম, কখনও কখনও আমি সেলাই নামিয়ে রেখে পিঠটা সোজা করে নিচ্ছিলাম। একটু ব্যথা হয় পিঠে, জয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি। তার সরু সরু রোদে-পোড়া আঙুলগুলো ক্লান্তিহীন, কাজগুলো যেন শুষে নিচ্ছে। তার নিজের অংশের কাজটা করতে পারছে এই ভেবে যদি তার তীব্র অন্তর্দাহ কিছুটা নাও কমে থাকে তবু কতকটা শান্ত বোধ করবে। তার বাইরের চেহারারও সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। তার চোখগুলো আর আগের মতো বিষণ্ণ, অন্ধকার নয়, বরং মাঝে মাঝে সামান্য হাসির ঝিলিক খেলে যায়।

একদিন আমরা এমনি করে বসে সেলাই করছি। দরজাটা খুলে গেল, শুরা এসে উপস্থিত। আশ্চর্য রকম শান্ত চেহারা শুরার, যেন এইমাত্র স্কুল থেকে এল।

ও শ্রমিকবাহিনীর কাজের ক্ষেত্রে গিয়েছিল তা আমরা জানতাম, কিন্তু ও ফিরে এলেও, যাবার সময়ও যেমন এখনও তেমনি, আমাদের কিছুই বলল না।

আমরা ওকে প্রশ্ন করতে যেতেই ও দৃঢ়ভাবে বলল—"তোমাদের কাছে এসেছি এই তো যথেষ্ট। বলবার তো বিশেষ কিছু নেইও, অনেক কাজ করেছি

আমরা...ব্যস্...।" চোখদুটো ধূর্তের মতো ঘুরিয়ে বলল—"আমার জন্মদিন পালন করতে এলাম বাড়িতে, আশা করি তোমরা ২৭শে জুলাই তারিখটা ভুলে যাও নি, ষোল বছর বয়স হবে আমার এবার।"

হাত-পা ধুয়ে টেবিলের কাছে এসে বসে জয়াকে বলল—"তোমাতে আমাতে মিলে কি করতে পারি জান? বোরেট ওয়ার্কশপে গিয়ে কুন্দকার মিস্ত্রী হবার জন্য শিক্ষানবিশী করতে পারি। কি বল?"

জয়া সেলাই নামিয়ে রেখে ভাইয়ের মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর আবার তার কাজটা হাতে তুলে নিয়ে বলল—"বেশ, সত্যিকারের কিছু একটা করা হবে তাহলে।" ২২শে জুলাই শুরা ফিরে এসেছিল, সে-রাত্রেই মস্কোতে শত্রুবিমানের প্রথম আক্রমণ হয়। প্রথম রাজধানীর মাটিতে জার্মান বোমা পড়ে। শুরা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে লাগল—সমস্ত স্ত্রীলোক আর শিশুদের আশ্রয়স্থলে পাঠানোর ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে অভিযোগের সুরে বলল—"শুধু আমার বাড়ির মেয়েদেরই আমি পাঠাতে পারছি না।" বিমান আক্রমণের সময় সারাক্ষণই শুরা ছিল রাস্তায়, জয়া একবারও তার পাশ ছেড়ে যায় নি।

সে-রাত্রে আমরা ঘুমাতে পারলাম না, সকালবেলা আমাদের বাড়ির আশে-পাশে গুজব ছড়াল স্কুলের উপর বোমা পড়েছে।

জয়া আর শুরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"২০১নং স্কুল?" আমি কিছু বলবার আগেই ওরা লাফিয়ে উঠে স্কুলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। আমিও আর ঘরে থাকতে পারলাম না, আমরা নীরবে রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। ওদের সংগে আমি তাল রাখতে পারছিলাম না, দূর থেকে স্কুলবাড়িটি নজরে পড়ার পর আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে গোটা বাড়িটি।

কিন্তু কাছে এসে দেখলাম, রাস্তায় বোমা পড়ার দরুন আঘাতের কম্পনে জানালার সমস্ত কাঁচ উড়ে গিয়েছে, সর্বত্র ভাঙা কাঁচের ছড়াছড়ি। জ্বল-জ্বল-করা কাঁচের টুকরো আমাদের পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। বিরাট বাড়িটির সর্বত্র কেমন যেন অসহায় ভাবের ছায়া, যেন শক্তসমর্থ জোয়ান একটি লোকের হঠাৎ চোখদুটো অন্ধ হয়ে গেছে। নিজেদের অজানিতে আমরা থামলাম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে বারান্দা দিয়ে চলতে লাগলাম। মাত্র একমাস আগে বিদায়ী ছাত্রদের সম্বর্ধনা নাচের সন্ধ্যায় কি চেহারা দেখে গিয়েছি। তখন গান আর আহ্লাদে, সংগীতে হাস্যরোলে মুখরিত ঐ বাড়ির প্রতিটি কোণ এখন কাঁচের টুকরো, প্লাস্টারে ঠাসা, দরজাগুলো কব্জা থেকে খুলে এসেছে—সে এক করুণ বীভৎস দৃশ্য।

উঁচু ক্লাশের আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হতেই শুরা তাদের সঙ্গে ছুটল, বোধহয় মাটির নিচের ঘরের দিকে, যন্ত্রচালিতের মতো আমি জয়াকে অনুসরণ করে লাইব্রেরির দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। শূন্য তাকগুলো দেয়ালের পাশে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে—বিশাল এক শকুনির থাবার মতো বোমার গর্জন বইগুলি ধরে টান মেরেছে, আর তারা অসহায়ভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে, টেবিলে, সর্বত্র। এই অরাজকতার মধ্য থেকে ইচ্ছা করলেই যে-কেউ ফিকে হলুদ কাপড়ে বাঁধান পুশকিন-এর "একাডেমিয়া"খানা, কি নীল মলাটওয়ালা চেকভ-এর গ্রন্থাবলীখানা তুলে নিতে পারে...আমি তো আর একটু হলেই তুর্গেনিভ-এর বিরাট এক ভল্যুম-এর উপর পা দিয়ে ফেলেছিলাম, নীচু

হয়ে সেটা তুলতে গিয়ে দেখলাম পাশে ধুলো আর পলেস্তারার ভিতর থেকে উঁকি মারছে শীলারের একখণ্ড গ্রন্থাবলী—একটা বিরাট বই-এর খোলা পাতার ভিতর থেকে অবাক হয়ে ডন কুইক্সোটের একটি ছবি তাকিয়ে দেখছে—হয়ত ভাবছে কি ব্যাপার!

ভাঙাচোরা স্তূপের মাঝখানে একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক বসে কাঁদছিল, জয়া নীচু হয়ে তাকে বলল, "মারিয়া গ্রিগোরিয়েভ্না, উঠুন, কাঁদবেন না।" তার নিজের ঠোঁটদুটো বিষণ্ণ, ফ্যাকাশে।

অনেক বারই লাইব্রেরি থেকে নতুন কোন চিত্তাকর্ষক বই নিয়ে বাড়ি এসে জয়া আমাকে তাদের লাইব্রেরিয়ানের কথা বলত, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন বই-এর সেবায়, বই তিনি চেনেন, বই তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যে-বইগুলো অতি সাবধানে, অতি আদরের সঙ্গে নাড়াচাড়া করতেন সেই তারাই চারদিকে ছড়িয়ে, ছিন্নভিন্ন হয়ে এলোমেলো হয়ে পড়েছে আর তারই মধ্যে মেঝের উপর তিনি বসে আছেন—।

মারিয়া গ্রিগোরিয়েভ্নাকে দাঁড়াতে সাহায্য করতে করতে জয়া বেশ জোর দিয়ে বলল—"আসুন আমরা সব তুলে গুছিয়ে রাখি।"

আমি আবার নীচু হয়ে বই তুলতে লাগলাম।

হঠাৎ শুনলাম—"মা দেখ দেখ"—

অবাক হয়ে আমি মাথাটা ঘুরিয়ে নিলাম। অশ্রুপ্লাবিত মুখে মারিয়া গ্রিগোরিয়েভ্নাও বইয়ের মাঝে মাঝে পা দিতে দিতে এলেন আমাদের কাছে। জয়ার কণ্ঠস্বর বিজয়ী বীরের মতো সোল্লাস বিস্ময়ে ভরপুর। পুশকিনের একখানি খোলা বই তুলে ধরল আমাদের সামনে।

তখনো সেই বিস্ময়, আনন্দ আর বিজয়-মিশ্রিত অপূর্ব সুরে জয়া বলল—"দেখ"।

হাতের তীব্র আন্দোলনে ধুলো ঝেড়ে নিল লাইনক'টার উপর থেকে, পড়লাম—

> হে পবিত্র সূর্য, রশ্মি বিকীরণ কর।
> স্বল্পায়ু দীপশিখা হয় যেমন নিষ্প্রভ
> প্রত্যুষের নবাগত কিরণপরশে,
> কপট জ্ঞানালোক শিখা হয়
> গভীর চিন্তাস্পর্শে দূরে ধাবমান্,
> স্বাগত হে অরুণদেব, তমোরাশি দূরে যাক্।

"রণক্ষেত্রের জন্য কি করেছ"?

২৭শে জুলাই তার ষোড়শ জন্মবার্ষিকীতে শুরা ঘোষণা করল—"মা এবার তুমি দুটো কুন্দামিস্ত্রীর জননী হয়েছ।"

ভোর হবার আগে ঘুম থেকে উঠে কাজে যায় ওরা দুজনে, আর রাত্রে ফিরে আসে, তবুও কখনও বলে না যে, আমরা ক্লান্ত। রাত্রের ডিউটি থেকে ফিরে

এসে ওরা তক্ষুণি শুতে যায় না। বাড়ি ফিরে এসে আমি দেখতে পাই ঘর দরজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ওরা ঘুমে অচেতন।

মস্কোতে বিমান আক্রমণ চলতেই থাকল। সন্ধ্যার দিকে শুনতে পেতাম ঘোষকের শান্ত কণ্ঠ—'সাবধান, শুনুন সবাই, বিমান আক্রমণের প্রস্তুতি।' সঙ্গে সঙ্গেই সাইরেনের চিৎকার আর এঞ্জিন-কারখানার তীব্র বাঁশীর শব্দ।

জয়া আর শুরা একবারও যদি আশ্রয়স্থলে যেত! তাদের সহকর্মী, গ্লেব এরমোশকিন, ভানিয়া স্কোরোদুমভ, আর ভানিয়া সেরোভ—তিনজনই বেশ শক্তসমর্থ চেহারার তরুণ, তারা আসত আর সকলে মিলে ছাতের চিলেকোঠা থেকে চারদিকে নজর রাখত। ছোটরা, বড়োরা সবাই এই নতুন বিভীষিকাময় ঘটনা যা তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না।

শরৎকালে উঁচু ক্লাশের ছাত্রেরা—তার মধ্যে জয়াও ছিল, স্বেচ্ছাশ্রম-উদ্যোগের ক্ষেত্রে গেল, একটা সরকারী ক্ষেতের আলু তুলতে হবে তাড়াতাড়ি, না হলে শিশির পড়ে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে,—এর মধ্যেই কয়েকবার তুষারপাত হয়ে গিয়েছে, জয়ার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার ভাবনা হলো। কিন্তু বাইরে যেতে পারায় ও খুব খুশি হলো। জয়া সঙ্গে নিল একপ্রস্ত সুতীর জামা, সাদা নোটবই একখানা আর কয়েকখানা বই।

কয়দিন পরে ওর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, তারপরে আরও একটা।

"ফসল তুলতে আমরা সাহায্য করছি। ১০০ কিলোগ্রাম দৈনিক তোলার পরিমাণ। ২রা অক্টোবর আমি ৮০ কিলোগ্রাম তুলেছি, মোটেই যথেষ্ট নয়, আমি ১০০ কিলোগ্রাম তুলবই।

"কেমন আছ তুমি? তোমার কথা ভেবে আমি একটু চিন্তিত আছি, বাড়ির জন্য আমার খুব মন কেমন করে। শীগ্‌গিরই আমি ফিরে যাব—এই আলু তোলা শেষ হয়ে গেলেই।

"মা, আমার গ্যালোশ দুটো ছিঁড়ে গিয়েছে। কাজটা বড়ো ময়লা, আর সহজ নয় মোটেই। ভেবো না কিন্তু। নিরাপদে আর সুস্থদেহেই ফিরে আসছি আমি।

"তোমার কথা খালি মনে পড়ছে, আর ভাবছি : আমি তোমার মতো নই মোটেই, তোমার মতন আমার ধৈর্য নেই। ভালোবাসা নিও—জয়া।"

চিঠিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম, শেষ কথাগুলো বিশেষ ভাবিয়ে তুলল। কি আছে এর পেছনে? কেন জয়া হঠাৎ ধৈর্যের অভাব বলে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে? এর ভিতরে আরও কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই। সন্ধ্যা-বেলা শুরা চিঠিটা পড়ে যেন জানে এমনিভাবে বলল—"বুঝতে পেরেছি, অন্য-দের সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে পারছে না। ও প্রায়ই বলত তোমার ধৈর্যের অভাব আছে ওর মধ্যে, মানুষের প্রতি ওর সহনশীলতা নেই। ও বলত, লোকের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা থাকা চাই, প্রথমেই রেগে ওঠা উচিত নয়, আমি এ রকম করে উঠতে পারি না।"

একবার পোস্টকার্ডে জয়া লিখেছিল—"তোমাকে যার কথা বলেছিলাম, সেই নীনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে।" আমি ভাবলাম—ভেরা সার্জিয়েভনা ঠিকই বলেছিলেন।

অক্টোবরের শেষে এক সন্ধ্যায় আমি অন্যাদিনের চেয়ে একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলাম, দরজাটা খুলতে আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠল—জয়া আর শুরা দুজনে টেবিলের ধারে বসে আছে। অবশেষে আমার ছেলেমেয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে, আবার আমরা সবাই একত্র হয়েছি।

জয়া দৌড়ে দরজার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

শুরা যেন আমার মনের কথা জেনে ফেলে বলল—"আবার আমরা মিলেছি।"

আমরা একসঙ্গে চা খেতে বসলাম, জয়া সরকারী ক্ষেত সম্বন্ধে গল্প বলতে লাগল। ওর চিঠির অদ্ভুত কথাগুলোর মানে জিজ্ঞেস করার আগেই ও আমাকে এইসব বলতে লাগল—

"বড়ো শক্ত কাজ, জল, কাদা, বর্ষার জুতো কাদায় ডুবে যায়, পায়ে ঘা হয়ে গেল, চেয়ে দেখি তিনটি ছেলে আমার চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ করে যাচ্ছে। একই জায়গায় আমি বারেবারে খুঁড়ছি আর ওরা তাড়াতাড়ি শেষ করে চলে যাচ্ছে। তখন আমি ঠিক করলাম দেখতে হবে ব্যাপারখানা কি? আমি ওদের কাছ থেকে সরে গেলাম, নিজে এক টুকরো জমি নিয়ে কাজ করতে লাগলাম। ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলল—। আমি বললাম--হয়ত আমি সত্যিই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, কিন্তু তোমরা ঠিক সাধুভাবে কাজ কর না। জান কি হচ্ছিল ঃ ওরা কেবল উপরের দিকের আলুগুলো তুলছিল, তাতে ওদের কাজ অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছিল কিন্তু মাটির নীচে অনেক আলু পড়ে থাকছিল, অথচ মাটির অনেক নীচে যে আলুগুলো থাকে সেগুলো অনেক বড়ো আর ভালো। আমি খুঁড়ছিলাম গভীর করে, যাতে কিছুই নীচে না পড়ে থাকে। আর তাই আমি তাদের বলছিলাম ওরা ভালো করে কাজ করছে না। ওরা আমাকে বলল—"তুমি আগে বললে না কেন? চলে এলে কেন?" আমি বললাম—"আমি নিজেকে পরীক্ষা করছিলাম।" ওরা বলল—"আমাদের তোমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল, তক্ষুনি বলা উচিত ছিল..." আর নীনা বলল—"তুমি ভুল করেছ।" মেলা গোলমাল তর্কাতর্কি হলো। জয়া বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে তারপর শান্তস্বরে বলল—"জান মা, আমি তখন বুঝলাম, ঠিকমতো কাজ করলেও আমার বুদ্ধির অভাব ছিল। ছেলেদের সঙ্গে আগে আলাপ-আলোচনা করে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, সেই মুহূর্তেই আমার চলে আসা উচিত হয় নি।"

শুরা আমার দিকে একবার তাকাল, সে-চোখে ইঙ্গিত ছিল, "আমি তোমায় বলেছিলাম।"

প্রতিদিনই মস্কোর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগল, বাড়িগুলো ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন করতে লাগল, রাস্তা দিয়ে সৈন্যবাহিনী টহল দিতে লাগল, তাদের মুখের চেহারা দেখার মতন, শক্ত আঁটা ঠোঁট, কোঁচকানো ভুরুর নীচে তীক্ষ্ন গভীর দৃষ্টি। অটুট অধ্যবসায়, সক্রোধ জাগ্রত সংকল্প আঁকা ছিল তাদের মুখে চোখে।

রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স ছুটে বেড়ায়, ট্যাংক চলে যায় ঘর্ঘর শব্দ করে।

সন্ধ্যার নিকষকালো অন্ধকারে পথিককে পথ চলতে হয় কারোর জানালা দিয়ে গলে-আসা নিষ্প্রভ আলোয়, না হয় রাস্তার মৃদু আলোতে, কিংবা কোন

দ্রুত ধাবমান মোটরগাড়ির চকিত আলোকে, সে-চলাও খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়, তেমনি দ্রুততালে, যাদের মুখ দেখা যায় না তারাও হেঁটে যায়। বিমান আক্রমণের সাবধানবাণী, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী, আকাশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গকারী তীক্ষ্ন শব্দ, অন্ধকার বিদীর্ণ করে সন্ধানী আলোর বিজলীরেখা, দূরবর্তী আলোর বেগুনী রশ্মিতে জ্বলে-ওঠা আকাশ সবই কেমন যেন অস্বাভাবিক।

সময়টা মোটেই স্বাভাবিক নয়, শত্রুপক্ষ মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে।

একদিন জয়া আর আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির দেয়ালে একটি সৈন্যের ছবি দেখতে পেলাম। সৈন্যটি তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, সুতীক্ষ্ন মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দেখছে আর নীচে লেখা আছে—"আপনি যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কি করেছেন—"কথাগুলোর এমনি শক্তি যেন মনে হলো আমাদের কানের কাছে ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল।

জয়া ঘুরে দাঁড়াল। তিক্তস্বরে বলল, "এমনি শান্তভাবে আমি ছবিটার কথাগুলো এড়িয়ে যেতে পারছি না।"

"তুমি তো এখনও অনেক ছোট। তাছাড়া তুমি তো শ্রম এলাকায় গিয়েছিলে —তাও তো দেশের কাজ, সৈন্যবাহিনীরই কাজ।"

তবুও আবার বলল জয়া—"তা যথেষ্ট নয়।"

কয়েক মিনিট আমরা নিঃশব্দে চললাম—আর হঠাৎ জয়া সম্পূর্ণ আলাদা ধরনে, আনন্দের সঙ্গে বলল—"আমার ভাগ্য ভালো, আমি যা যা চাই সবই সত্যে পরিণত হয়।"

জিজ্ঞেস করতে চাইলাম—"কি ভেবে একথা বলছ?" থেমে গেলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভেবে আমার হৃদয় কেঁপে উঠল।

বিদায়, জয়া

জয়া বলল—"মা, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আমি নার্সিং শিখতে যাব।"

"আর কারখানার কি হবে?"

"ওরা আমাকে যেতে দেবে! এটা যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য। নয় কি?"

দু'দিনের মধ্যেই দরকারী দলিলপত্র তৈরি হয়ে এল। এখন সে বেশ প্রাণবন্ত, আনন্দমুখর, নিজের ভবিষ্যতের কল্পনা ঠিক হয়ে গেলে পর সে সব সময়ই এরকম হতো।

ইতিমধ্যে আমরা দুজনে ব্যাগ, দস্তানা, শিরস্ত্রাণ এইসব সেলাই করে-ছিলাম। বিমান আক্রমণের সময় বাড়ির ছাদে চিলেকোঠায় ও সব সময়ই নজর রাখত, শুরা কয়েকটা আগুনে বোমা কারখানা থেকে বার করেছে বলে শুরার উপর ওর রীতিমতো হিংসা হতো।

জয়া নতুন শিক্ষা নেবার আগের দিন খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ফিরল না। ওকে বাদ দিয়েই আমরা খাওয়া শেষ করলাম।

আমার ছেলে আজকাল রাত্রের পালায় কাজ করছে, বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় ও আমায় যেন কি বলল আমি শুনতেও পেলাম না। কি এক ভয়াবহ উদ্বেগ হঠাৎ আমাকে পেয়ে বসেছিল, কিছুতেই তার হাত থেকে আমি মুক্তি পাচ্ছি না।

শুরা তিরস্কারের সুরে বলল—"মা তুমি শুনছ না মোটে!"

"আমি দুঃখিত, শুরা, জয়া যে কোথায় গিয়েছে কিছুতেই বুঝতে পারছি না বলে আমি মন দিতে পারছি না।"

ও চলে গেল। আমি দরজা জানালার আলোগুলো ভালো করে ঢাকা আছে কিনা দেখে আবার এসে টেবিলের কাছে বসে রইলাম। কিছু কাজ করতে পারছি না, শুধু অপেক্ষাই করে রইলাম।

জয়া রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ফিরে এল, ওর গালদুটো লাল হয়ে উঠেছে। কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—"মা ভারী গোপন কথা। শত্রু-এলাকায় তাদের পিছনে যেতে হবে আমাকে। কাউকে বোলো না, শুরাকেও না। বলে দিও আমি গ্রামে দাদুকে দেখতে গিয়েছি।"

আমি নীরবে চোখের জল অনেক কষ্টে চেপে রাখলাম। কিন্তু কিছু বলতে হবে, জয়া যে উজ্জ্বল, আশাভরা আনন্দভরা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

শেষ পর্যন্ত বললাম—"তোমার কি এত শক্তি আছে, তুমি তো আর ছেলে নও।"

বইয়ের তাকের কাছে সরে গেল জয়া, সেখান থেকে তীক্ষ্ন সোজা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল আমাকে।

চেপে রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে "তোমাকে কেন যেতে হবে? ওরা যদি এখন তোমাকে ডেকে থাকে..."

জয়া আমার কাছে ফিরে এসে আমার হাতদুটো ধরে বলল—"শোন মা, আমি নিশ্চিত জানি, যদি সম্ভব হতো তাহলে তুমিও আমি যা করছি তাই করতে, আমি এখানে থাকতে পারি না, পারছি না কিছুতেই।" ধীরে ধীরে আরও বলল—"তুমিই তো বলেছ মানুষকে সাহসী, সৎ হতে হবে জীবনে। শত্রুসৈন্য এত কাছে এসে পড়েছে আমি এ ছাড়া আর কি করতে পারতাম। ওরা যদি এখানে আসত তাহলে আমার বেঁচে থাকাটাই অসহ্য হয়ে উঠত।... আমাকে তো তুমি জান, আমার আর কোন পথ নেই।"

আমি জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে আবার বেশ সহজ গলায় বলল—

"দু'দিনের মধ্যেই আমি চলে যাব। আমাকে একটা লালফৌজের ম্যাপের বাক্স, আর আমাদের একটা রসদ রাখবার থলে দিও। আর একপ্রস্থ সুতীর পোশাক, একটা তোয়ালে, সাবান টুথব্রাশ, পেন্সিল, কাগজ, ব্যস্, আর কিছু চাই না। বাকিটা আমিই চালিয়ে নিতে পারব।"

জয়া শুতে গেল, আমি ঘুমোতে বা পড়তে পারব না জেনে চুপ করে টেবিলের পাশেই বসে রইলাম। এই কাজের থেকে এখন সে আর পিছিয়ে আসতে পারে না, তা আমি জানি, কিন্তু এর পরিণতি কোথায়? এত ছোট মেয়ে...

ছোট মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে আমাকে কখনও কথা খুঁজতে হয় নি,

আমরা পরস্পরের মনের ভাব বেশ ভালো বুঝতে পারতাম, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যেন খাড়া দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছি উপরে বেয়ে উঠার শক্তি নেই! হায়, যদি আজ এনাতোলি পেত্রোভিচ বেঁচে থাকতেন...

কিন্তু না, যাই বলি না কেন, সবই ব্যর্থ হতো। না আমি, না তার পিতা, যদি তিনি বেঁচেও থাকতেন তাতে তার স্থিরসিদ্ধান্ত থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন।

পরের দিন এই সপ্তাহে এই প্রথম শুরা সকালের পালায় কাজ করতে গেল। ক্লান্ত, বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ও ফিরে এল, ক্ষিধে না থাকায় কোন রকমে একটু কিছু মুখে দিল মাত্র।

ও বলল—"জয়া কি সত্যিই আস্পেন বনে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলেছে?"

আমি সংক্ষেপে বললাম—"হ্যাঁ"।

শুরা চিন্তিত সুরে বলল—"বেশ, চলে যাওয়াটা ওর পক্ষে ভালোই হলো, ওর বয়সী মেয়েদের পক্ষে মস্কো এখন আর প্রশস্ত জায়গা নয়।"

ওর গলায় অনিশ্চিতের সুর—একটু থেমে আবার বলল—"হয়ত একদিন তুমিও যাবে। ওখানটা তোমার কাছে নির্জন, নীরব মনে হবে।"

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম। শুরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টেবিলের পাশ থেকে উঠে পড়ল হঠাৎ, বলল—"আমি শুতে যাই। আজ যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

আমি খবরের কাগজ দিয়ে আলোটা ঢাকা দিলাম, শুরা ততক্ষণ নীরবে শুয়ে রইল, মনে হলো ভয়ানকভাবে কিছু ভাবছে, তারপর দেয়ালের দিকে ফিরে শীগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়ল।

জয়া দেরি করে ফিরে এল।

শান্তস্বরে চুপি চুপি বলল সে—"আমি জানতাম তুমি জেগে থাকবে। আমি কাল চলে যাব।" আঘাতটা সইবার মতো করার জন্যই যেন সে আমার হাতে হাত বুলোতে লাগল।

জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে নেবার জন্য সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিল, আমিও নীরবে ওকে সাহায্য করলাম। এই গোছানো খুবই সোজা, সাদা-সিধা ব্যাপার- একটু জায়গা করে এখানে ওখানে এক টুকরো সাবান কি এক জোড়া বাড়তি মোজা ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজ আর কি। তা হলেও এই-ই আমাদের একত্রে থাকার শেষ সময়টুকু। আমরা কি অনেকদিনের মতো বিদায় নিচ্ছি? বিপদ এবং কষ্ট, যা পুরুষ মানুষ এমন-কি সৈন্যদেরও পক্ষেও কঠোর, তাই কি অপেক্ষা করে আছে আমার জয়ার জন্য? আমার কথা বন্ধ হয়ে আসছে, কাঁদবার আমার অধিকার নাই, তা জানি, কিন্তু সারাক্ষণই কান্নায় আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছে। কি যেন একটা আটকে আছে গলায়।

জয়া বলল—"এই যে ব্যস্, এই-ই সব মনে হচ্ছে।" তারপর ড্রয়ারটা খুলে তার ডায়েরীখানা বার করে ব্যাগে পুরতে গেল—

আমি কষ্টেসৃষ্টে বললাম—"ওটা নেওয়া উচিত নয়।"

"ঠিকই বলেছ তুমি।"

আমি কিছু বলবার আগেই জয়া স্টোভের কাছে গিয়ে নোটবইটা আগুনে ফেলে দিল।

তারপর একটা নীচু বেঞ্চে বসে চাপাগলায় বাচ্চা ছেলেদের মতো আবদার-মাখা সুরে বলল—"আমার কাছে এসে বস।"

আমি ওর পাশে বসলাম, অনেক বছর আগের মতো আমরা দুইজনে আগুনের শিখার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। কিন্তু তখন আমি জয়া আর শুরাকে গল্প শোনাতাম, আর ওরা আগুনের আঁচে লাল হয়ে-ওঠা মুখ নিয়ে বসে শুনত। 'এখন আমি নীরব, আমি জানি একটি কথাও উচ্চারণ করার আমার ক্ষমতা নেই।

জয়া ঘুরে ঘুমন্ত শুরার দিকে একবার নজর দিয়ে খুব নীচু গলায়, যেন আমিও ভালো শুনতে পাচ্ছি না, এমনি করে বলতে লাগল—"কি করে এটা ঘটল তোমাকে বলছি শোন—তুমি শুধু কারোকে বলতে পারবে না, শুরাকেও না। আমি রণক্ষেত্রে যেতে চাই বলে জেলা যুবসমিতির কাছে একটা দরখাস্ত পাঠাই। জান এরকম কত দরখাস্ত ওরা পেয়েছে? হাজার হাজার। আমি যখন জবাব আনতে গেলাম ওরা আমাকে বলল—'কমসোমল-এর মস্কো কমিটির সেক্রেটারির কাছে যাও।'

"গেলাম সেখানে, দরজাটা যেই খুললাম। সেক্রেটারি আমাকে খুব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলেন। আমরা কথা বলছিলাম। তিনি আমার হাতদুটোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। প্রথমে আমি একটা বোতাম ঘোরাচ্ছিলাম, কিন্তু তারপরে হাতদুটো হাঁটুর উপর পেতে রাখলাম, যাতে তিনি মনে না করতে পারেন যে আমি ভয় পেয়েছি। প্রথমে তো আমার জীবনের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আমার বাড়ি, কোন্ কোন্ জেলা আমার জানা? কি কি ভাষা জানি? আমি বললাম—জার্মান। তারপর আমার পা, হাঁটু নার্ভ এইসবের কথা, ভূ-পরিচয় সম্বন্ধে কি জানি দিগন্তরেখা সম্পর্কে আমার কিরকম জ্ঞান, কি করে এর সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় করতে হয়, নক্ষত্র দেখে কি করে দিক ঠিক করতে হয় —আমি সব কিছুরই জবাব দিলাম। তারপর বললেন—"বন্দুক ছুঁড়তে জান?"

"জানি।"

"লক্ষ্যভেদ করেছ কখনও?"

"হ্যাঁ।"

"সাঁতার কাটতে পার?"

"হ্যাঁ।"

"উঁচু থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পাও না?"

"না।"

"প্যারাশুট থেকে লাফিয়ে পড়তে ভয় পাও না—"

"না, পাই না।"

"তোমার ইচ্ছাশক্তি প্রবল?"

"আমি বললাম আমার নার্ভগুলো বেশ শক্ত, আমার ধৈর্য আছে।"

তিনি বললেন—"আচ্ছা, যুদ্ধ বেধেছে, লোকের দরকার, ধর তোমাকে আমরা যদি যুদ্ধে পাঠাই।"

"পাঠান না দয়া করে।"

"কিন্তু এ তো অফিসে বসে কাজ করার মতো ব্যাপার নয়...ভালো কথা, তুমি বিমান আক্রমণের সময় কোথায় থাক?"

"ছাদে, আমি ওতে ভয় পাই না, সাইরেন শুনলে আমার ভয় করে না, বোমাকেও আমি ভয় করি না।"

তিনি বললেন—"বেশ, বারান্দায় গিয়ে বস। আর একজন বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ করে আমরা টুসিনোতে গিয়ে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ার মহড়া দেব কয়েকটা।"

"আমি বারান্দায় গেলাম। মিথ্যে বলব না—আমি বিমান থেকে লাফিয়ে-পড়া সম্বন্ধে ভাবছিলাম। তিনি আবার আমাকে ডাকলেন—'প্রস্তুত?' 'প্রস্তুত।' এবার তিনি আমাকে ভয় দেখাতে লাগলেন।" জয়া আমার হাত আরও জোরে চেপে ধরল, "তিনি বললেন—সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ, আশংকা-অনেক. যে কোনকিছুও ঘটতে পারে। তারপর তিনি বললেন—'বাড়ি গিয়ে আবার ভেবে দেখ। দুদিন পরে আবার এস।' তখন আমি বুঝলাম বিমান থেকে লাফ দেবার কথাটা শুধু আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই বলেছিলেন।

"আমি দুদিন পর আবার গেলাম, তখন তিনি বললেন—'তোমাকে নেব না বলেই আমরা স্থির করেছি।' আমি তো প্রায় কেঁদেই ফেললাম—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম—'কি বলছেন, নেবেন না, কেন নেবেন না?'

"তখন তিনি হেসে বললেন—'বস, তুমি শত্রুপক্ষের এলাকার পিছনে থাকার কাজে যাবে।' আমি বুঝলাম এটাও একটা পরীক্ষা, আমার মনে হচ্ছে তিনি যদি আমাকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেখতেন, তাহলে কিছুতেই নিতেন না। এই পর্যন্তই, আমার প্রথম পরীক্ষা শেষ হলো।"

উনুনে ফট্ করে কাঠফাটার শব্দ হলো। জয়ার মুখের উপর আগুনের আভা পড়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ঘরে আর কোনও আলো নেই। নীরবে আমরা অনেকক্ষণ ধরে আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। অবশেষে অনেকক্ষণ চিন্তার পর জয়া বলল—"বড়ো দুঃখের কথা যে সার্জিমামা এখানে নেই, তিনি এখানে থাকলে তোমার এ দুঃসময়ে অনেক সাহায্য হতো, তাঁর উপদেশমতো চললে—"

জয়া আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে, বিছানা করে শুয়ে পড়ল। একটু পরে আমিও শুতে গেলাম কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম—আর কতদিন পরে জয়া আবার নিজের বিছানায় নিজের ঘরে ঘুমাতে আসবে? ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ও তক্ষুণি নড়েচড়ে উঠল—

"তুমি এখনও ঘুমাও নি কেন?" গলার সুরে বোঝা গেল ও হাসছিল।

আমি জবাব দিলাম—"ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে কিনা জানবার জন্য ঘড়ি দেখতে এসেছিলাম—তুমি ঘুমাও।"

আমি আবার শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম এল না। ইচ্ছা হলো ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি ওর সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করেছে কি না। বোধহয় সকলের উপদেশ মতো মস্কো চলে গেলেই হয়ত ভালো হতো। আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, নিঃশ্বাস নিতে আমার দস্তুরমতো কষ্ট হচ্ছে...রাত শেষ হয়ে এসেছে, এই শেষবারের মতো আমি তাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করতে পারি। না হলে বড়ো দেরি হয়ে যাবে। আবার আমি উঠলাম। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোয় জয়ার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, শান্ত মুখশ্রী,

দৃঢ়চাপবন্ধ ওষ্ঠযুগল। শেষবারের মতো আমি বুঝলাম—জয়া তার মত বদলাবে না।

শুরা কারখানায় যাবার জন্য উঠল ভোরে। হ্যাট কোট পরে বেরোবার সময় বলল জয়া—"বিদায় শুরা।"

শুরা ওর করমর্দন করে বলল—

"দাদু আর দিদাকে আমার ভালোবাসা দিও, তোমার যাত্রা শুভ হোক, তোমার জন্য আমাদের বড়ো মন খারাপ লাগবে জানো জয়া। কিন্তু তোমার জন্য আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আস্পেন বনে গোলমাল অনেক কম।"

জয়া হেসে ওর ভাইকে জড়িয়ে ধরল।

জয়া আর আমি একসঙ্গে চা খেলাম। জয়া জামাকাপড় পরতে শুরু করল। আমি তাকে আমার নিজহাতে বোনা কালো পাড় দেওয়া গরম সবুজ দস্তানাদুটো দিলাম, আর আমার পশমের জামাটাও দিলাম।

জয়া আপত্তি করে বলল—"না না আমার লাগবে না, গরম কিছু না থাকলে তুমি তাহলে কি করে শীত কাটাবে?"

আমি শান্তস্বরে বললাম—"এগুলো নাও।"

জয়া আমার দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে ওগুলো নিয়ে নিল। আমরা দুজনে একসঙ্গে বার হলাম। সকালটা বড়ো মেঘলা। হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছিল চোখেমুখে।

আমি বললাম—"তোমার ব্যাগটা আমার হাতে দাও।"

জয়া একমুহূর্ত দাঁড়াল।

"আচ্ছা মা, আমার দিকে তাকাও তো...তুমি কাঁদছ, চোখে জল নিয়ে আমাকে বিদায় দিতে এসো না, আবার তাকাও দেখি।"

আমি তাকিয়ে দেখি জয়া আনন্দিত মুখে হাসছে, আমিও হাসতে চাইলাম। "এই তো বেশ।"

আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন আর চুম্বন করে জয়া চলন্ত একটি ট্রামের পাদানীতে লাফিয়ে উঠল।

নোটখাতা

বাড়ি ফিরেও মনে হলো সব জিনিসে জয়ার হাতের ছোঁয়া লেগে আছে। যেমন করে জয়া সাজিয়ে রেখেছে, তেমনি করে তারা দাঁড়িয়ে আছে। তারই হাতে সাজিয়ে রেখেছে সুতীর জামাকাপড় আলনায়, খাতাপত্র টেবিলে। শীতের জন্য জানালার কাঁচে পুডিং আঁটা, লম্বা গ্লাশে রাখা শরতের শুকনো ঝরা পাতায়-ভরা একটা শাখা। ছোটখাটো সব কিছুই ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

দিন দশেক পরে কয়েকটি কথালেখা একখানা পোস্টকার্ড এল। "প্রিয় মা, আমি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছি। বেশ ভালো লাগছে। আশা করি তুমিও ভালো আছ। ভালোবাসা আর আদর নিও—তোমার জয়া।"

শুরা অনেকক্ষণ ধরে পোস্টকার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল। বারবার যুদ্ধক্ষেত্রের পোস্ট অফিসের নম্বরটা পড়তে লাগল—যেন মুখস্থ করছে।

কেবলমাত্র বলল—"মা?"—কিন্তু এই একটি অক্ষরের মধ্যেই ওর মনের বিস্ময়, ভর্ৎসনা আর তিক্ত অভিমান প্রকাশ পেল। অহঙ্কারী আর আত্মপ্রত্যয়ী শুরা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জয়া যে তার গোপনকথা না বলে, তাকে একবারও না জানিয়ে এমন করে চলে গেল, তাতে শুরা ভয়ানক দুঃখিত হয়েছে, ব্যথা পেয়েছে।

"তুমি যখন জুলাই মাসে চলে যাও, তখন তো জয়াকে কিছু বলে যাও নি। তোমার বলার অধিকার ছিল না, ওর বেলায় ও ঠিক তেমনি।"

শুরা আমাকে যা জবাব দিল কোনদিন ওর কাছ থেকে এ রকম কথা শুনি নি। আমি ভাবতেও পারতাম না যে শুরা এ রকম কথা বলতে পারে। "জয়া আর আমি ছিলাম এক," একটু থেমে আবার বলল—"আমাদের দুজনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল।"

এ নিয়ে আমরা আর কিছু আলোচনা করলাম না।

আমার জীবন থেকে সবটুকু আলো চলে গিয়েছিল। অনেক রাত জেগে সৈনিকদের পোশাক তৈরি করতে করতে ভাবতাম—"কোথায় আছ এখন? কি করছ? তুমি কি আমাদের কথা ভাবছ?"

একদিন একটু সময় পেয়ে টেবিলের ড্রয়ার গুছিয়ে রাখছিলাম, জয়ার খাতাপত্রগুলোয় যাতে ধুলো না জমে সেজন্য সেগুলো ড্রয়ারের মধ্যে রাখার জন্য একটু জায়গা করছিলাম। প্রথমে আমি জয়ার হাতের টানা লেখায় দিস্তা দিস্তা কাগজ পেলাম। ইলিয়া মুরোমেত-এর সম্বন্ধে জয়ার রচনার খসড়া করা পাতাগুলো। আরম্ভটা এই রকম—

"রুশভূমির সীমাহীন বিস্তার। এই ভূমির শান্তিরক্ষক তিন অতিকায় প্রহরী. মাঝখানে একটি ঘোড়ার উপর বসে ইলিয়া মুরোমেত, হাতের গদা শত্রুর উপর পড়তে উদ্যত। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বিশ্বস্ত বন্ধুরা, চোখ মিটমিটিয়ে আলিউশা পোপোভিচ, আর রূপবান্ দোব্রিনিয়া।"

মনে পড়ল সেইদিনের কথা, জয়া যেদিন ইলিয়া মুরোমেত-এর সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী পড়ছিল, ভাসনেৎসোভ-এর বিখ্যাত চিত্রের একটি প্রতিলিপি এনে তার দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে, এই ছবিটির কথা দিয়েই জয়া তার রচনা আরম্ভ করেছিল।

আর এক পাতায় ঃ

"মানুষ তাকে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। যুদ্ধে আহত হলে সবাই কেঁদেছিল, 'দুর্দান্ত নাস্তিক' যখন তাকে হারিয়ে দিল, রুশভূমিই তাকে দিয়েছিল শক্তি ঃ

"ইলিয়া মাটিতে পড়ে যেতেই তার শক্তি তিনগুণ বেড়ে যায়।"

পরের পৃষ্ঠায় ঃ

"এখন বহু শতাব্দী পর মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর আশা সত্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশ তার সন্তানদের মধ্যে থেকেই তৈরি করেছে তার রক্ষক লালফৌজ। 'কিংবদন্তীকে সত্যে রূপায়িত করতে জন্মেছি আমরা' গানটা কিছু মিথ্যেই গাওয়া হয় নি আমরা এক অপূর্ব কাহিনীতে রূপায়িত করতে চলেছি, এককালে লোকে যেমনি করে ইলিয়া মুরোমেতের কাহিনী গান করতো,

তেমনি গভীর ভালোবাসার সংগে গাইছে আজ লোকে তাদের বীর যোদ্ধাদের সম্বন্ধেও।"

আমি জয়ার রচনা খাতার ভিতরে এই টুকরো পাতাগুলো যত্ন করে রাখতে গিয়ে দেখলাম ইলিয়া মুরোমেত সম্বন্ধে রচনাটা পরিষ্কার করে নকল করা হয়েছে আর তার পাশে ভেরা সার্জিয়েভ্‌নার পরিষ্কার হস্তাক্ষরে "একসেলেন্ট" মন্তব্য রয়েছে। সবগুলো কাগজ ড্রয়ারের ভিতরে রাখতে গিয়ে হাতে যেন এককোণায় কি একটা ঠেকল, সেটা বার করে আনলাম। একটা ছোট্ট নোটবই, খুললাম—

প্রথম পাতায় লেখকদের নাম আর তাদের বইয়ের নাম। অনেক নামের পাশেই ঢেরাচিহ্ন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সেগুলো পড়া হয়েছে। তার মধ্যে আছে জুকোভ্‌স্কি, কারামজিন, পুশকিন, লেরমোনটোভ, তলস্তয়, ডিকেন্স, বায়রন, মলেয়ার, শেক্সপীয়ার...তারপর কতগুলো পাতায় পেন্সিলের লেখায় টানা,—অর্ধেক মোছা, প্রায় অস্পষ্ট লেখা। তারপর হঠাৎ পাওয়া গেল ছোট ছোট কালির অক্ষরে, জয়ার স্পষ্ট হাতের লেখায়,—

"মানুষের সব কিছু হবে সুন্দর—তার মুখ, তার পরিচ্ছদ, তার আত্মা এমন কি তার চিন্তাধারা পর্যন্ত (চেখভ)।"

"সাম্যবাদী হওয়ার মানে হলো নির্ভীক হওয়া, চিন্তা করতে পারা, জানবার আকাঙ্ক্ষা, আর অভিযান করা (মায়াকভ্‌স্কি)।"

পরের পাতায় পেন্সিলে হিজিবিজিকাটা ক্ষিপ্র হাতে টুকে নেওয়া একটা নোট পেলাম—"সত্যের উচ্চ আদর্শ, নৈতিক পবিত্রতা, আর গভীরতার জন্য মানুষের সংগ্রাম ব্যক্ত হয়েছে 'ওথেলো' নাটকে। ওথেলোর বিষয়বস্তু হলো উচ্চ অকৃত্রিম মানবতাবোধের অনুভূতি।"

"শেক্সপীয়ারের নাটকে নায়কের মৃত্যুতে উচ্চ নৈতিক আদর্শ জয়লাভ করে।"

ছোট্ট, নিত্যব্যবহারে সামান্য ময়লা নোটবইটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমি যেন জয়ার কণ্ঠস্বর, তার সন্ধানীচোখের গভীর দৃষ্টি, সলজ্জ হাসি অনুভব করতে লাগলাম।

এই যে "আনা কারেনিনার" একটু অংশ—আনার ছেলে সোরিওঝা সম্বন্ধে ঃ

"ওর বয়স নয় বছর, শিশু মাত্র বয়সে ; কিন্তু নিজের আত্মাকে জানত ও ভালোবাসত। চোখের পাতা যেমন চোখের মণিকে সযত্নে পালন করে তেমনি করে সে আত্মার সমাদর করে। ভালোবাসার সোনার চাবি ছাড়া সে আর কাউকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেয় না।"

মনে হলো এই কথাগুলো জয়া সম্বন্ধেই যেন বলা হয়েছে। পড়তে পড়তে যেন আমি প্রতি ছত্রে তাকে দেখতে পাচ্ছি।

"মায়াকভ্‌স্কি মহৎ মেজাজী সরলহৃদয় আর স্পষ্টবক্তা ব্যক্তি। মায়াকভস্কি কবিতায় নতুন জীবন সঞ্চার করেছেন। তিনি কবি-নাগরিক, কবি-বক্তা।"

"গোর্কি ঃ 'শ্রম যখন মূর্তিমান আনন্দ, জীবন তখন পরম রমণীয়। শ্রম যখন কর্তব্য, জীবন তখন দাসত্বমাত্র।' 'সত্য কি? হে মানুষ—এই তোমার সত্য!' 'মিথ্যা হলো গোলাম আর মনিবদের ধর্ম, সত্যই হলো মুক্ত মানবের ভগবান্‌। মানুষ! কি আশ্চর্য কথা—কি গরিমাময় না কথাটা—মানুষ! মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে, কৃপা নয়...কৃপা হীনতা সৃষ্টি করে, তবু কিনা সম্মান করা হয়! যারা কেবলমাত্র নিজের ভরণপোষণের কথাই সারাক্ষণ ভাবে

তাদের আমি কখনোই দেখতে পারি না। এটাই তো একমাত্র কথা নয়—মানুষ তার থেকে অনেক বড়ো, মানুষের উদরের চেয়ে মানুষের আদর্শ অনেক উচ্চ।' (গর্কি—দি লোয়ার ডেপ্‌থস্‌)।"

পাতার পর পাতা উল্টিয়ে পড়তে লাগলাম ঃ

"মিগুয়েল দ্য সারভেনটেস ঃ সাভেদ্রা—ডন কুইক্সোট্‌। ডন কুইক্সোট হলো ইচ্ছাশক্তি, আত্মত্যাগ ও বুদ্ধির মূর্তিমান রূপ।"

"জীবনের যাত্রাপথে মানুষ যত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে আর ভবিষ্যতেও করবে—তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় আর সবথেকে নিপুণ সৃষ্টি হলো বই।" (গর্কি)।

"প্রথমবারের মতো একটি সত্যিকার ভালো বই পড়ার সঙ্গে গভীরহৃদয় পুরনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়াকে তুলনা করা চলে। পড়া জিনিস আবার পড়া মানে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হওয়া। ভালো বই পড়ে শেষ করা মানে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া—আবার কবে দেখা হবে কে জানে!" (চীনের প্রবাদ)।

"যে ভ্রমণ করে, সে পথের শেষে পৌঁছায়।"

"চরিত্রে, ব্যবহারে, চালচলনে, সবকিছুতে সাদাসিধা জিনিসই সবথেকে সুন্দর।" (লংফেলো)

আবার একবার, সেই জয়ার ডায়েরী পড়ার দিনটির মতো আমার মনে হতে লাগল আমার হাতের মুঠোয় কাঁপছে আমার হৃদয়—যে হৃদয় তীব্রভাবে ভালো-বাসার জন্য, বিশ্বাস করবার জন্য উন্মুখ।

সবটা বই পড়তে পড়তে, প্রত্যেকটা পাতার উপর চোখ বুলাতে বুলাতে মনে হলো জয়া আমার পাশে বসে আছে, আমরা আবার একসঙ্গে বসে কথা বলছি।

১৪ই অক্টোবর তারিখের লেখা শেষ পাতাটি—

"মস্কো কমিটির সেক্রেটারী বেশ বিনয়ী সাদাসিধা লোক। তিনি কথা বলেন সংক্ষেপে কিন্তু পরিষ্কার করে। তাঁর টেলিফোন নম্বর কে ০-২৭-০০ এক্সটেনশন ১-১৪।

তারপর "ফাউস্ট" থেকে অনেকখানি উদ্ধৃত করা হয়েছে ; ইউফোরিয়ান-এর প্রশংসামুখর সেই গানটার পুরোটাই তোলা হয়েছে—

> "আমার স্লোগান এখন
> যুদ্ধ—জয়।
> ধ্বনি...............
> ......হাঁ, পক্ষপুটে ভর করে—
> সেখানে যাব উড়ে
> যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দেব
> রণতাণ্ডবে হব মত্ত।"

"আমি ভালোবাসি রুশভূমিকে, আমার হৃদয় বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে রুশভূমির জন্য (সাল্টিকোভ শেচেদ্রিন)।"

হঠাৎ শেষ পাতায় দুরন্ত আঘাতের মতো এল 'হ্যামলেটের' কয়েকটি কথা—

"বিদায়, বিদায়, বিদায়—ভুলোনা আমায়।"

তানিয়া

এই বইটা লেখায় আমি আনন্দ ও দুঃখ দুইই পেয়েছি। লিখতে লিখতে আমার মনে হয়েছে—আবার আমি ছোট্ট জয়ার দোলনা দুলিয়ে দিচ্ছি, আবার তিনবছরের শুরাকে কোলে নিয়ে প্রাণ ও আশায় ভরপুর দু'জনকে একসঙ্গে দেখাশোনা করছি। বলবার কথা যত কম হয়ে আসছে, অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যত কাছে আসছে, দরকারী কথা খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে ততই কঠিন হচ্ছে।

জয়ার বিদায়ের পরবর্তী দিনগুলি আমি পরিষ্কার মনে করতে পারি, তার খুঁটিনাটিগুলো পর্যন্ত।

ও চলে গেল—আমাদের দিনগুলো এক দীর্ঘ প্রতীক্ষায় পরিণত হলো। আগে শুরা বাড়ি ফিরে জয়াকে না দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করত—"জয়া কোথায়?" এখন তার প্রথম কথা হলো—"কোন খবর আছে?" কিছুদিন হলো সে প্রশ্ন করত না আর। কিন্তু তার চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠত।

একদিন বেশ উত্তেজিত ও আনন্দিত মুখে শুরা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল, আর আগে কোনদিন যা করে নি, তাই করল—আমাকে এসে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

আমি তক্ষুনি অনুমান করলাম—"চিঠি!"

শুরা বলে উঠল—"কি চিঠি জান? শোন, 'মা, তুমি কেমন আছ, তোমার স্বাস্থ্য কেমন আছে! তুমি কি ভালো আছ? মাগো, যদি পার তো আমাকে কয়েকটা লাইন লিখে জানিও, আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে ফিরে এসে বাড়ি যাব তোমাকে দেখতে। তোমার জয়া।'"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"কবেকার তারিখ?"

"সতেরোই নভেম্বর। তার মানে জয়ার ফেরার আশা করতে পারি আমরা শীগগিরই।"

আর একবার শুরু হলো আমাদের প্রতীক্ষা, তত উদ্বেগ নেই আর, এবার আছে আশা আর আনন্দ। দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্তের তীব্র প্রতীক্ষা, যেন দরজায় শব্দ হওয়ামাত্র লাফিয়ে উঠে দরজাটা খুলে দিতে পারি, প্রতি মুহূর্তেই আমরা ওর আগমন আশা করছি......

"কিন্তু নভেম্বর গেল, ডিসেম্বর গেল জানুয়ারিও প্রায় শেষ হয়ে এল।... না চিঠিপত্র না কোন খবর।"

শুরা আর আমি দুজনেই কাজ করছিলাম। সংসারের সব কাজ শুরা করত। বুঝতে পারতাম, জয়ার মতো সব ভার নিয়ে ও আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। ও যদি আগে বাড়ি আসত, তাড়াতাড়ি উনুন জেলে আমার জন্য খাবার গরম করতে লেগে যেত। রাত্রে আমার গায়ে গরম কিছু দিয়ে ঢাকা দেবার জন্য ও উঠত, আমি বুঝতে পারতাম। আমাদের জ্বালানী কাঠ কম ছিল, তার মধ্যেও যতটা সম্ভব আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করতাম।

একদিন জানুয়ারির শেষে আমি দেরি করে ফিরছিলাম। বেশি ক্লান্ত হলে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে, অন্যমনস্কের মতো আমি পাশের লোকের কথা-বার্তা শুনছিলাম। সে সন্ধ্যায় রাস্তায় ক্রমাগতই একটা কথা শুনছিলাম—"আজকের প্রাভদা দেখেছ?" "লিদোভ্-এর প্রবন্ধটা পড়েছ?"

ট্রামে একটি অল্পবয়সী বড়ো বড়ো চোখওয়ালা রোগা মেয়েকে তার সংগীকে বলতে শুনলাম—"কি করুণ প্রবন্ধ! সাবাস মেয়ে বটে!"

বুঝলাম নিশ্চয়ই আজকের কাগজে অসাধারণ কিছু লেখা উঠেছে।

বাড়ি ফিরে আমি শুরাকে বললাম—"তুমি কি আজকের প্রাভ্দা পড়েছ শুরা? লোকেরা বলাবলি করছে ভারী চমৎকার প্রবন্ধ বেরিয়েছে একটা!"

শুরা নীচুগলায় মাটির দিকে চোখ রেখে বলল—"হ্যাঁ।"

"কি বিষয় নিয়ে?"

"তানিয়া নামে একটি তরুণ মেয়ে-গেরিলা সম্বন্ধে। জার্মানরা তাকে ফাঁসী দিয়েছে।"

ঘরের ভিতরটা ঠাণ্ডা। যদিও এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, তবুও একথা শোনার সংগে সংগে যেন আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বরফের স্রোত ব'য়ে গেল। আমি ভাবলাম—"কোন্ মায়ের বাছা রে! ওর মাও হয়ত বাড়িতে ওর জন্য অপেক্ষা করছে, ওর জন্য ভাবছে।"

একটু পরে আমি রেডিও খুলে দিলাম। যুদ্ধের খবর। রণক্ষেত্রের খবরাখবর। হঠাৎ লাউডস্পীকারে শোনা গেল—"আজ ২৭শে জানুয়ারি প্রকাশিত লিদোভ্-এর প্রবন্ধ "তানিয়া" প্রচার করছি।"

ক্রোধ আর করুণামাখানো স্বরে কাহিনীটা শুরু হলো, কেমন করে গত ডিসেম্বরের প্রথমে তানিয়া নামে তরুণ গেরিলা মেয়েকে জার্মানরা পেত্রিশ্চেভো গ্রামে ফাঁসিতে লটকায়।

হঠাৎ শুরা বলে উঠল, "মা রেডিওটা বন্ধ করে দেব? কাল আমাকে সকাল বেলাই কাজে যেতে হবে।"

আশ্চর্য কিন্তু! শুরার ঘুম খুব গাঢ়, সাধারণত জোরে কথাবার্তা বলা বা রেডিও চালানোতে তার ঘুম ভাঙে না।

পরের দিন আমি কমসোমল জেলা কমিটিতে গেলাম, ভাবলাম তারা হয়ত জয়া সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে।

"কাজটা গোপনীয়। চিঠিপত্র আসতে হয়ত অনেক দেরি হবে"—বললেন সেক্রেটারী।

আরও কয়েকদিন কেটে গেল ভয়ার্ত উদ্বেগ নিয়ে, তারপর এল ৭ই ফেব্রুয়ারি। দিনটা আমি কোনদিন ভুলব না—বাড়ি এসে ছোট্ট একটি চিঠি পেলাম। শুরা লিখেছে "মাগো—কমসোমল জেলা কমিটি থেকে তোমার সংগে দেখা করতে চেয়েছে।"

আমি খুব খুশি হয়ে ভাবলাম—"শেষ পর্যন্ত এল তাহলে! জয়ার খবর নিশ্চয়ই, হয়ত চিঠি।"

আমি যেন পাখায় ভর করে উড়ে গেলাম জেলা কমিটিতে। অন্ধকার, ঝড়ের রাত. ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতেও পারলাম না। আমি হোঁচট খেতে খেতে, পড়তে পড়তে দৌড়ে গেলাম। কোন অশুভ চিন্তাই এল না আমার মাথায়। আমি তো খারাপ খবরের কথা ভাবিই নি. শুধু ভাবছিলাম কখন জয়াকে দেখতে পাব, ও কি শীগগিরই ফিরে আস্বে?

জেলা কমিটিতে আমাকে বলল—"বাড়ি ফিরে যান, কমসোমলের মস্কো-কমিটি থেকে কয়েকজন আপনার বাসায় আপনার সংগে দেখা করতে গেছেন।"

"শীগ্গির, শীগ্গির, তাড়াতাড়ি চালাও পা, জয়া কখন আসছে আমাকে জানতেই হবে"—আবারও আমি হাঁটতে না পেরে দৌড়াতে লাগলাম।

দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলেই আমি প্রবেশপথে থম্‌কে দাঁড়ালাম। টেবিলের কাছে বসা দুজন লোক আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন. তাঁদের একজন তিমিরিয়াজেভ্ জেলার গণশিক্ষা পরিষদের কর্তা—আর একজন অপরিচিত, গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখ তাঁর। দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ঘরের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা, তাঁদের কেউই কোট খোলেন নি।

শুরা স্তব্ধ হয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল—আমি তার দিকে তাকালাম। চোখে চোখে মিলল, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম...শুরা আমার দিকে দৌড়ে এল. ওর পা লেগে কি যেন পড়ে গেল—কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না. আমার পাদুটো যেন মাটিতে আটকে গিয়েছে।

"লিউবোভ তিমোফিয়েভ্‌না. প্রাভদায় তানিয়া মেয়েটি..." কে যেন বলল, "আপনার জয়া...আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পেত্রিশেচভোর গ্রামে যাব।"

কে যেন একটা চেয়ার এনে দিল—আমি তাতে বসে পড়লাম। চোখে আমার জল ছিল না। ঘরে যেন হাওয়া নেই—একলা থাকার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। আমার কানে একটানা বাজতে লাগল—"মারা গিয়েছে... মারা গিয়েছে...মারা গিয়েছে।"

শুরা আমাকে বিছানায় শুইয়ে আমার পাশে সারারাত বসে রইল। ও কাঁদল না, শুকনো চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল, আমার হাত ওর হাতে জোরে চেপে ধরে রইল।

অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"শুরা এখন আমরা কি করব?"

এবার শুরা নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা সত্ত্বেও বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে চিৎকার করে হতাশার কান্না কাঁদতে লাগল।

ভাঙা মোটা গলায় বলতে লাগল শুরা—"আমি আগে থেকেই জানতাম... সবই...গলায় দড়িবাঁধা অবস্থায় একটা ছবি প্রাভদায় বেরিয়েছে,...নামটা আলাদা কিন্তু আমি জানতাম এটা তারই...তোমাকে আমি বলতে চাই নি, আশা ছিল হয়ত আমি ভুল করেছি। নিজেকে বোঝাতে চেয়েছি আমি ভুল করেছি... আমার বিশ্বাস হয় নি...কিন্তু আমি জানতাম এ আমি জানতাম......"

বললাম—"আমাকে দেখাও।"

চোখের জলে ভেসে বলল শুরা—"না"।

বললাম—"শুরা আমাকে এখনও অনেক কিছু দেখতে হবে তাকে আমার দেখা এখনও বাকি। আমি বলছি..."

শুরা, জামার ভিতরকার পকেট থেকে তার নোটবই টেনে বার করল। পরিষ্কার পাতায় খবরের কাগজের একটা টুক্‌রো। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আমার মেয়ের মুখের চেহারা আমি চিনতে পারলাম।

শুরা যেন আমাকে কিছু বলছিল—অনেক দূর থেকে যেন আমার কানে ভেসে এল "বুঝতে পারছ কেন ও নিজেকে তানিয়া বলে পরিচয় দিয়েছিল? তানিয়া সলোমাখার গল্প মনে আছে?"

বেশ মনে আছে। সবই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নিশ্চয়ই অনেকদিন আগে নিহত সেই মেয়েটির কথা ভেবেই সে নিজের নাম তানিয়া রেখেছিল......

পেত্রিশ্চেভোতে

১৫ই ফেব্রুয়ারি আমি পেত্রিশ্চেভো গ্রামে গেলাম। কি করে গেলাম তা আর ভালো মনে নেই, কেবল মনে আছে পীচের রাস্তা পেত্রিশ্চেভো অবধি যায় নি। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা আমাদের গাড়ি ঠেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল। গ্রামে যখন গিয়ে পেঁছিলাম, শীতে আমরা অসাড় হয়ে গিয়েছি। ওরা আমাকে একটা কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল কিন্তু তবুও আমার শীত গেল না। আমরা তারপর জয়ার কবরের কাছে গেলাম। ওরা আগেই খুঁড়ে আমার মেয়েকে বার করেছিল। আমি দেখলাম তাকে......

হাতদুটো দুপাশে লম্বা করে ছড়িয়ে জয়া শুয়ে আছে। গলায় ফাঁসীর দড়ি, মাথাটা পিছন দিকে ঝুলে পড়েছে। প্রশান্ত মুখে তার নির্দয়ভাবে আঘাতের দাগ, গালে একটি গভীর বড়ো ক্ষত, তার শরীরে এখানে সেখানে ক্রমাগত সঙ্গীন দিয়ে খোঁচানো হয়েছে। বুকে জমাট রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আমি তাকিয়ে রইলাম...ওর পরিষ্কার কপালের উপর থেকে একগোছা চুল সরিয়ে দিলাম। ছিন্নভিন্ন আঘাতে আঘাতে বিকৃত মুখে গভীর প্রশান্তির আভা। ওর কাছ থেকে নিজেকে আমি আর সরিয়ে নিতে পারছিলাম না। আমার চোখদুটো ফেরানোর ক্ষমতাও ছিল না।

লালফৌজের পোশাক পরা একটি মেয়ে এসে কোমলভাবে অথচ দৃঢ়-মুষ্টিতে আমার হাত ধরে আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে বলল—

"চলুন আমরা একটা কুটিরে যাই।"

"না"।

"চলুন, আমি আর জয়া একই গেরিলাবাহিনীতে ছিলাম, আমি আপনাকে সব বলব।"

আমাকে কুটিরে নিয়ে, আমার পাশে বসে সে তার কাহিনী শুরু করল। অনেক কষ্টে, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে তার কাহিনী শুনলাম। কিছু কিছু আমি খবরের কাগজ থেকে জানতে পেরেছিলাম। ও বলে গেল, কি করে একদল গেরিলা—কমসোমলের সভ্য তারা—শত্রুবাহিনীর লাইন অতিক্রম করে গেল। দুই সপ্তাহ তারা জার্মান অধিকৃত এলাকার বনে বনে কাটিয়েছে। রাত্রে তারা তাদের অধিনায়কের আদেশ পালন করত, দিনের বেলা যেখানে সেখানে বরফের উপর ঘুমিয়ে নিত, হয়ত কোথাও আগুনে গা গরম করে নিত। তারা মাত্র পাঁচদিনের মতো খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাই দিয়ে পনের দিন চালিয়ে দিল। শেষ রুটির টুকরোটি, শেষ জলবিন্দুটি তারা ভাগাভাগি করে খেল......। জয়ার বন্ধুর নাম ক্লাভা, ও যা জানে বলতে বলতে ও কাঁদছিল।

ওদের ফিরে যাওয়ার সময় এল, কিন্তু জয়া বারে বারেই বলতে লাগল তারা বিশেষ কিছুই করে নি। দলের অধিনায়কের কাছে পেত্রিশ্চেভো গ্রামে প্রবেশ করার অনুমতি চেয়ে নিল।

সেখানে সে জার্মান অধিকৃত বাড়িগুলিতে, তাদের সৈন্যদের আস্তাবলে

আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। পরের রাত্রে গ্রামের সীমানায় আর একটা আস্তাবলের কাছে বুকে হেঁটে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে ছিল দুশোটা ঘোড়া। তার ব্যাগ থেকে এক বোতল বেঞ্জিন বার করে বাড়ির গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে দেশলাই জ্বালাবার জন্য নীচু হতেই পিছন থেকে শান্ত্রী এসে হাত ধরে ফেলল। শান্ত্রীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রিভলবার বার করল, কিন্তু আগুন জ্বালাবার আর সময় পেল না। জার্মানটা ধাক্কা মেরে ওর হাত থেকে রিভলবারটা ফেলে দিয়ে বিপদের সঙ্কেত ধ্বনি করল।

ক্লাভা চুপ করল। সে-বাড়ির গৃহিনী এতক্ষণ ধরে আগুনের দিকে চেয়ে বসেছিল—হঠাৎ বলে উঠল..."তারপর কি ঘটেছিল আমি আপনাকে বলতে পারি যদি অবশ্য আপনি শুনতে চান।"

তার কথাও আমি শুনেছিলাম, কিন্তু তা আর আমি লিখতে পারব না। এবার পিওতর লিদোভ্-এর কাহিনী শোনা যাক্ এখন। তিনিই প্রথম জয়ার কথা লিখেছিলেন, তিনিই সর্বপ্রথম তার কথা শুনে পেত্রিশ্চেভো গ্রামে এসেছেন, তিনিই সর্বপ্রথম পায়ে-চলা সরু পথ ধরে এসে আবিষ্কার করেছেন কি করে জার্মানরা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, কি করে জয়া মরেছে...।

কি করে ঘটলো

"...তানিয়াকে ধরে নিয়ে গেল। একটা বেঞ্চে তাকে বসানো হলো। তার সামনে টেবিলের উপর টেলিফোন, টাইপরাইটার, রেডিও সেট, আর গাদা করা কাগজপত্র।

"অফিসাররা এসে জড় হতে লাগল। বাড়ির কর্তাদের (ভোরোনিনদের) চলে যেতে বলা হলো। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি অনিচ্ছা প্রকাশ করলে অফিসারটি বঁকে উঠল—"বেরিয়ে যা বুড়ী"—এবং পিঠে ঘা মারল।

"৩৩২ পদাতিকবাহিনীর ১৯৭ ডিভিসনের অধিনায়ক লেফটেনান্ট কর্নেল রুডেরের নিজে তানিয়াকে প্রশ্ন করছিল।

"রান্নাঘরে বসে ভোরোনিনরা ওঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সবই শুনতে পাচ্ছিল। তানিয়া বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে বেশ জোরে উদ্ধতভাবে জবাব দিচ্ছিল।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কে?'

"'তোমাকে বলব না।'

"'তুমিই কি আস্তাবলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিলে?'

"'হ্যাঁ আমিই।'

"'তোমার উদ্দেশ্য?'

"'তোমাদের ধ্বংস করা।'

"'নীরবতা।'

"'কবে সীমান্তরেখা পার হয়েছ?'

"'শুক্রবার।'

"'সে হিসাবে তুমি খুব তাড়াতাড়িই এখানে এসে পড়েছিলে!'

"'সময় নষ্ট করব কেন?'

"তানিয়াকে কে পাঠিয়েছে, কারা সঙ্গে এসেছে সবই ওরা জিজ্ঞেস করল। তার বন্ধুদের নামধাম বলে দিতে হবে বলে দাবি করল। দরজার ভিতর দিয়ে আওয়াজ ভেসে এল—'না, আমি জানি না, আমি তোমাকে বলব না।' শূন্যে চামড়ার বেতের শব্দ, গায়ের চামড়ার উপর জোরে কেটে বসে যাওয়ার শব্দ এল। কয়েকমিনিট পর একটি ছোকরামতন অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না-ঘরে এসে হাতের মধ্যে মাথা রেখে প্রশ্ন করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইল, চোখদুটো জোরে বন্ধ করে, কানদুটো হাত দিয়ে চেপে রাখল। ফ্যাসিস্তের স্নায়ুতেও এই নির্যাতন অসহ্য লাগছিল।

"চারজন জোয়ান তাদের চামড়ার বেল্ট খুলে মেয়েটিকে মারতে আরম্ভ করল। তানিয়ার মুখ থেকে একটু শব্দও বা'র হলো না। বাড়ির লোকেরা গুণেছিল দু'শ বাড়ির শব্দ। আর তার উপর সে বলে চলেছে—'না আমি তোমাদের বলব না।' কেবলমাত্র তার গলার সুর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সার্জেন্ট কার্ল বাওয়ারলাইন (যাকে পরে লালফৌজের দল বন্দী করে) লেফটেনান্ট কর্নেল রুডেরের প্রশ্ন করার নামে অত্যাচারের সময় উপস্থিত ছিল। তার কাগজপত্রে সে লিখেছে ঃ—

"তোমাদের ছোট বীররমণী দৃঢ় রইল, বিশ্বাসঘাতকতা কথার মানেও সে জানত না...ঠান্ডায় জমে নীল হয়ে গেল, ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথা বা'র হলো না......।

"ভরোনিনদের ঘরে তানিয়াকে দুইঘন্টা রাখা হলো। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভাসিলি কুলিকদের ঘরে।

"পাহারাবেষ্টিত, অর্ধনগ্ন, খালি পায়ে বরফের উপর দিয়ে সে গেল।'

"কুলিকদের ঘরে যখন তাকে নিয়ে এল, কপালে তার গভীর কালচে বেগুনী রঙ-এর একটি বড়ো ক্ষত, হাতে পায়ে চাবুকের দাগ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, উঁচু কপালে চুলেব গোছা ঘামের সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে। মেয়েটির হাতদুটো পিছনদিকে বাঁধা, ঠোঁটগুলো রক্তাক্ত, ফুলে উঠেছে। যখন ফ্যাসিস্ত বর্বররা তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করেছে তখন সে নিশ্চয়ই ঠোঁট কামড়ে সহ্য করেছে সব।

"একটা বেঞ্চের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রশান্তভাবে স্থির হয়ে সে বসল। জার্মান শান্ত্রী দরজায় পাহারা দিচ্ছিল। মেয়েটি জল চাইল। ভাসিলি কুলিক জলের বালতির কাছে যাবার আগেই শান্ত্রীটা তাড়াতাড়ি কেরোসিন ল্যাম্পটা টেবিলের উপর থেকে নিয়ে তানিয়ার ঠোঁটের কাছে ধরল। এতে বোঝাতে চাইল তাকে জলের বদলে কেরোসিন খেতে দেওয়া হবে।

"কুলিক মেয়েটির জন্য অনুগ্রহ চাইতে লাগল। শান্ত্রী খেঁকিয়ে উঠ্‌ল কিন্তু শেষপর্যন্ত গজগজ করে রাজী হলো। কুলিক মেয়েটিকে জল দিল। দারুণ পিপাসায় মেয়েটি দুইমগ জল শেষ করে ফেলল। পাগুলো তার বরফের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত, নিশ্চয়ই ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল।

"ঐ ঘরে জমায়েত হওয়া সৈন্যরা মেয়েটির দুঃখদুর্দশা নিয়ে ফুর্তি করতে লাগল। কেউ বা তার পাঁজরে ঘুঁষি মারতে লাগল, কেউ বা জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠি তার চিবুকের নীচে এনে ধরতে লাগল। একজন একখানা করাত ওর পিঠের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

"মনের সুখে যত খুশি যন্ত্রণা দেবার পর ঐ সৈন্যরা শুতে গেল। তখন সান্ত্রীটা বন্দুক প্রস্তুত রেখে তানিয়াকে উঠে বাইরে যেতে বলল। রাস্তা দিয়ে তাকে মার্চ করিয়ে আনল, সঙ্গীনের ডগা ওর পিঠে ছুঁয়ে রইল। তারপর সান্ত্রীটি চেঁচিয়ে উঠল "ৎসুরুখ!" মেয়েটিকে আবার বিপরীত দিকে হাঁটালো। খালি পায়ে, কেবলমাত্র অন্তর্বাস পরা মেয়েটি বরফের উপর দিয়ে হেঁটে চলল যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নির্যাতনকারী নিজে শীতে কাতর হয়ে পড়ে ভাবল যে এবার কুটিরে ফিরে গিয়ে শরীরটা গরম করে নেওয়া যাক্।

"সেই সান্ত্রীটা রাত দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত পাহারায় ছিল; আর প্রত্যেক ঘন্টায়ই সে পনের কুড়িমিনিট ধরে ওকে রাস্তায় বার করে নিল।"

"অবশেষে একটা নতুন সান্ত্রী এল, মন্দভাগ্য মেয়েটিকে বেঞ্চের উপর শুতে দেওয়া হলো।"

"তানিয়ার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক প্রাস্কোভিয়া কুলিক প্রথম সুযোগ পেয়েই তার সদ্ব্যবহার করলেন।"

তিনি বললেন—'তুমি কে?'

" 'তাতে তোমার কি দরকার?'

" 'তুমি কোথা থেকে আসছ?'

" 'মস্কো থেকে আসছি।'

" 'তোমার বাপমা বেঁচে আছেন?'

"মেয়েটি কোন জবাব দিল না। সকাল পর্যন্ত একটুও না নড়ে, একবারের জন্যও কাতরোক্তি না করে জয়া শুয়ে রইল।

"সকালবেলা সৈন্যরা গ্রামের মাঝখানে একটা ফাঁসীর মঞ্চ তৈরি করতে লাগল।

"প্রাস্কোভিয়া আবার মেয়েটির সঙ্গে কথা বলল : 'তুমিই কি গত পরশু-দিন এসেছিলে আগুন লাগাতে?'

" 'হ্যাঁ, একটাও জার্মান পুড়ে মরেছে কি?'

" 'না।'

" 'কি দুঃখের কথা! কি তাহলে পুড়েছে?'

" 'তাদের ঘোড়া। ওরা বলছে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও পুড়েছে।'

"দশটার সময় আবার কয়েকজন অফিসার এল। তাদের একজন আবার তানিয়াকে জিজ্ঞেস করল—'বল তুমি কে?'

"তানিয়া জবাব দিল না।'

" 'বল স্তালিন কোথায়?'

" 'স্তালিন তাঁর কর্তব্যস্থলে আছেন।' তানিয়া জবাব দিল। গৃহকর্তা আর তার স্ত্রী বাকি প্রশ্নগুলো আর শুনতে পান নি, কারণ তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন করা শেষ হয়ে যাবার পর আবার তাদের আসতে অনুমতি দেওয়া হয়।"

"তারা তানিয়ার জামাকাপড় নিয়ে এল, মোজা, ব্লাউজ আর প্যান্ট ছিল তার মধ্যে. তার কিটব্যাগটাও লবণ আর দেশলাইসমেত সেখানে ছিল। তার টুপি, লোমের জামা, নরম পশমের জাম্পার আর বুট উধাও হয়েছিল, বর্বর-গুলো সব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, দস্তানাগুলো লাল'লো অফিসারের রাঁধুনীর হাতে গিয়েছে।

"ওরা তানিয়াকে জামাকাপড় পরালো, বাড়িওয়ালী এসে জয়ার কালশিরা পড়ে যাওয়া পায়ের উপর হাঁটু পর্যন্ত মোজা টেনে আনতে সাহায্য করল। তার বুকের উপর তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বেনজিনের বোতল আর "ঘর পোড়ানী" লেখা বোর্ড ঝুলিয়ে দিল. এমনি করে তারা তাকে ফাঁসী মঞ্চের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

বধ্যভূমি দশজন উন্মুক্ত কৃপাণধারী অশ্বারোহী ঘিরে রেখেছিল, এক-শতেরও বেশি জার্মান সেনা আর কয়েকজন অফিসারও ছিল। গ্রামের লোকেদের জড়ো হয়ে ফাঁসী দেখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মাত্র কয়েকজন এসেছিল। তাদের মধ্যেও জনকতক একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অলক্ষ্যে সরে পড়েছিল, এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে চায় নি।

"আড়াআড়িভাবে আটকানো কাঠের ভিতর দিয়ে ঝুলছিল ফাঁস. তার তলায় দুটো কাঠের বাক্স, একটার উপরে আর একটা রাখা হয়েছে। ঘাতকরা বালিকাটিকে ধরে ঐ কাঠের বাক্সের উপর তুলে দিয়ে ফাঁস পরিয়ে দিল গলায়। একজন অফিসার ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়ানো তানিয়ার ছবি নেবার জন্য কোডাক্ ক্যামেরার লেন্স ঠিক করছিল, অধিনায়ক ঘাতককে ইসারায় অপেক্ষা করতে বলল।

"তানিয়া এই সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করার জন্য জমায়েত যৌথকৃষকদের উদ্দেশ করে পরিষ্কার চড়া গলায় বলল—'বন্ধুগণ! এত বিমর্ষ হয়েছ কেন? সাহস সঞ্চয় কর, লড়, ধ্বংস কর, পুড়িয়ে ফেল ফ্যাসিস্টদের।'

"কাছে দাঁড়ানো একটা জার্মান সৈন্য লাফিয়ে উঠে ওকে আঘাত করে মুখ বন্ধ করে দিতে চাইল। কিন্তু সে আঘাত উপেক্ষা করে বলে চলল—'আমি মরতে ভয় পাই না, বন্ধুরা, দেশের লোকের জন্য মরতে পারায় মহা গৌরব।'

"ফটোগ্রাফার দূর থেকে, কাছ থেকে মঞ্চের ছবি তুলে নিল। এখন পাশ থেকে তোলার তোড়জোড় করতে লাগল। ঘাতক অধিনায়কের দিকে অস্বস্তির সঙ্গে তাকাল, সে ফটোগ্রাফারকে তাড়া দিল—"আবের ডক্ শেনলার!" (তাড়াতাড়ি কর)।

"তখন তানিয়া অধিনায়কের দিকে ফিরে, জার্মান সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'আজ তোমরা আমাকে ফাঁসী দেবে, কিন্তু আমি একা নয়, আমরা কুড়ি কোটি লোক, সবাইকে তোমরা কিন্তু ফাঁসী দিতে পারবে না। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে সবাই। সময় আছে এখনো, এখনো আত্মসমর্পণ কর, জয় আমাদের হবেই।'

"ঘাতক দড়ি টেনে ধরল, ফাঁসটা তানিয়ার গলায় আটকে গেল। দুইহাতে ফাঁসটা টেনে ধরে তানিয়া পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বিদায়, বন্ধুগণ, যুদ্ধ করে যাও, ভয় পেয়োনা, স্তালিন আছেন আমাদের সঙ্গে, স্তালিন আসবেন।'

"ঘাতক এবার তার পেরেকওয়ালা বুটজুতো দিয়ে নীচের বাক্সটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। পিছল শক্ত বরফের উপর দিয়ে সেটা গড়িয়ে পড়ল। উপরের বাক্সটা ধড়াম করে মাটিতে পড়ল, জনতা সরে দাঁড়াল। একটা চিৎকার শোনা গেল শব্দটা দূর বনানীর প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল...

ক্লাভার কাহিনী

"প্রিয় লিউবোভ্ তিমোফিয়েভ্না—

"আমার নাম ক্লাভা। জয়ার সংগে একই গেরিলাবাহিনীতে ছিলাম আমি। আমি জানতাম পেত্রিশ্চেভোতে আমার কাহিনী শোনা আপনার পক্ষে কষ্টকর হবে। আর এও জানি আপনার কাছ-ছাড়া হবার পর জয়ার প্রতিটি মুহূর্ত কি ভাবে কেটেছে তা আপনি জানবার জন্য ইচ্ছুক। কানে শোনার চেয়ে পড়া বোধহয় অনেক সহজ। কাজেই আমার যা মনে আছে, আমি যা জানি তা সবই এই চিঠিতে লিখছি

"অক্টোবরের মাঝামাঝি আরও কয়েকজন কমসোমল সভ্যদের সংগে কমসোমলের মস্কোর কমিটির বারান্দায় সেক্রেটারীর ডাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। অন্যদের মতো আমারও শত্রুসৈন্যদের পিছন থেকে কাজ করার জন্য আগ্রহ ছিল। জনতার মধ্যে চোখে পড়ল একটি মেয়েকে, গাঢ় ধূসর বর্ণের চোখ দুটি। বাদামী রঙ-এর কলারওয়ালা ওভারকোট গায়ে—তেমনি লোমের—কারোর সংগেই সে কথা বলছে না—তার মানে সে কাউকেই চেনে না সেখানে। সেক্রেটারীর ঘর থেকে ঝকঝকে খুশিভরা চোখে বেরিয়ে এল, দরজার কাছে অপেক্ষমান জনতার দিকে চেয়ে একটু হাসল, বাইরে যাবার পথের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল, আমি ওর চলে যাওয়া দেখতে লাগলাম ঈর্ষার সংগে। বোঝা গেল পরিষ্কার যে ওকে নেওয়া হয়েছে।

"সেদিন আমারও দেখা করা শেষ হলো। আর ৩১শে অক্টোবর—সেদিনটি আমি কখনও ভুলব না—কলোসিয়াম সিনেমার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে এক বিরাট কমসোমল মেম্বারের দল যার যার কর্মক্ষেত্রে যাবে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, স্যাঁতসেতে, ঠাণ্ডা দিনটা।

"কলোসিয়াম-এর গেটের সামনে আবার সেই কটা চোখ মেয়েটি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"সিনেমা দেখতে এসেছ?" চোখ টিপে সে বলল "হ্যাঁ।" আরও ছেলেমেয়ে আসতে লাগল, আর একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম—"ছবি দেখতে এসেছ?" সবাই জবাব দিল "হ্যাঁ"। টিকিট ঘরের জানালা খুললে কিন্তু কেউ টিকিট কিনতে গেল না—আমরা একে অন্যের দিকে চেয়ে হেসে উঠলাম। আমি কটাচোখ মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"তোমার নাম কি?" সে জবাব দিল—"জয়া"।

"তখন জয়া আর কাতিয়া নামে আর একটি মেয়ে কিছু কিশমিশ্ কিনে এনে সবাইকে ভাগ করে দিতে দিতে হেসে বলল—'ছবির সংগে জমবে ভালো।' আমাদের পরিচয় হয়ে গেল শীগগিরই। একটা লরি এল একটু পরে, আমরা তাতে চড়ে মস্কোর ভিতর দিয়ে মোঝাইস্ক রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তায় আসতে আসতে আমরা গৃহযুদ্ধের সময়কার একটা কমসোমল গান গাইতে গাইতে চললাম।

"মস্কোর সবশেষ বাড়িটা পার হয়ে মোঝাইস্ক সড়কে এসে পড়লাম। সেখানে স্ত্রীলোক আর কিশোর কিশোরীরা মিলে প্রতিরোধ-প্রাচীর তৈরি

করছিল। আমরা সবাই মিলে বোধহয় এক কথাই ভাবছিলাম। আমাদের রাজধানী কেউ দখল করতে পারবে না, প্রতিটি মস্কোবাসী, ছেলেবুড়ো মস্কোকে রক্ষা করতে দৃঢ়সংকল্প।

"প্রায় সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা আমাদের কেন্দ্রে এসে পৌঁছলাম। কুন্‌ৎসেভো স্টেশনের কাছে ছিল সেটা। রাতের খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা শুরু হলো। ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা শিখতে আরম্ভ করলাম নাগান্ট রিভলভার, মৌসার ইত্যাদি রকমারি অস্ত্র। সেগুলি আলাদা আলাদা অংশে খুললাম, জোড়া দিলাম, তারপর প্রত্যেকে নিজেদের পরীক্ষা করলাম। আমাদের কাছে যা কিছু ব্যাখ্যা করা হলো জয়া খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো শিখে নিল। আমাকে বলল—এটা আমার ভাইয়ের মনের মতো কাজ ওর ওস্তাদ হাত, যে কোন যন্ত্র খুলে টুক্‌রো করে আবার চোখের পলকে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে, ওকে বুঝিয়ে দেবার দরকার হয় না।

"ঘরে আমরা দশটি মেয়ে ছিলাম। আমরা বোধহয় কারোরই নাম জানতাম না, কিন্তু যখন আমাদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নির্বাচন করার কথা হলো অনেকগুলো গলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"জয়া"। বুঝলাম, অন্যেরাও আমার মতো ওকে পছন্দ করে ফেলেছে।

"পরের দিন জাগবার ঘন্টা বাজল ভোর ছয়টা। শিক্ষা শুরু হবে সাতটায়. জয়া আমার বিছানার কাছে এসে বলল—'শীগগির ওঠ বলছি. না হলে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেব।' আরেকটি কুঁড়েধরনের মেয়েকে বলল—'কি রকম সৈনিক তুমি বল দেখি? জাগবার ঘন্টা বেজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠ্‌তে হবে।' খাবার সময়ও সে আমাদের তাড়া দিল। কে একজন বলে উঠ্‌ল—'আমাদের এমনি করে হুকুম করার মানেটা কি?' ভাবলাম 'এইবার সে বুঝি কড়া কিছু বলবে'। জয়া মেয়েটির দিকে সোজা তাকিয়ে বলল 'তোমরা নিজেই আমাকে বেছে নিয়েছ ; একবার আমাকে নির্বাচন করার পর আমার কাছ থেকে হুকুম তো শুনতেই হবে।'

এর পর প্রায়ই জয়া সম্বন্ধে ওদের বলতে শুনতাম ও কখনোই রাগ করে না, কিন্তু এমনি করে তাকাবে...আমরা ক্লাশে পড়াশোনা করতাম না. বনের ভিতরে পড়তাম, কম্পাস দেখে মার্চ করতে, মাটিতে শুয়ে মিশিয়ে যেতে, গুলি ছুঁড়তে শিখতাম। আমরা বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে চলতাম, জিনিসপত্র উড়িয়ে দিতে শিখলাম। আমাদের শিক্ষক বলতেন, "গাছ উড়ানো"। আমরা প্রত্যেক-দিন, বিশ্রাম না নিয়েই প্রায় সারাদিনই শিক্ষা নিতাম।

"তারপর সময় এল—মেজর স্প্রগিস আমাদের এক একজন করে ডেকে পাঠালেন, আবার তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় পেয়েছ? সাহস হারাবে না তো এখন? এখনও তোমাদের চলে যাবার সুযোগ আছে, এখনও ছেড়ে দিতে পার। এই তোমাদের শেষ সুযোগ, পরে বেশি দেরি হয়ে যাবে।' জয়া সবথেকে আগে মেজরের ঘরে গেল, ফিরেও এল প্রায় তক্ষুনি, ওর জবাব নিশ্চয়ই খুব দৃঢ় আর—সংক্ষিপ্ত হয়েছিল।

"তারপর আমাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে রিভলভার দেওয়া হলো।

"চৌঠা নভেম্বর ভলোকোলাম্‌স্‌কের দিকে রওনা হলাম, ওখানে আমাদের সীমান্ত পার হয়ে শত্রুর পশ্চাদ্দেশে আঘাত হানতে হবে। ভলোকোলাম্‌স্‌ক্‌ সড়কে মাইন পেতে রাখা ছিল আমাদের কাজ। দুটো দল রওনা হয়েছিল

ভলোকোলাম্‌স্‌ক্‌-এর দিকে, একদল হলো আমাদের, আর একদল কনস্তানটিন পি-এর—আমরা আলাদা আলাদা দিকে চললাম। কনস্তানটিন-এর দলে ছিল শুরা আর ঝেনিয়া নামে দুটি মেয়ে। আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তারা বলল—'তাহলে মেয়েরা—আমরা বীরের মতো আমাদের কর্তব্য পালন করতে চাই। যদি মরি, তাহলেও যেন বীরের মৃত্যুই বরণ করি'—জয়া বলল—'তা বৈ আর কি?'

"রাত্রিশেষে আমরা নিঃশব্দে একটিও গুলি না ছুঁড়ে সীমান্ত পার হলাম। তখন জয়া আর আমি খোঁজখবরের সন্ধানে বার হলাম। খুব আনন্দের সঙ্গে আমরা রওয়ানা হলাম, কারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ আরম্ভ করে দেওয়ার জন্য আমরা বড়োই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই কোথা থেকে যেন দুটো মোটরসাইকেল আমাদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা বুঝলাম যে আমাদের অসতর্ক হলে চলবে না। এবার আমরা গুঁড়ি মেরে চললাম, শরতের ঝরা-পাতাগুলো ভারী আর মুচ্‌মুচে। প্রতিটি শব্দই যেন বেশ জোরে হতে লাগল। তা সত্ত্বেও জয়া তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে, বেশ সহজভাবে এগিয়ে চলল—যেন এতে তার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না।

"এমনি করে আমরা প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে গেলাম। তারপর আমরা বনের মধ্যে ফিরে এসে আমাদের দলকে বললাম যে রাস্তা পরিষ্কার। ছেলেরা এবার জোড়ায় জোড়ায় এগিয়ে গিয়ে মাইন পাততে লাগল—মাইন পাততে সব সময় দুজন করে লোক লাগে। আমরা চারটি মেয়ে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। প্রায় শেষ করে এনেছে ছেলেরা এমন সময় আমরা অনেক দূরে মোটরের শব্দ শুনতে পেলাম—প্রথমে খুব অস্পষ্ট, প্রায় শোনা যাচ্ছিল না, তারপর ক্রমশ জোরে হতে লাগল। আমরা ছেলেদের সাবধান করে দিলাম, সকলে মিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটলাম। আমরা তখনও হাঁফাচ্ছি, এমন সময় একটা বোমা ফাটল। আশেপাশের সবকিছু মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। তারপরই এমন প্রশান্ত নীরবতা, যেন চারদিকে সবকিছু মরে গিয়েছে। বনানীর মর্মর শব্দ পর্যন্ত থেমে গিয়েছে। তারপর দ্বিতীয় বিস্ফোরণ, তৃতীয় আর গোলাগুলি এবং চেঁচামেচি।

"আমরা গভীর বনের ভিতরে চলে গেলাম। বেশ ফর্সা হয়ে গেলে আমরা থেমে আড্ডা খাড়া করলাম। সেদিন সাতই নভেম্বর, প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানালাম। দুপুরবেলা আমি আর জয়া একটি লরি-চলা বড়ো রাস্তার উপর গিয়ে ধারাল গজাল ছড়িয়ে রেখে এলাম। শত্রুসৈন্যের গাড়ির চাকাগুলো জখম করবে এরা। এমন কিছু আমি সেদিন লক্ষ্য করলাম যাতে আমি দিনের দিন স্থিরনিশ্চয় হচ্ছিলাম—জয়ার সঙ্গে গেলে ভয় করে না, প্রত্যেকটা কাজই ভারী পরিষ্কারভাবে করে, ঠাণ্ডা মাথায় আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করে। বোধহয় এ জন্যই আমরা সকলেই জয়ার সঙ্গে কাজে যেতে ভালোবাসি।

"সে সন্ধ্যায় আমরা আমাদের কেন্দ্রের 'বাড়ি'তে ফিরলাম। পথে খবর দিয়ে এলাম, আমাদের কাজ আমরা সম্পন্ন করেছি। স্নানের ঘরে গা-হাত-পা ধুতে গেলাম। মনে আছে সেদিনই প্রথম আমি আর জয়া আমাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা বললাম। আমরা বিছানায় বসে, জয়া হাতদুখানা দিয়ে তার হাঁটু

জড়িয়ে আছে। খাটো চুল, গোলাপী গালওয়ালা মেয়েটি স্নানের পরে আমার কাছে খুব বাচ্চা বলে মনে হলো। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা আমাকে বল না, তুমি এখানে আসার আগে কি ছিলে?"

"'স্কুলের শিক্ষিকা।'

"'তাহলে তো তোমাকে আপনি বলতে হবে—' জয়া বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল।

"'আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, জয়া মেয়েদের তুমি বলত, আর ছেলেদের বলত 'আপনি' আর তারাও তাকে 'আপনি' বলে ডাকত। কিন্তু এখন এমনি মজা করে সে একথা বলল যে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম জয়া সত্যিই বাচ্চা মেয়ে, আঠারো বছরও হবে কিনা সন্দেহ, স্কুল থেকে সোজা এখানে এসেছে।

"আমি বললাম—তোমাকে হঠাৎ 'আপনি' বলা ধরতে হবে কেন? আমি তোমার থেকে মাত্র তিন বছরের বড়ো।'

"জয়াকে একটু চিন্তিত দেখাল, তারপরে বলল—'আচ্ছা তুমি কি কমসোমলের সভ্য?'

"'হ্যাঁ।'

"'তাহলে তোমাকে 'তুমিই' বলব। তোমার বাবা-মা আছেন?'

"'আছেন, আর একটি বোন।'

"'আমার একটি ভাই আর মা। আমার দশ বৎসর বয়সে বাবা মারা যান। মা নিজেই আমাদের মানুষ করছেন। আমাদের কাজ যখন সার্থক হবে, তোমাদের সবাইকে মস্কো নিয়ে মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তোমরা দেখো তিনি কি রকম ভালো। আর মা-ও তোমাদের সবাইকে কি রকম ভালোবাসবেন। আমি তোমাদের সকলকার সঙ্গেই বেশ ভাব করে ফেলেছি, যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।'

"এই আমাদের প্রথম খোলাখুলি কথাবার্তা।

"পরের দিন আমাদের আর একটা নূতন কাজ দেওয়া হলো। দল অদলবদল করে দেওয়া হলো, কিন্তু মেয়েদের দল ঠিকই রইল। জয়া, লিদা বুলগিনা, ভেরা ভলোশিনা, আর আমি। আমরা সবাই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আমাদের নতুন দলপতির নাম হলো বোরিস্ ক্রেইনভ। সে খুব শান্ত আর ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। কথাবার্তা একটু কড়া, কিন্তু কখনও খারাপ কথা বলে না, কাউকে বলতে দেয় না। জয়া ওর কথাগুলো বারবার আবৃত্তি করতে ভালোবাসত: 'তুমি খিস্তি করে করে শেষ করে দিতে পার, তাতে কিন্তু জ্ঞান তোমার বাড়ে না, আর অন্য কারোও বাড়ে না।'

"বেনজিনের বোতল আর হাতবোমা কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে আমরা শত্রুর পশ্চাৎদিকে যাত্রা করতাম। এবার আমাদের যুদ্ধ করে করে যেতে হয়েছিল, কিন্তু কেউ-ই আহত হয় নি। পরের দিন আমাদের আসল লড়াই শুরু হলো। তিনদিক থেকে গোলাগুলি চলতে লাগল, আমরা তার মধ্যে পড়ে গেলাম।

"ভেরা চেঁচিয়ে উঠল—'শুয়ে পড়।' আমরা মাটি আঁকড়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। গুলি ছোঁড়া থামলে পর আমরা গুঁড়ি মেরে মেরে প্রায় আটশ' মিটার দূরে চলে গেলাম, আর কেবল তখনই আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের তিনজন বন্ধুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

"জয়া অধিনায়ককে বলল—'আমি ফিরে গিয়ে দেখে আসি। আহতরা কেউ পড়ে আছে কিনা।'

"বোরিস জিজ্ঞাসা করল—'কাকে সঙ্গে নেবে?'

"'আমি একাই যাব।'

"'দাঁড়াও, জার্মানরা একটু চুপ করুক।'

"'না, তাহলে বেশি দেরি হয়ে যাবে।'

"'আচ্ছা, তাহলে যাও।'

"জয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে চলে গেল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু সে ফিরল না। একঘন্টা চলে গেল, আরও একঘন্টা—তারপর আরও... আমার মনে সেই ভয়াবহ ধারণা দৃঢ় হতে লাগল যে, জয়া নিহত হয়েছে।

"অবশেষে, প্রায় কাকডাকা ভোরে সে ফিরে এল। দু'হাতে বোঝাই তার অস্ত্রশস্ত্র, হাত তার রক্তমাখা, ক্লান্তিতে মুখ ম্লান।

"আমাদের তিনটি সঙ্গীই মারা গিয়েছে। জয়া গুঁড়ি মেরে মেরে ওদের কাছে গিয়ে ওদের সব অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিয়ে এসেছে। ভেরার পকেট থেকে ওর মার একটা ছবি তার কবিতা লেখা একটা নোটবই পেয়েছে; কোলিয়ার কাছ থেকে কিছু চিঠিপত্র।

"গভীর বনের ভিতরে শুকনো ফারের পাতা দিয়ে আমাদের প্রথম শিবির-বহ্নি জ্বালালাম, এতে ধোঁয়া হয় না। এত ছোট সেই আগুনটাকে ইচ্ছে করলে প্লেটে তুলে নেওয়া যায়। বড়ো আগুন জ্বালাতে আমাদের ভয় হচ্ছিল। আমরা হাত পা গরম করে, টিনের খাবারগুলোও গরম ক'রে নিলাম। শীত এসে যাচ্ছে, কিন্তু বরফ নেই কোথাও। জল পাওয়ার উপায় নেই, তৃষ্ণায় আমাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল।

"আমাকে পয়লা দফা খোঁজখবরের জন্য পাঠান হ'লো। আমি একটি ফারগাছের চারার উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছি কি না দাঁড়িয়েছি কয়েকটি হিটলার-পন্থী কোত্থেকে আবির্ভূত হয়ে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করল। ওরা কথা বলতে বলতে হেঁড়ে-গলায় হাসতে লাগল। প্রায় একঘন্টা কেটে গেল, আমার পা'দুটো অবশ, ঠোঁটদুটো শুকিয়ে উঠল। অবশেষে তারা চলে গেলে আমি আমার ব্যর্থ অনুসন্ধান থেকে শূন্যহাতে ফিরে এলাম। প্রথমেই জয়া এল আমার সঙ্গে দেখা করতে, কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে সে তার চাদরটা আমার গলায় ঘুরিয়ে বেঁধে দিল, তারপর আমাকে আগুনের পাশে বসিয়ে দিল। তারপর কোথায় যেন চলে গেল, হাতে একটা পাত্র নিয়ে ফিরে এসে বলল—'তোমার জন্য কিছু বরফের কুচি বাঁচিয়েছিলাম, গলে জল হয়েছে, এই নাও খেয়ে ফেল।'

"বললাম—'একথা আমি কখনো ভুলব না।'

"জয়া বলল—'খেয়ে ফেল।'

"আমাদের দল আবার এগিয়ে চলল। নিয়ম অনুযায়ী একশ' মিটার আগে আমি আর জয়া চললাম। আমাদের পিছনে দেড় মিটার তফাৎ রেখে একজন একজন করে বাকিরা আসতে লাগল। হঠাৎ জয়া থেমে হাত তুলে দলকে থামতে সঙ্কেত করল। দেখা গেল একটি মৃত লালফৌজের সৈনিক জয়ার সামনে রাস্তায় পড়ে আছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম, ওর পায়ে আর মাথায় গুলি করা হয়েছে। তার পকেটে এক টুকরো কাগজে লেখা ছিল,

'ট্যাংকপ্রতিরোধবাহিনী রোদিওনোভের অধিনায়কের নিকট থেকে। আমাকে একজন সাম্যবাদী বলে গণ্য করতে অনুরোধ করছি।' জয়া কাগজখানা ভাঁজ করে ভিতরের জামার ভাঁজকরা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তার মুখ বিষণ্ণ, ভুরু কুঁচকানো। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো তাকে আর মেয়ের মতো লাগছে না, দেখাচ্ছে শত্রুর উপর নির্মম প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প একজন সৈন্যের মতো।

"আমরা পেত্রিশেচেভোর দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে বিস্তর শত্রুসৈন্য জড়ো হয়েছিল। যাবার পথে আমরা যোগাযোগের তার বিচ্ছিন্ন করে যেতে লাগলাম, রাত্রে আমরা পেত্রিশেচেভো গ্রামে পেঁাছলাম। গ্রামটা গভীর জঙ্গলে ঘেরা, তার গহনে প্রবেশ করে আমরা বেশ বড়ো আগুন জ্বাললাম। একটি ছেলেকে অধিনায়ক পাহারায় পাঠালেন। অন্যরা আগুনের ধারে গোল হয়ে বসল। হলুদ, গোল চাঁদ উঠল। কয়দিন ধরেই বরফ পড়ছিল, বড়ো বড়ো ঘন পাতায় ঘেরা বরফে-ঢাকা ফারগাছ দাঁড়িয়েছিল চারদিক ঘিরে। লীদা বলল—"মস্কোর মানেঝনায়া স্কোয়ারে এরকম একটা ফারগাছ থাকলে বেশ হত।"

জয়া বলল—"এরকম করে সেজে থাকত যদি আরও ভালো হত।"

"তখন বোরিস আমাদের শেষ রেশনগুলো ভাগ করে দিতে লাগল। আমরা প্রত্যেকে পেলাম আধখানা বিস্কুট, একটুকরো চিনি, ছোট একটুকরো শুকনো মাছ। ছেলেরা তো এক গ্রাসেই সব খেয়ে ফেলল, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে চিবিয়ে খেতে লাগলাম—যেন সবটুকু উপভোগ করে নিতে চাই। জয়া পাশের ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল—'আমি অনেক খেয়েছি—তুমি এটা নাও।'

"সে তাকে বিস্কুট আর চিনি দিল।

"সে-ছেলেটি প্রথমে আপত্তি করে পরে নিল।

"আমরা সবাই চুপচাপ। লিদা বুলগিনা বলল—'আমার যে বেঁচে থাকতে কিরকম ইচ্ছা করছে!'

"সে-কথাগুলোর আওয়াজ আমি কখনো ভুলব না। সেগুলোর মধ্যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল যে আমাদের সামনে দীর্ঘ উন্নত জীবন পড়ে আছে। তখন জয়া মায়াকভস্কির কবিতা থেকে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল। আগে কোনদিন তাকে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনি নি। বড়ো চমৎকার লাগছিল ঃ রাত্রি, তুষারাচ্ছন্ন বনভূমি, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, তার সঙ্গে আবেগভরা, শান্ত, পরিষ্কার গলায় জয়ার আবৃত্তি ঃ

আকাশের পরে
ঝড়ের মেঘের ধ্বজা ওড়ে
বৃষ্টি ঝরে ঝরঝর
অন্ধকারে।
পুরানো মালগাড়ি একখানার নীচে
জড়াজড়ি করে ঘুমায় শ্রমিকের দল।
শোনে তারা
গর্বোদ্ধত ফিসফিসানি
জলধারার
আশেপাশে আর মাথার উপরে।'

এখানে চার বছরের মধ্যে
গড়ে উঠবে এক উদ্যান-নগরী।

"আমিও মায়াকভস্কির কবিতা ভালোবাসি. এই লাইনগুলো জানিও ভালো করে, কিন্তু সে-সময় আমার মনে হলো আমি যেন এই কবিতাটি প্রথম শুনছি।

ভূমিতল
ভিজে আর স্যাঁতসেঁতে
আরাম
খুব বেশি নয়
গোধূলি আঁধারে বসে
শ্রমিকদল
আঠাল রুটি চিবায়।
কিন্তু ঐ ফিস্‌ফিসানি
ছাপিয়ে ওঠে তাদের ক্ষুধাকে
প্রতিটি বিন্দু টুপটাপ করে
ঝরে মাটিতে
এখানে চার বছরের মধ্যে
গড়ে উঠবে এক উদ্যান-নগরী।

"আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম. প্রত্যেকেই নিস্তব্ধ. প্রত্যেকের দৃষ্টিই জয়ার উপরে। তার মুখখানা রক্তিম. তার গলার সুর বলিষ্ঠ হতে বলিষ্ঠতর হয়ে চলেছে—

জানি আমি
গড়ে উঠবে সে নগরী
জানি আমি
তার সবুজ উদ্যান হবে অপরূপ
যখন এমন জনগণ
রয়েছে সোভিয়েত দেশে।

"যখন জয়া শেষ করল—আমরা সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম—'আবার।'

"জয়া মায়াকভ্‌স্কির যতো কবিতা জানত সব আবৃত্তি করতে লাগল। জানতও সে অনেক। কি আবেগ নিয়ে সে 'য়্যাট দি টপ অব মাই ভয়েস' (আমার গলায় যত জোর আছে তত জোরে)—কবিতাটির অংশ আবৃত্তি করেছিল বেশ মনে আছে...

...আমি তুলে ধরছি
বলশেভিক পার্টি-সভ্যের মতো।
পুরো একশ খণ্ড গ্রন্থগুলি।
আমার পার্টি-সাহিত্যের।

"এমনি করেই শিবিরের আগুন, জয়া. মায়াকভ্‌স্কির কবিতা সবকিছু মিলিয়ে সে রাতটা আমি মনে রেখেছি।

"বোরিস বলল—'তোমার নিশ্চয়ই তাকে খুব ভালো লাগে।'

"'তা লাগে।' জয়া জবাব দিল, 'ভালো মন্দ নানা রকম কবি আছে. কিন্তু মায়াকভ্‌স্কি আমার বিশেষ প্রিয় কবিদের মধ্যে একজন।'

"জায়গাটার অবস্থা দেখাশোনা করা হয়ে গেলে পর জয়া আর বোরিসের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলাপ শুনতে পেলাম, 'তুমি এখানে পাহারায় থাক।'

" 'আমাকে দয়া করে বাইরের কাজে পাঠান।'

" 'কেবলমাত্র ছেলেদেরই বাইরের কাজে পাঠানো হয়।'

'বিপদ সমান ভাগ করে নিতে হয়—দয়া করে পাঠান।'

"ঐ 'দয়া করে পাঠান' কথাটা অনেকটা আদেশের মতো শোনাল। বোরিস রাজী হলো। আমি বেরিয়ে গেলাম অনুসন্ধানে, জয়া পেত্রিশ্চেভোতে গেল কাজে। যাবার আগে আমাকে বলল—'এস আমরা রিভলভার বদলাই। আমারটা তোমারটার থেকে ভালো। কিন্তু আমি তোমারটা আর আমারটা দুটোই সমানভাবে ব্যবহার করতে পারি।'

"ও আমার সাধারণ নাগান্ট রিভলভারটা নিয়ে তার অর্ধস্বংক্রিয়টা আমাকে দিল। আজও আমার কাছে সেটা আছে, ওটার নম্বর ১২৭১৯, তুলা আরমারী ১৯৩৫। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এটাকে হাতছাড়া করব না।

"জয়া তার কাজ থেকে 'নতুন মানুষ' হয়ে ফিরে এল। আর কোন কথা দিয়ে এটাকে বর্ণনা করা যায় না। একটা আস্তাবল আর একটা বাড়িতে সে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, আশা করে এসেছে 'কতকগুলি জার্মান সৈন্য আগুনে পুড়ে মরেছে।'

"বলল—'সত্যিকারের কোন কাজ করলে একেবারে যেন নূতন মানুষ বলে মনে হয় নিজেকে...।'

" 'তুমি কি এতদিন ধরে যা করছিলে, তা কাজ নয়? তুমি অনুসন্ধানে যেতে, যোগাযোগ ব্যবস্থা কেটে দিতে...'

"জয়া বাধা দিয়ে বলল—'এটা আর সেটা এক জিনিস নয়। সেটা যথেষ্ট নয়।'

" 'অধিনায়কের অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয়বার সে পেত্রিশ্চেভোতে গেল। আমরা তিনদিন ধরে অপেক্ষা করলাম, বাদবাকি ঘটনা সবই আপনি জানেন।'

"জয়া আমাকে বলত, আপনি আর আপনার ছেলেমেয়ে বড়ো সুখে আছেন, আর ক্বচিৎ কখনো আলাদা থেকেছেন। আমি ঠিক করলাম আমার যা বলবার আছে তা যতই অল্প হোক না কেন আপনার তা শুনতে ভালো লাগবে। যদিও আমার জয়ার সঙ্গে মাত্র এক মাসের পরিচয়, আমাদের দলের আর সবাইয়ের মতো আমিও আমাদের পরিচিত মানুষদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে চমৎকার বলে মনে করি।

"আপনি যখন পেত্রিশ্চেভোতে আসেন, তখন আমি আপনার ছেলেকেও দেখেছি। জয়ার কবরের কাছে আপনার পাশে সেও দাঁড়িয়েছিল। জয়া একবার আমাকে বলেছিল—'আমি আর আমার ভাই কিন্তু মোটেই একরকম নই, আমাদের দুজনের চরিত্র একেবারে আলাদা আলাদা রকম।' কিন্তু আমি শুরার দিকে চেয়ে বুঝলাম যে, তা ঠিক নয়। এখনও চোখের সামনে ভাসছে শুকনো চোখে জয়ার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে শুরা দাঁড়িয়ে।

"আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নাই। বুঝতে পারছি, আপনার দুঃখে সান্ত্বনা দেবার মতো কথা নেই ভাষার। কিন্তু কেবল এই কথাই আপনাকে বলতে চাই—জয়ার স্মৃতি মরবে না কোনদিন, মরতে পারে না। সে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। অন্যদের যুদ্ধে উৎসাহিত করবে তার স্মৃতি।

তার পদচিহ্ন আমাদের অনেকের যাত্রাপথ আলোকিত করবে। আমাদের ভালো-বাসা, আমাদের দেশজুড়ে আপনার সন্তানদের ভালোবাসাই প্রিয় লিউবোভ তিমোফিয়েভ্না আপনাকে ঘিরে থাকবে।"

—ক্লাভা মিলোরাদোভা

পেত্রিশেচোভা থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো মৃত জয়াকে 'সোভিয়েত দেশের বীর' খেতাব পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

মার্চের প্রথমদিকের এক ভোরে আমি ক্রেমলিনে জয়ার ডিপ্লোমা আনতে গেলাম। ঈষদুষ্ণ বসন্ত বাতাস আমার মুখে হাওয়া দিচ্ছিল, ভাবছিলাম আমার আর শুধু বেদনাদায়ক সেই ভাবনা—জয়া তো আর এসব দেখবে না। ও বসন্তকাল ভালোবাসত। এখন সে মৃত, রেডস্কোয়ারের উপর দিয়ে আর সে কখনও হাঁটবে না।

আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটি বড়ো উঁচু ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। কোথায় এসেছি প্রথমে বুঝতে পারি নি, হঠাৎ দেখলাম একটি ভদ্রলোককে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে।

"মিখাইল ইভানোভিচ্ কালিনিন!"—হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম।

হ্যাঁ মিখাইল ইভানোভিচ্ই আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। ছবিতে দেখে তাঁর চেহারা এমন চেনা হয়ে গিয়েছে, স্মৃতিসৌধের ভিতের উপরে কতবার যে তাঁকে দেখেছি। তাঁর রেখাবহুল করুণ চোখদুটো সদাহাস্যময় দেখেছি, আর এখন চোখদুটো দেখাচ্ছিল গম্ভীর বেদনাময়। তাঁর চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে মুখখানা এত ক্লান্ত মনে হচ্ছে...দুহাত দিয়ে তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন, খুব কোমল সুরে আমার স্বাস্থ্য আর শক্তির উন্নতি কামনা করে আমার হাতে ডিপ্লোমাটি তুলে দিলেন।

শুনলাম তিনি বলছেন—"আপনার কন্যার মহৎ কার্যের স্মৃতিস্বরূপ।"

একমাস পরে জয়ার দেহ মস্কোতে এনে নোভোদেভিচি কবরখানায় সমাহিত করা হলো। কালো মার্বেল পাথরের স্মৃতিসৌধ স্থাপনা করে তার উপর নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির অমর বাণী, যা জয়া একবার জীবনের আদর্শ বলে তার নোটবইতে লিখে রেখেছিল—খোদাই করে রাখা হলো—জয়া তার জীবন দিয়ে সেই বাণী সার্থক করেছে—"মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি হলো জীবন। সে জীবনও সে পায় মাত্র একবার।...কাজেই সে তার জীবন এমনিভাবে যাপন করবে যেন মরার সময় সে বলতে পারে আমার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য পৃথিবীর মহত্তম কার্যের জন্য দান করেছি,—সে কার্য মানব সমাজের মুক্তি।"

শুরা

সেই দিনগুলো ছিল শুরা আর আমার বড়ো দুঃখের। আমরা আর কারও জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম না কারণ জানতাম কেউ আর আসবে না ; আগে আমাদের জীবন ছিল জয়াকে আবার দেখব আবার তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করব—এই বিশ্বাসে ভরপুর। চিঠির বাক্সের কাছে তখন আমরা যেতাম

এই আশায় যে হয়ত জয়ার কোন খবর আসতে পারে—এখন আমরা সেটার দিকে না তাকিয়েই চলে যাই,—চিঠির বাক্সে কিছুই যে নাই তা আমরা জানি, আমাদের আনন্দ দিতে পারে এমন কোন কিছুই থাকতে পারে না।

আস্পেন বনে আমার বাবার কাছ থেকে বেদনাভরা দীর্ঘ চিঠি একখানা এল। জয়ার মৃত্যু তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে, তিনি লিখেছেন—'আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি করে এটা সম্ভব হলো, আমার মতো বুড়োমানুষ বেঁচে রইল আর জয়া মারা গেল।' এই কটা কথার মধ্যে কী যে হতাশাময়, কী সান্ত্বনার অতীত দুঃখ মিশে আছে—গোটা চিঠিটা চোখের জলের দাগে ভরা—কতগুলো কথা আমি পড়তেই পারলাম না।

দাদুর চিঠিটা পড়ে শুরা শান্তসুরে বলল, "বুড়োর জন্য আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে।"

এখন আমার জীবনে রইল শুধু শুরা। সেই আমার একমাত্র অবলম্বন। শুরা আমার জন্য যতটুকু সম্ভব সময় দিতে লাগল। যে আগে কোনরকম ভাবাবেগ দেখাতে লজ্জা পেত, সেই শুরা হলো এখন খুব কোমল স্বভাবের স্নেহময় ছেলে। পাঁচ বছর বয়স হবার পর থেকে শুরা আর আমাকে 'মামণি' বলে ডাকে নি, এখন সে আবার বলতে শুরু করল, 'মামণি'। আগে যা সে হয়ত লক্ষ্য করত না, আজকাল তাও লক্ষ্য করতে আরম্ভ করেছে। আমি সিগারেট খাওয়া ধরেছি, ও বুঝতে পারে যে চোখের জল গোপন করার চেষ্টায় আমি আজকাল দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাই। প্যাকেটটা খুঁজতে আরম্ভ করলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাছে এসে বলে—'কি ব্যাপার মুখখানা তোল দেখি, সত্যি! মামণি.... .'

রাত্রে আমার ঘুম না আসলে সে বেশ বুঝতে পারে। আমার কাছে এসে বিছানার পাশে বসে নীরবে আমার হাতে হাত বুলাতে থাকে। ও চলে গেলে আমার কেমন যেন নিরাশ্রয়, অবলম্বনশূন্য মনে হয়। শুরা এখন পরিবারের কর্তা হয়ে উঠেছে।

আবার স্কুল শুরু হয়েছে—পড়ার পর সোজা বাড়ি আসত, বিমান আক্রমণ না হলে বই নিয়ে বসে পড়ত। কিন্তু পড়ার সময়ও সে আমার কথা ভুলত না। কখনও কখনও আস্তে আস্তে ডাকত—'মা'।

"বল শুরা...।"

আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে যেত। বারেবারেই জিজ্ঞাসা করত—'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ? এখানটা একটু শোন...' ওর ভালোলাগা লাইনগুলো আমাকে পড়ে শোনাত।

একবার শিল্পী ক্রামস্কয়ের চিঠি পড়তে পড়তে সে বলল—"কথাটা বড়োই খাঁটি 'শিল্পীর সবচেয়ে বড়ো সম্পত্তি হলো তার হৃদয়।' বেশ চমৎকার করে বলা হয়েছে—না মা? আমিও ঠিক এই বুঝি ঃ খালি দেখার চোখ থাকলেই হলো না, শুধু দেখতে পারাই সব নয়, মর্ম বোঝা এবং তা অনুভব করতে পারাই আসল।" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল—'মা গো তুমি যদি জানতে, কি ভয়ানক পড়াশোনাই আমি করব যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে।'

আর একবার সে জিজ্ঞেস করল—'তুমি ঘুমোচ্ছ? রেডিওটা খুলে দি? মনে হচ্ছে ভালো গানবাজনা হচ্ছে।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। হঠাৎ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল চাইকভস্কির "পঞ্চম সিম্ফনি"। ঐ সময়টায় প্রতিটি ছোটখাট জিনিসই আমাদের পক্ষে ধৈর্যের পরীক্ষার মতো ছিল. এটাও তাই। জয়া সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত এই পঞ্চম সিম্ফনি। আমরা নীরবে শুনে গেলাম, জোরে নিশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছিলাম, পাছে সাইরেনের তীব্র ধ্বনি এসে এ প্রশান্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়, আমরা শেষ অবধি শুনতে না পারি।

যখন শেষ সুরটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল. শুরা বলল—'আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে—বিজয়ের দিনে পঞ্চম সিম্ফনির অন্তরাটি বাজানো হবে। তোমার কি মনে হয়?'

দিন চলে যেতে লাগল! মস্কো থেকে শত্রুসৈন্য হটিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা তখনও খুব প্রবল ছিল। জার্মানরা বেইলো-রুশিয়া, উক্রাইন-এর প্রায় সবটা. দখল করেছে। লেনিনগ্রাদ অবরোধ ক'রে রেখেছে—স্তালিনগ্রাদ-এর দিকে এগিয়ে আসছে। পথে তারা হত্যা করেছে. আগুন দিয়ে জ্বালিয়েছে। তারা অত্যাচার করেছে. আঘাত করেছে ফাঁসী দিয়েছে. ক্রুশবিদ্ধ করেছে। এই যুদ্ধে আমরা যা শিখেছি তাতে আগেকার দিনের অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতার কাহিনীও ম্লান হয়ে গিয়েছে। খবরের কাগজের সংবাদে মনপ্রাণ ব্যথিত হয়েছে, রেডিওর খবরে দমবন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

সোভিয়েত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বুলেটিন পড়ে শুরা দাঁতে দাঁত ঘষে. সারাঘরে অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করত, ভুরু তার কোঁচকানো. হাত মুষ্টিবদ্ধ।

মাঝে মাঝে তার সাথীরা দেখা করতে আসত। পাতলা ভলোদিয়া যুরিয়েভ. - সে জয়া আর শুরার পঞ্চম শ্রেণীর দিদিমণি লিদিয়া নিকোলাইয়েভনার ছেলে আমার পরিচিত যুরা ব্রাউদো. ভলোদিয়া তিতভ. আরও একটি ছেলে আসত তার নামটা মনে নেই কিন্তু পদবীটা হলো নেদেলকো। ক্রমশ তারা ঘন ঘন আসতে লাগল. কিন্তু যখনই আমি এসে পড়তাম তারা চুপ হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

"আমি আসা মাত্রই ছেলেরা চলে যায় কেন?"

"ওরা তোমাকে বিরক্ত করতে চায় না"—শুরা জবাব দিত।

দেশের চারদিক থেকে

একদিন চিঠির বাক্স থেকে খবরের কাগজ নেবার সময় আমার হাতে অনেকগুলো চিঠি পড়ল। হাতে নিয়ে প্রথম যেটা ঠেকল সেটাই খুললাম—সীমান্ত থেকে একটি তিনকোনা খামের চিঠি, স্ট্যাম্প নেই তাতে, ধারগুলো সামান্য দুমড়ানো।

"প্রিয় মা..." পড়তে পড়তে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার অপরিচিত লোক সব—কৃষ্ণসাগর নৌ-বাহিনীর নাবিকেরা লিখেছে।

ওরা আমার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে, জয়াকে নিজেদের বোন বলে স্বীকার করে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে তারা তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।

সেদিন থেকে প্রত্যেকদিনের ডাকেই মেলা চিঠি আসতে লাগল। কোথা থেকে যে না এসেছে! সব রণাঙ্গন থেকে, দেশের সর্বত্র হতে। এত সহৃদয় বন্ধুরা শুরা আর আমার প্রতি হাত বাড়িয়েছে, এত সব হৃদয় আমাদের নিয়েছে আপন করে। চিঠি এল ছোটদের কাছ থেকে, এল বড়দের কাছ থেকে। যাদের বাবা মারা গিয়েছে যুদ্ধে তারা, যাদের ছেলেমেয়ে যুদ্ধে নিহত হয়েছে সেইসব মায়েরা, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে সেইসব সৈন্যরা সবাই আমাদের দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে চাইল।

শুরা আর আমি খুব বড়ো ঘা খেয়েছি। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যাতে সেই ক্ষত সারাতে পারে, কিন্তু আমরা যে সব চিঠিপত্র পেয়েছি সেগুলি যে কতখানি আরাম দিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাদের দুঃখ শুধু আমাদের একারই নয়, কত লোক যে আমাদের দুঃখের ভাগ নিয়ে বোঝা হাল্কা করতে চেয়েছে—তাতে অনেকটাই আরাম, অনেকটাই সহায়তা দিয়েছে আমাদের—বেদনা ভোলার পক্ষে।

প্রথম কয়েকটা চিঠি পাওয়ার অল্প কিছুদিন পরই আমাদের দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে একটি অপরিচিত মেয়ে এসে প্রবেশ করল। পাতলা, লম্বা, বাদামী মুখের চেহারা, ছোট চুল, বড়ো বড়ো টানা টানা চোখদুটি—ধূসর রঙের নয় নীল—জয়ার কথা মনে করিয়ে দিল আমাকে। আমার সামনে লজ্জিত মুখে রুমালের কোণটা জড়াতে লাগল আঙুলে।

"আমি একটি অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে আসছি" একটু ইতস্তত করে লজ্জিতভাবে তার চোখের পাতা নুইয়ে সে বলল—"আমি......মানে আমাদের তরুণসঙ্ঘের ছেলেমেয়েরা...চাই যে আপনি আমাদের এখানে আসুন। আমাদের তরুণসঙ্ঘের কোন একটা মিটিং-এ এসে জয়া সম্বন্ধে কিছু বলুন আমাদের—আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনার পক্ষে বেশ কষ্টকর হবে—তবু বলছি...।"

আমি বললাম—আমি কোন বক্তৃতা দিতে পারব না, তবে আমি ওদের মিটিং-এ আসব।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমি ওদের কারখানায় গেলাম। মস্কোর শহরতলীতে সেটা, আশেপাশের অনেক বাড়ি বিধ্বস্তপ্রায় হয়েছে। আমার নীরব জিজ্ঞাসার জবাবে আমার গাইড বলল বোমা পড়ে আগুন লেগেছিল।

কারখানার ক্লাবে যখন আমরা প্রবেশ করলাম, মিটিং তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ল সভাপতির পিছনের টেবিল থেকে জয়ার মুখ চেয়ে আছে আমার দিকে। আমি একদিকে চুপচাপ শুনতে বসে পড়লাম।

একটি কিশোর বক্তৃতা করছিল। সে বলছিল এই দ্বিতীয় মাসেও প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হয় নি। সে রেগে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল। তারপর আর একটি আর একটু বড়ো ছেলে বলতে উঠল। এ ছেলেটি বলল, কারখানায় অভিজ্ঞ কর্মীর ক্রমশই অভাব ঘটছে, এবার তাদের বাণিজ্যের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর নির্ভর করতে হবে।

"কিন্তু কি ভীষণ জমে যাওয়ার মতো ঠাণ্ডা। কারখানা যেন মাটির তলায়

ঘরের মতো। ধাতুর উপরে হাত রাখলে তাও জমে যেতে চায়।" ঘরের পিছন থেকে ভেসে এল একটা গলা।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার সংগী বলে উঠল—"ছিঃ।"

মুহূর্তের প্রেরণায় আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে চাইলাম। তারা আমাকে নীচু একটি বেদীর দিকে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। যেতে যেতে জয়ার চোখের সংগে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো। এখন জয়ার ছবি আমার পিছন দিকে। একটু পাশে হেলানো, যেন আমার কনুইয়ে ভর দিয়ে আমায় উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে একটি কথাও বললাম না।

আমি বললাম—"প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তোমাদের ভাইবোনেরা রণক্ষেত্রে তাদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। ভুখা লেনিনগ্রাদ...প্রত্যেকদিনই শত্রুর বোমার আঘাতে লোক নিহত হচ্ছে..."

সেদিন আমি কি বলেছিলাম আজ আর তা মনে করার চেষ্টা করব না, কথাগুলো পরিষ্কার মনে নেই, আমার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি তরুণতরুণীদের চোখগুলো জানিয়ে দিচ্ছিল আমি সত্যি কথাই বলছি।

তখন তারা সংক্ষেপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে জবাব দিল—"আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করব।" যে প্রথমে কথা বলেছিল সেই বলল।

আরেকজন বলল—"আমাদের বাহিনীর নাম হবে জয়া।"

একমাস পরে—কারখানা থেকে তারা আমায় টেলিফোন করে জানাল—"লিউবোভ তিমোফিয়েভনা—আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কাজের থেকে বেশি করছি এখন" শুনলাম।

বুঝলাম শোকে অভিভূত হওয়া মানে জয়ার স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। হার মানলে চলবে না, হতাশ হলে চলবে না, হতাশ হবার আমার কোন অধিকার নেই। আমাকে বাঁচতে হবে, ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করতে হবে, আমার দেশবাসীর সুখের জন্য আমাকে বাঁচতে হবে। বিরাট জনতার সামনে কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে বড়ো শক্ত ছিল, কিন্তু আমাকে ডাকলে আমি না বলতে পারি না, প্রায়ই ডাক আসত আমার। অস্বীকার করতে আমার সাহসে কুলোত না, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার কথায় যদি ওদের সাহায্য হয়, লোকের কাছে পৌঁছায়, যুবসমাজকে নাড়া দেয় যদি শত্রুর সংগে যুদ্ধে যত সামান্যই হোক না কেন কিছু দান করতে পারি—আমার কর্তব্য হলো তা পালন করা।

বিদায় শুরা

"কোথায় গিয়েছিলে শুরা? এত দেরি হলো কেন তোমার?"

"মামণি—আমি দুঃখিত কিন্তু ক্ষমা কর তুমি আমায়, আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।"

দিনের পর দিন শুরা ক্রমশই আরও দেরি করে আসতে লাগল। কোনকিছু তাকে ভাবিয়ে তুলেছে, সারাক্ষণ ধরে তাই নিয়ে ভেবে চলেছে। কি আছে তার

মনে? ও তো আমাকে বলে নি। কারোর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করেই আমরা বরাবর আমাদের ভাবনা চিন্তা পরস্পরকে জানিয়ে এসেছি। এখন তাহলে কেন সে এত নীরব? কি ঘটেছে? আর কি আছে ভবিষ্যতের গর্ভে? হয়ত বা আস্পেন বন থেকে চিঠি এসেছে! সেখানে বুড়োরা ভালো আছে তো? আমি ভাবলাম শুরাকে সব জিজ্ঞাসা করব।

যেদিন এই সিদ্ধান্ত নিই, সেদিন আমি টেবিল পরিষ্কার করতে করতে পড়ে থাকা একটা কাগজ নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিলাম। কাগজটায় শুরার হাতে লেখা কয়েক ছত্র কবিতা—শত্রুকে পিষে মারার জন্য ক্যাপ্টেন গাসতেলোর মতো জ্বলন্ত ট্যাংক চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ড্রাইভারের সম্বন্ধেই কবিতাটি।

সাঁজোয়া গাড়ি খাত-কাটা পথ বেয়ে গর্জন করতে করতে ছুটল,
কোন শক্তিই আজ তাকে আটকাতে পারল না
পিছনে তার দমকে দমকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী
কালো মালার সাজ পরে চলেছে।
প্রতিশোধপরায়ণ তরবারির মতো কখনও এখানে কখনও ওখানে
বিদ্ধ করছে রসদবাহী গাড়িগুলিকে ধ্বংস করার জন্য
নিহত জার্মান সৈন্যদের মাঝে।
খাদ অতিক্রম করে ছুটে গেল সে
এত দ্রুত গতি তার, দৃষ্টিও তাকে অনুসরণ করতে পারে না,
যে ভূমি সে আজ দখল করেছে তার এক গজ মাত্রও সে কাল ছাড়বে না।
যদিও সে ভষ্মীভূত হলো আগুনে
তার গৌরবদীপ্ত বহুদূর বিস্তৃত,
ভাস্বর হয়ে থাকবে, যতদিন সাঁজোয়া গাড়িতে আঁকা
সোভিয়েত ভূমির তারকা জ্বল জ্বল করবে।

এই লাইনগুলো পড়তে পড়তে এমন কিছু আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যা এতকাল ভাবতেও ভয় পাচ্ছিলাম। শুরা চলে যাবে। সেও রণক্ষেত্রে যাবে, কোন কিছুই তাকে আটকাতে পারবে না—এখন পর্যন্ত সে আমাকে কিছু বলে নি, একটা কথাও সে আমাকে জানায় নি ; তার এখনও সতের বছর বয়স হয় নি, কিন্তু আমি জানি এটা ঘটবে।

আমার ভুল হয় নি। এক সন্ধ্যায় বাড়ি এসে আমাদের ঘর থেকে গোলমাল আর কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। দরজাটা খুলতেই চোখে পড়ল শুরা ভলোদিয়া, য়ুরা ব্রাউদো, ভলোদিয়া তিতভ্ আর নেদেলকো এই পাঁচজন বসে আছে, প্রত্যেকের মুখে একটা করে সিগারেট, ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার। সেই মুহূর্তের আগে আমি কখনো শুরাকে সিগারেট খেতে দেখি নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হচ্ছে তোমাদেব?"

শুরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে জবাব দিল, সে মনস্থির করে ফেলেছে যেন—"সেনাধ্যক্ষ নিজে আমাদের খাইয়েছেন—আমরা...উলিয়ানোভস্ক্ ট্যাংক শিক্ষা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাচ্ছি—ওরা আমাদের মনোনীত করে ফেলেছে।"

নীরবে আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

শুরা আমার বিছানার পাশে বসে সে রাত্রে বলল—"মা মণি, একটু ভেবে দেখ—বুঝতে চেষ্টা কর—অপরিচিত লোকেরা তোমার কাছে চিঠি লিখছে—আমরা জয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব, আর আমি তার নিজের ভাই হয়ে কি করে

বাড়িতে বসে থাকতে পারি? কি করে তাহলে আমি লোকের মুখের দিকে তাকাব বল দেখি?"

আমি চুপ করে রইলাম, জয়াকে থামাবার মতো কথা যদি আমি না পেয়ে থাকি, শুরাকে বাধা দেবার মতো কথাই বা কোথায় পাব?

১৯৪২ সালের ১লা মে শুরা চলে গেল।

বন্ধুদের সম্বন্ধে শুরা বলল—"ওদের কেউ বিদায় দিতে আসবে না, তোমারও আমাকে বিদায় দিতে আসার প্রয়োজন নেই, তারা তাহলে দুঃখ পাবে। কেমন? শুধু আমার শুভযাত্রা কামনা কোরো।

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম। আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল কান্নায়। আমার ছেলে আমায় আলিঙ্গন করে চলে গেল। তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, এবার আমি একেবারে একলা হলাম।

কয়েকদিন পর আস্পেন বন থেকে চিঠি এল, মা মারা গিয়েছেন। বাবা লিখেছেন জয়ার মৃত্যুর ধাক্কাটা তিনি সামলাতে পারেন নি।

উলিয়ানোভস্ক্ স্কুল

শুরা প্রায় প্রতিদিনই আমাকে চিঠি লিখত। তার বন্ধুদের সঙ্গে একই বিভাগে ওকে রাখা হয়েছে। তামাসা করে সে এর নাম দিয়েছিল "মস্কোর ২০১ স্কুলের দশম শ্রেণীর উলিয়ানোভস্ক্ শাখা।"

প্রথম দিকে একটা চিঠিতে সে অনুযোগ করেছিল—"আমি একেবারেই কোন কাজের নয়, এমন কি আমি লাইন করে চলতেও জানি না। আজও আমি একটা ছেলের পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম। অধিনায়ককেও অভিবাদন করতেও ভুলে যাই। আর তার জন্যে তারা নিশ্চয়ই আমাকে গাল টিপে আদর করে না।"

দিন যায়। আর একটি চিঠিতে লিখল—"আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, ঘুমাতে পারি না ঠিকমতো, কিন্তু খাটতে হয় গাধার মতো। রাইফেল, হাতবোমা আর রিভলভার চালাতে এর মধ্যেই শিখে ফেলেছি। সেদিন আমরা লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে একটা পুকুর থেকে গুলি ছুঁড়েছি। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে আমার নম্বর খুব খারাপ নয়। পুকুর থেকে বন্দুকে ৪০০ মিটার আর কামানের ৫০০ মিটার পাল্লায় লক্ষ্যভেদ করে আমি বেশ ভালো নম্বর পেয়েছি। তুমি আর আমাকে চিনতে পারবে না আজকাল, আমি অধ্যক্ষকে অভিবাদন করতে শিখেছি ভালো করে, আর লাইনও আজকাল আমার ভেঙে যায় না।"

পরীক্ষার আগে শুরা প্রতিটি চিঠিতে আমার কাছে লিখতে আরম্ভ করল, 'মা, যদি পার আমাকে একটা চওড়া বেল্ট, একটা কাঁধের বেল্টও দিও।' আবার কয়দিন পরে লিখল 'মা গো বেশ করে চেষ্টা কর, আমার বেল্ট যদি ভালো না হয় তো কি রকম অফিসার যে দেখাবে।' কথাগুলোর ভিতর দিয়ে ছোট শুরার চোখ দুটো ভেসে উঠলো আমার চোখে, ঠিক এমনি করেই সে চাইত ছোট-বেলায়, যদি খুব ইচ্ছে হতো তার কোনকিছু নেবার জন্য।

শুরার শতখানেক চিঠি পড়ে আছে আমার সামনে। তার মধ্যে প্রথম ও

শেষ চিঠিও আছে—সেগুলি পড়ে আমি যেন আবার দেখতে পাচ্ছি কি করে আমার ছেলে শৈশব থেকে ক্রমশ তরুণ বয়সে পেঁাছোল।

একদিন শুরার কাছ থেকে চিঠি পেলাম—"মা আমাদের শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এল, আগামী ১লা নভেম্বর আমাদের পরীক্ষা। আমি বড়ো ক্লান্ত, ঘুমাতে পাই না বেশি, কিন্তু আমি কাজ করে যাচ্ছি ঠিক। আমি এখানে এসেছি অন্যেরা আসার আধাআধি সময়ের পরে, তাতে অনেক তফাৎ হয়েছে, আমি পিছিয়ে পড়েছি।

"এই পরীক্ষা আমার জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়, কারণ আমার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য আর মনযোগ দিয়ে এটা পাশ করতে চাই, কারণ আমার দেশ আমাকে সার্জেন্ট হিসাবে কি তরুণ সহকারী হিসাবে চায় না, চায় সুশিক্ষিত ট্যাংক লেফটেনান্ট। জানো মা এটা গর্ব বা বিলাসমাত্র নয়, আমাকে সবকিছু করতেই হবে, দেশের প্রয়োজনে লাগবার জন্য। কি করে ফ্যাসিস্ত বর্বররা আমার গ্রাম নগর পুড়িয়ে ধ্বংস করছে, কিরকম করে আমাদের মেয়েদের, শিশুদের উপর অত্যাচার করছে, কাগজে সব পড়ি ; আমার মনে পড়ে কি করে তারা জয়ার উপর অত্যাচার চালিয়েছিল ; আমি একটিমাত্র জিনিস চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রণক্ষেত্রে যেতে।"

আর একটা চিঠিতে লিখেছে- "শোন মা, সরকারী পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, যন্ত্র-শিক্ষার বিষয়গুলিতে পেয়েছি 'চমৎকার', বন্দুক ছোঁড়ায় 'চমৎকার', রণকৌশল আর ভূতত্ত্ববিদ্যায় 'চমৎকার'..."

সাফল্যের উৎসাহ ও গর্বভরা এই চিঠিখানার শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে —"দাদুর কাছ থেকে চিঠি এসেছে—তিনি অসুস্থ, বড়ো একলা।"

শরতের এক অল্পগরম সন্ধ্যায় রাস্তার দিকে চেয়ে আমি জানালায় বসেছিলাম, আমার সামনে কতকগুলো চিঠি পড়েছিল, যার উত্তর দিতে হবে ; তবুও আমি মেঘশূন্য আকাশের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। হঠাৎ একজোড়া চওড়া হাত আমার চোখ টিপে ধরল পিছন থেকে—

"শুরা" কেবল এইটুকুই আমি বলতে পারলাম। হাসতে হাসতে বলল— "আমার দরজা ধাক্কানো বা আসা তুমি কিছুই শুনতে পাও নি। দরজায় দাঁড়িয়ে আমি তোমার দিকে চেয়েছিলাম তুমি তো ওখানে বসেই রইলে।" বোধহয় যা সে বলতে চায় তা সহজভাবে আমাকে শোনাবার জন্য শুরা আবার আমার চোখ ঢেকে ধরে বলল, "তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম মাগো—কাল যে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাচ্ছি।"

সে এখন রীতিমতো পূর্ণবয়স্ক যুবক, তার কাঁধগুলো আগের চেয়েও চওড়া, কিন্তু তার নীলচে চোখদুটো আগেরই মতো শিশুর সারল্যে আর আনন্দে ভরপুর।

আর একবার আমার দুঃখের রাত উদ্বেগে আর ভবিষ্যতের ভাবনায় কাটল। শুরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এক হাত তার চিবুকের নীচে। আমি বারেবারে উঠে ওর দিকে তাকাতে লাগলাম, রাতটা শেষ হয়ে যাবে ভাবতে আমার ভয় করতে লাগল। কিন্তু ঠিক সময়মতোই ভোর হলো। শুরা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরল, কোন মতে এক কাপ

চা গিলে নিল, আমার কাছে এসে রোজকার মতো বলল, আমাকে বিদায় দিতে যেও না যেন, শরীরের যত্ন নিও, আমার জন্যে ভেবো না।

আমি কষ্টেসৃষ্টে বললাম—"সৎপথে থেকো, সংকল্পে অটুট থেকো...চিঠি-পত্র দিও..."

যুদ্ধের সংবাদদাতা

শুরার যাবার পর একমাস চলে গিয়েছে, কোন চিঠিপত্র আসে নি, পাছে কোন ভয়ানক খবর পাই, সেই আশঙ্কায় আমি চিঠির বাক্সের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলাম...। সেই দিনগুলো ছিল ভারী দুঃখের, এত বেদনাদায়ক অমঙ্গলের কথা সব মনে হতে লাগল যা জয়া যাবার পরও আমার মনে আসে নি। কারণ সন্তান হারানো যে কী তা তখন আমি জানতাম না, এখন জানি।

সময় সময় আমার এত আতঙ্ক হতো যে আমি তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পালাতে চাইতাম, যেন নিজের ভাবনার হাত থেকে পালানো যায়। রাস্তায় নেমে পড়ে আমি খুব হেঁটে নিজেকে খুব ক্লান্ত করে ফেলতে চাইতাম, যাতে বাড়ি এলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু আমি তাতে সফল হতাম না, যত রাস্তাই ঘুরি না কেন, যত মাইলই হাঁটি না কেন, রাত্রি আমার না ঘুমিয়েই কাটত, চোখদুটো আমার খোলাই থাকত।

প্রায়ই আমি নোভোদেভিচি সমাধিক্ষেত্রে জয়ার সমাধি দেখতে যেতাম। একবার আমি সমাধির পাশে একজন চওড়া কাঁধওয়ালা সৈনিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি কাছে আসতে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। বয়স তাঁর বছর পঁয়ত্রিশ, সুন্দর মুখ। পরিষ্কার মর্মভেদী ধূসর তাঁর চোখ দুটি। মনে হলো তিনি আমাকে কিছু বলবেন, আমি জিজ্ঞাসাভরা চোখে তাঁর দিকে তাকালাম, কিন্তু এক মুহূর্ত চিন্তা করে তিনি ফিরে গেলেন। মন থেকে তাঁকে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু বাড়ির দিকে ফেরার সময় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলো মোড়ের মাথায় ; তিনি আমার দিকেই আসছিলেন।

ইতস্তত করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি লিউবোভ তিমোফিয়েভ্না।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—"হ্যাঁ।"

তখন তিনি নিজের পরিচয় দিলেন—"আমার নাম লিদভ্।"

নামটা আমি ভুলি নি। লিদভ্ই সেই স্মরণীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রাভদায়— তরুণ গেরিলা তানিয়া কি করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন সেই কাহিনী...। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করলাম। ধীরে ধীরে আমরা গেটের বাইরে পা বাড়ালাম।

আমি উৎসাহভরে বললাম "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভারী খুশি হলাম। অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল..."

আমরা এমনভাবে কথা বলতে লাগলাম যেন আমাদের কতকালের পরিচয়। তিনি আমাকে বললেন কি করে প্রথম তিনি জয়ার কথা শোনেন। মোঝাইস্ক

গ্রামের এক ছোট অর্ধভগ্ন কুটিরে তিনি সে রাত্রে ছিলেন। যখন প্রায় সব সৈনিকরা ঘুমিয়ে পড়েছে একটি বৃদ্ধ এলো ঘরে হাত পা গরম করতে, লিদভ-এর পাশে মেঝেতে সে শুয়ে পড়ল।

লিদভ বললেন—"বৃদ্ধ ঘুমাতে পারছিল না, তার দীর্ঘনিঃশ্বাসে আর কাতরানিতে মনে হচ্ছিল সে ভারী দুঃখিত হয়েছে", আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় যাবে তুমি, কি যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার?"

তখনই সেই বৃদ্ধ লিদভকে বলে, পেত্রিশ্চেভ গ্রামে যে মেয়েটিকে হিটলারের চেলারা ফাঁসী দিয়েছে, সে মেয়েটির কথা সে কি শুনেছে, খুঁটিনাটি সব সে জানত না, বারেবারেই সে বলতে লাগল ওরা তাকে যখন ফাঁসী দিচ্ছিল তখন সে যা বক্তৃতা দিয়েছিল...

তক্ষুণি লিদভ পেত্রিশ্চেভ গ্রামে গেলেন। সে রাত থেকে দশদিন দশরাত্রি, তানিয়া বলে পরিচিত মেয়েটির মৃত্যুর প্রতিটি খুঁটিনাটি খবর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি মুহূর্তমাত্রও বিশ্রাম নিলেন না। তিনি কেবল সত্য ঘটনাগুলিই লিখেছেন কারণ তাঁর ধারণা সাংবাদিক বা সাহিত্যিককে নিজের মনগড়া বর্ণনার চেয়ে সত্য ঘটনাই বেশি হৃদয়গ্রাহী।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন না কেন?"

তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"আমার ভয় হয়েছিল আপনার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে।"

"আপনি কি রণক্ষেত্রে অনেকদিন ছিলেন?"

এই প্রথম তিনি হাসলেন, সারা মুখ তাঁর সে স্বচ্ছ সুন্দর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন—

"যুদ্ধের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আছি. মস্কোবাসীরা যখন যুদ্ধের কথা শোনেও নি সেই ২২শে জুন আমি ছিলাম মিনস্কো প্রাভদার সংবাদদাতারূপে।

আবার তিনি হাসলেন, তাঁর মনে পড়ল, একবার খুব বোমা পড়ছে, তিনি টেলিগ্রাফ অফিসের মাটির নীচের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। মস্কো থেকে আগের দিনের পাঠানো একটা টেলিগ্রাম দেওয়া হলো তাঁকে।

টেলিগ্রামটি বড়ো ঠান্ডা ধরনের ঃ সম্পাদকেরা চান লিদভ্ ফসলকাটা অভিযানের প্রস্তুতি বিষয়ে লিখুন। টেলিগ্রামটা পকেটে পুরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই কেন্দ্রের সন্ধানে, যেখানে আত্মরক্ষার অভিযানের প্রস্তুতি চলছে। মিনস্কের রাস্তাগুলো এর মধ্যেই আগুনে ছেয়ে গিয়েছে, চারদিকে বোমা পড়ছে।

সেদিন লিদভ্ 'প্রাভদা'য় একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন সত্যি। কিন্তু সেটা ফসলকাটার অভিযান সম্বন্ধে নয়।

সহজভাবে মাত্র কয়েকটি কথায় তিনি এসব আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। চলতে চলতে আমি ভাবলাম, বছরের পর বছর ধরে একটা লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েও হয়ত তার সঠিক পরিচয় জানা যায় না। আমি তো মাত্র এক ঘন্টারও কম সময় লিদভের সঙ্গে কাটিয়েছি, তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিছুই তিনি আমাকে বলেন নি, তবুও তাঁর অনেক কিছুই আমি জানতে পেরেছি। প্রধান কথাটাই আমি জানি। জানি যে তিনি সাদাসিধা, স্পষ্টবক্তা, সৎ, সাহসী আর

সুস্থমস্তিষ্কের লোক, যে কোন অবস্থাতেই হোক তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে, মানিয়ে চলবেন। এও জানি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কাজের মধ্য দিয়ে, কথার মধ্যে নয়, তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে তাঁর চারিপাশের লোককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও শান্ত থাকতে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি।

বিদায় নেবার সময় তিনি বললেন—"আমি কাল আবার যাচ্ছি রণক্ষেত্রে ; যুদ্ধ শেষ হবার পর আমি জয়ার সম্বন্ধে একখানা বই লিখব নিশ্চয়ই।"

পাঁচটি ছবি

১৯৪৩ সালের ২৪শে অক্টোবর আমার আর এক পরীক্ষা এল। কাগজে পাঁচটা ছবি বার হলো, স্মোলেনস্ক-এর কাছে পোতাপোভোতে রুশসৈন্যের হাতে নিহত এক হিটলারপন্থী জার্মান কর্মচারীর কাছে সেগুলো পাওয়া গিয়েছে। জার্মানটা জয়ার ফাঁসি, তার জীবনের শেষ ঘটনার ছবি নিয়েছিল। আমি দেখতে পেলাম চারদিকে বরফে ঘেরা জয়ার ফাঁসীর মঞ্চটা, জার্মানদের ঘিরে রাখা আমার মেয়ে জয়াকে, তার বুকে ঝোলান 'গৃহদাহকারী' লেখা কাঠের টুকরোটা, আর যারা তাকে অত্যাচার করেছে, যন্ত্রণা দিয়েছে দেখলাম তাদেরও।

যেদিন আমি আমার মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম সেদিন থেকে দিনে-রাত্রে একটিমাত্র চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—শেষ ভয়াবহ যাত্রার সময় তার মনোভাব কিরকম ছিল, কি সে ভাবছিল? অসহায় এক কামনা আমাকে পেয়ে বসেছিল—আমাকে যখন তার সবচেয়ে প্রয়োজন তখনই কেন আমি তার পাশে ছিলাম না, তার শেষমুহূর্তগুলি কেন আমি দৃষ্টিতে, কথায় ভরিয়ে তুলতে পারলাম না? এখন এই পাঁচখানি ছবি যেন আমাকে জয়ার শেষ যাত্রাপথে নিয়ে গেল। এখন আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি—ওরা তাকে হত্যা করছে, আমি সেখানে এবার উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ঃ ছবিগুলো যেন চিৎকার করে বলছে—দেখ কিরকম অত্যাচারটাই তার উপর করেছে, তার মৃত্যুর নীরব সাক্ষী হয়ে থাক। তার ও তোমার সব ব্যথা ও যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে নবজন্ম লাভ করে বেঁচে ওঠ...।

ঐ যে জয়া হাঁটছে অত্যাচারিত, নিরস্ত্র, কিন্তু তবু তার ঈষৎ নমিত মুখে কি অপূর্ব শক্তি আর গর্বের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সেই অন্তিম মুহূর্তগুলিতে সে তার পাশে ঘাতকের উপস্থিতি অনুভব করতেই পারে নি নিশ্চয়। কি সে ভাবছিল? মৃত্যুর জন্য কি সে প্রস্তুত হচ্ছিল? সে কি তার সংক্ষিপ্ত সুখী জীবনের কথা ভাবছিল?

নিজে সে বিষয়ে লেখার সাধ্য আমার নেই। যারা এ বই পড়বে তারাই ঐ ভয়াবহ জার্মানগুলোর ছবিগুলো দেখুক আর জয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করুক। তার হত্যাকারীরা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে, তার কাছে এখন পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ, উচ্চ, সুন্দর, পবিত্র, যা কিছু মানবিক, যা মরে না, মরতে পারে

না তাই-ই বিরাজ করছে। আর ওরা—ওরা তো মানুষ নয়, ওদের মনুষ্যত্ব নেই, ওরা পশুও নয়—ওরা ফ্যাসিস্ত, ওদের ধ্বংস অনিবার্য, বেঁচে থেকেও ওরা মৃত। আজ হোক্, কাল হোক্, হাজার বছরে হোক্, ওদের নাম, এমন কি ওদের সমাধিক্ষেত্র পর্যন্ত লোকের কাছে ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

আমি বাঁচতে চাই

শুরার কোন চিঠি এখনও এলো না...কিন্তু ছবি পাঁচটা পাওয়ার কিছুদিন পর আমি 'প্রাভদা' খুলে তৃতীয় পৃষ্ঠায় একটা খবর পেলাম ঃ

"রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনী ঃ ২৭শে অক্টোবর (তারযোগে প্রাপ্ত) দশম বাহিনীর সৈন্যদল ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত, তারা ১৯৭ জার্মান পদাতিক বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন ছত্রভঙ্গ করে অবশিষ্ট যা আছে তাও ধ্বংস করতে ব্যস্ত। এই বাহিনীই ১৯৪১ সালে নভেম্বর মাসে পেত্রিশ্চেভো গ্রামে আমাদের বীর তরুণী জয়া কসমোদেমিয়ানস্কায়ার উপর অত্যাচার করে ও তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে। প্রাভ্দায় প্রকাশিত তার ফাঁসীর ছবিগুলি আমাদের সৈন্য ও অফিসারদের ক্রোধের আগুনে নতুন ইন্ধন জুগিয়েছে। জয়ার ভাই, যুবক-সঙ্ঘের সভ্য সাঁজোয়া বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কসমোদেমিয়ানস্কি দিদির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় দুর্দান্ত লড়াই করছেন। অধিনায়ক কমরেড কসমোদেমিয়ানস্কির নেতৃত্বে 'কে. ভি'. ট্যাঙ্ক বাহিনীর সৈন্যরাই প্রথমে শত্রু অধ্যুষিত জায়গা দখল করে গুলি চালিয়ে হিটলার-বাহিনীকে নিষ্পেষিত করে তোলে। মেজর জি. ভেরশিনিন।"

শুরা তাহলে বেঁচে আছে। তার বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে! আর যে সৈন্যগুলো জয়ার উপর অত্যাচার করে করে তাকে মেরে ফেলেছে তাদেরই শুরা ধ্বংস করছে।

আবার আমি চিঠি পেতে লাগলাম—এবার আর শান্ত উলিয়ানোভস্ক্ থেকে নয়—একেবারে কোলাহলমত্ত রণক্ষেত্র থেকে।

আর ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারি দরজার ঘন্টার শব্দে জেগে উঠলাম।

"কে হতে পারে?" আমি বেশ জোরেই ভাবতে শুরু করে দরজা খুলেই ঘটনাটির আকস্মিকতায় সেখানে যেন গেঁথে গেলাম। দরজার চৌকাঠে এঁটে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছেলে, শুরা।

আমার তো তাকে রীতিমতো বিরাট মনে হচ্ছিল। মস্ত এক কোটপরা, বৃষস্কন্ধ ঋজুদেহ, কোট থেকে এখনও তুষারকণার গন্ধ মিলিয়ে যায় নি, দ্রুত হাঁটার এবং হাওয়ার দরুন তার মুখখানা চক্চক্ করছে—তুষারকণাগুলো তার ভুরু আর চোখের পাতায় আস্তে আস্তে গলে জল হয়ে যাচ্ছে, চোখদুটো আনন্দে নাচছে।

হাসতে হাসতে বলল—"এমন করে তাকিয়ে আছ কেন? আমাকে চিনতে পারছ না?"

আমি জবাব দিলাম—"তোমাকে দেখে 'ইলিয়া মুরোমেৎস' বলে মনে হলো"। নববর্ষের সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে অভাবনীয় উপহার এটি।

বাড়ি আসায় শুরার আনন্দও কম নয় আমার চেয়ে।

একটি মুহূর্তের জন্যও সে আমার পাশ ছেড়ে নড়ত না, আর যদিও বা যেতে চাইত হয়ত বা সিগারেট কিনতে বা একটু বেড়িয়ে আসতে আর তখন ছোট্ট ছেলের মতো বলত—"মা তুমিও এস না আমার সঙ্গে।"

দিনে কতবার যে একই কথা জিজ্ঞেস করত—"বল না আমাকে তুমি কি করে দিন কাটাও।"

"কিন্তু সবই তো আমি তোমাকে লিখেছি!..."

"তোমার কি এখনও চিঠি আসে? দেখাও না আমাকে,...দাও আমি তোমার উত্তর লিখতে সাহায্য করি।"

সত্যিই আমার সাহায্য দরকার ছিল, অফুরন্ত স্রোতের মতো চিঠিপত্র আসছিল।

লোকেরা আমার কাছে, জয়ার স্কুলে, খবরের কাগজের সম্পাদকদের কাছে, যুবসংঘের জেলা কমিটির কাছে চিঠি লিখত।

অক্তিয়াব্রিনা স্মিরনোভা নামে জয়ারই সমবয়সী একটি মেয়ে স্তালিনগ্রাদ থেকে আমার কাছে লিখল—"আমি যখন শান্ত্রীর পাহারায় থাকি মনে হয় যেন জয়া আমার পাশে পাশে আছে।"

জয়ার বয়সী আর একটি মস্কোর মেয়ে সীমান্তে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে যুবসঙ্ঘের তাগানস্কি জেলা কমিটির কাছে লিখল—"আমি শপথ করছি আমি সৎভাবে মানুষের সেবা করব—আমি জয়ার মতো হব।"

বস্‌কির অটোনোমস রিপাবলিক থেকে একটি তরুণ শিক্ষিকা লিখল—"আমার ছাত্রীদের আমি গড়ে তুলব জয়ার মতো করে—তোমার বীর মেয়েটির মতো হতে শেখাব তাদের।"

নভোসিবিরস্ক-এর একটি স্কুলের ছেলেমেয়েরা লিখেছে—"এটা আমাদেরও শোক, সমস্ত জাতির শোক।"

আসতে লাগল চিঠিপত্র, অকপট, দরদভরা শপথ, কবিতা এই সব—সাইবেরিয়া থেকে, বাল্টিক অঞ্চল থেকে, উরাল অঞ্চল থেকে, তিবলিসি থেকে পর্যন্ত। বিদেশ থেকেও চিঠি আসত—ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা থেকে—

শুরা সবগুলো পড়ল—তারপর ইংলণ্ড থেকে আসা একখানা চিঠি পড়তে লাগল আবার। এর অনুবাদটা আমি রেখেছি—

প্রিয় কমরেড লিউবোভ কসমোদেমিনস্কায়া—

আমি আর আমার স্ত্রী লণ্ডনের ঠিক বাইরে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে থাকি। এইমাত্র আমরা তোমার বড়ো আদরের বীর মেয়েটির কথা পড়লাম। মৃত্যুর পূর্বে যে কথাগুলি সে বলেছিল তা পড়ে আমাদের চোখে জল এসেছে—এত ছোট্ট একটি মেয়ের মধ্যে এত বীরত্ব, এত সাহস ছিল। আগামী বছরের প্রথম দিকে আমাদের প্রথম শিশু জন্মাবে, সে যদি মেয়ে হয় তার নাম রাখব-জয়া—প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহান জনতার বীর কন্যার নাম।

অপরিমিত প্রশংসার সঙ্গে আমরা আপনাদের মহান সংগ্রামের কথা শুনি আর পড়ি। খালি প্রশংসাই তো আর বড়ো কথা নয়, আমরা আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে চাই। এখন যা প্রয়োজন তা হলো কাজ, কথা নয়। আমরা স্থির জানি, আপনাদের ও আমাদের সমভাবে ঘৃণিত এই নাৎসী

বর্বরতার ধ্বংস হবার দিন আর বেশি দূরে নয়। আপনার দেশবাসীর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবেই, তাদের সাহস, বীরত্ব আর সহনশীলতা ফ্যাসিস্তদের পরাজিত করার পথে প্রধান সহায়। ব্রিটিশ জাতি স্বীকার করে যে রাশিয়ার কাছে তাদের ঋণ অপরিশোধনীয়, এখানকার লোকেরা প্রায়ই বলে রাশিয়ানরা না থাকলে আমাদের কি হতো বলত!

সিনেমা হলে যখন পর্দার উপরে স্তালিনকে দেখা যায় হাততালির সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় জনতার স্বাগত ধ্বনি 'হুর্‌রে!' আমরা এই সদিচ্ছা দিয়ে আমাদের চিঠিখানি শেষ করছি--যুদ্ধে কিংবা শান্তিতে আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হোক।

সোভিয়েতের জনগণ ও তাদের অজেয় লালফৌজ জিন্দাবাদ—

ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন গ্রহণ করুন—,
মেব্‌ল্ আর ডেভিড রীজ।

শুরা জিজ্ঞেস করল—"তুমি এদের জবাব দিয়েছ? বেশ, আমার তো মনে হচ্ছে এটা হৃদয় থেকে লেখা। না মা? দেখা যাচ্ছে যে ওরা বুঝতে পারছে আমরা শুধুমাত্র আমাদের জন্যই নয়, প্রত্যেকের জন্যই লড়ছি। আমি শুধু ভাবছি তারা যেন ভুলে না যায় সেকথা!"

সন্ধ্যাবেলা আমার ভাই সার্জি এসে উপস্থিত। শুরা তো ওকে দেখে মহাখুশি। তারা দুজনে টেবিলের কাছে মুখোমুখি বসে অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলতে লাগল। আমি ঘরের কাজ করতে করতে এক-আধবার যাওয়া আসা করছিলাম, টুকরো টুকরো কথা কানে আসছিল মাত্র।

"একবার তুমি আমাকে লিখেছিলে না যে নিজের লাইন ছেড়ে দিয়ে তুমি শত্রুর পিছনদিকটায় গিয়ে আক্রমণ করেছ? কি জন্য? এটা তো বীরত্ব নয়, গোঁয়ার্তুমি মাত্র। এটা আমার মোটেই পছন্দ হয় নি। তোমাকে সাহসী হতে হবে, তাই বলে এইরকম বেপরোয়া হবার কি মানে?"

ক্রুদ্ধ জবাব এল—"নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে শুরু করলে আর বীরত্বের কথা ভাববার সময় থাকে না।"

"তুমি কি তোমার সৈন্যদলের ভালো মন্দের জন্য দায়ী নও? তুমি তো ওদের হর্তাকর্তা..."

একটু পরে আবার শুনলাম--"আচ্ছা শুরা বলত, তোমার অধীনে যারা কর্মচারী তাদের সঙ্গে তোমার কী রকম ভাব? ভুল বুঝো না আমাকে... সাধারণত তরুণদের নিজেদের সম্বন্ধে খুব বড়ো ধারণা থাকে.."

"আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব আছে তুমি যদি জানতে তারা কিরকম লোক..."

আবার শোনা গেল আমার দাদার গলা—"বীরত্ব সম্বন্ধে বলছি শোন, আমি তোমাকে বিশেষ করে লিও তলস্তয়ের 'আক্রমণ' গল্পটা আবার পড়তে অনুরোধ করছি, গল্পটা ছোট আর ঠিক নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখা।"

শুরা তার নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলল না, সে আগের থেকে অনেক সংযত ভাষায় আর বেশ ওজন করে কথা বলে। এবার তাকে দেখে আমার মনে হলো তার বেশ পরিবর্তন এসেছে, কী রকম পরিবর্তন সেটা বলা শক্ত। হয়ত আমার ভুল হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে একবার যুদ্ধে যোগ দিয়েছে,

জীবনমৃত্যুর মাঝখানে সংকীর্ণ পথে একবার যে হেঁটেছে, তার আর যুদ্ধ সম্বন্ধে বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না, যে বিপদ সে অতিক্রম করে এসেছে সে বিপদ নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। আমি বুঝতে পেরেছি শুরা অনেক দেখেছে, অনেক সহ্য করেছে, আর নিশ্চয়ই এজন্যই সে কিছুটা উদ্ধত, বুদ্ধিতে পরিণত-বয়স্ক আর আত্মগর্বিত হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে আরও ভদ্র আরও কোমল হয়েছে মনটা তার।

পরের দিন হাসপাতালে একটি আহত বন্ধুকে দেখতে গেল। ফিরে যখন এল তার মুখের চেহারাই বদলে গিয়েছে। আগের দিনের সে খুশিভরা পালোয়ান আর নেই, প্রিয় পরিচিত মুখটির দিকে উদ্বেগভরে তাকালাম—কী কচি মুখটি এখনও! সে মুখ এখন বিবর্ণ আর চিন্তাকুল। তার চোয়ালের হাড়গুলো, গাল, কোঁচকানো ভুরু, কপালের রেখা, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর হঠাৎ যেন আরও পরিষ্কার চোখে পড়ছে।

দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল—"ফ্যাসিস্তগুলো কী করেছে ওকে! জানো, সে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু! এক বছর বয়স হবার আগেই সে অনাথ হয়, বড়ো কষ্টেই সে মানুষ হয়, কিন্তু সে সত্যিকারের মানুষ হয়েছে। সামরিক শিক্ষা শেষ করে লেনিনগ্রাদ অবরোধের সময় যুদ্ধ করেছে, ডাক্তাররা তাকে অবসর নিতে উপদেশ দেন কিন্তু সে তা উপেক্ষা করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যায়। অল্প কিছুদিন হলো সে সবগুলো আঘাতই একসঙ্গে পায়- ফুস্‌ফুসে, হৃৎপিণ্ডের কাছে, বাহুতে, আর পাকস্থলীতে বোমার টুক্‌রো ঢুকে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, সে কথা বলতে পারে না, নড়তে পারে না, শুনতে পায় না,—কী ভয়ানক ব্যাপার! তার নাম কোলিয়া লোপাখো। সে আমাকে দেখে কী যে খুশি হলো তা যদি তুমি দেখতে!"

শুরা জানালার কাছে চলে গেল—আমার দিকে পিছন ফিরে কঠোর সুরে, দরদভরা গলায় বলতে লাগল, "আমি আমার কাজে ফিরে যাব। হাত না থাকুক, পা নাই থাকুক, চোখ অন্ধ হয়ে যাক্, তবু আমি বেঁচে থাকতে চাই—কী যে ইচ্ছা আমার বেঁচে থাকার জন্য।"

শুরা বাড়ি আসার তৃতীয় দিনেই বলল—"মাগো অপরাধ নিওনা, আমাকে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেতে হবে। এখানে থাকা আমার পক্ষে বড়ো কষ্টের যুদ্ধক্ষেত্রে কত লোক প্রাণ দিচ্ছে—আর এখানে আমি...আমি জানি অবশ্য যে, জীবন কেটে যায়, কিন্তু আমার পক্ষে বড়ো যন্ত্রণাদায়ক।"

"আর কদিন থাক সোনা আমার? তোমার তো বিশ্রাম দরকার...।"

"আমার বিশ্রাম তো মোটেই হচ্ছে না। এখনও আমি আমার বন্ধুদের...আর রণক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুর কথাই ভাবতে পারছি না। আর শোন মামণি, যদি পার তবে এবার তুমি আমাকে বিদায় দিতে এসো কেমন? যতক্ষণ সম্ভব আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।"

বেইলোরুশিয়া স্টেশনে আমি তাকে বিদায় দিলাম। নিস্তব্ধ সকাল, কুয়াশাচ্ছন্ন, রেললাইনের উপরে হরিতাভ আকাশে একটি তারা মিটমিট করে জ্বলছিল। আর এই নিস্তব্ধতা যখন আমি আমার ছেলের কাছে বিদায় নিচ্ছিলাম এত অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন তারা আমায় জানিয়ে দিচ্ছিল শীগগিরই সে বিপদ আর আগুনের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারাবে...

একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেনা হলো। শুরা বার্থে সুটকেশ রাখতে ভিতরে ঢুকল. সংগে সংগে আবার লাফিয়ে বা'র হয়ে এল।

"মা, একজন সেনাধ্যক্ষ ভিতরে"—শিশুর মতো বিমূঢ় আর হতভম্ব হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি ঠাট্টা করে বললাম—"চমৎকার যোদ্ধা! যাচ্ছ যুদ্ধক্ষেত্রে, এদিকে নিজেদের সেনাধ্যক্ষের ভয়েই অস্থির!"

শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি শুরার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। গাড়ি দুলে উঠল, আমি গাড়ির সংগে সংগে হাঁটতে লাগলাম, শুরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। তারপর আমি যখন আর পাল্লা দিতে পারলাম না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চাকার ঘর্ঘর শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দেয়, হাওয়ার ঝাপটা আমার পা'টাকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিচ্ছে, আমার চোখদুটি জলে ভেজা......তারপর হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম জনশূন্য। নিস্তব্ধ। কিন্তু তবুও মনে হলো সামনেই আমার ছেলের মুখ জ্বলজ্বল করছে, তার হাত বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছে।

অন্তরের অন্তস্তল থেকে

আর একবার আমি একলা পড়লাম। কিন্তু আগের মতো এবার আর এত কষ্ট হলো না, এত একা লাগত না, কাজের মধ্যে আমি সান্ত্বনা পেতাম। আপনারা যারা আমার সেই দুঃসময়ে চিঠিপত্র দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, আপনাদের দয়া জানিয়ে আমাকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করেছেন তাদের আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনাদের সকলেই যারা আমার কাছে এসে দৃঢ়ভাবে বারবার বলেছেন—"আমাদের কার-খানায় আসুন, আমাদের কমসোমল সভ্যদের আপনার কথা শোনান।"

আমি জানি মানুষের যখন ভারী খারাপ লাগে তখন কেবল একটা জিনিসই তাকে সাহায্য করতে পারে—সে হলো এই বিশ্বাস যে, তাকে অন্যের প্রয়োজন, সংসারে সে অপ্রয়োজনীয় নয়। যখন আমার দুর্ভাগ্য আমাকে পীড়িত করছিল, আপনারাই আমাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছেন আপনাদের দরকার আছে আমাকে, শুধু শুরাই নয়, আরও অনেক, অনেক অন্য লোকও এ বিশ্বাস আমার মনে জাগিয়েছেন। শুরা যখন চলে গেল, আপনারা আমাকে একা থাকতে দেন নি, আমার পক্ষে যতই বেদনাদায়ক হোক, 'আমি অপরিহার্য' এই বোধই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সর্বত্রই কাজের চাহিদা আছে, সদয় হৃদয় আর নিপুণ হাতদুটির প্রয়োজন আছে। অনেক ছেলেমেয়েকে বাপমায়ের কোলের আদর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এই যুদ্ধ। 'অনাথ' বলে যে কথাটার আমরা অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়, আজকের এই দুর্দিনে সে দুঃখের কথাও বারবার উচ্চারণ করতে হয়। আর সেইসব ছেলেমেয়েদের এমন কিছু দিতে হবে যাতে তারা পিতার অভাবটা না

বুঝতে পারে। বা একাকীত্বের বেদনা ভুলে যেতে পারে। তাদের প্রেম ভালো-বাসা কেবলমাত্র গৃহ বা পরিবারেই পাওয়া সম্ভব, তাও তাদের দিতে হবে।

আমি কাজ করতে আরম্ভ করলাম। যতগুলো সম্ভব শিশুনিকেতন তৈরি করতে হবে, সেগুলো সত্যি ভালো, আরামদায়ক আর সবরকমে সুবিধা হওয়া চাই। যতগুলো সম্ভব প্রকৃত শিক্ষাদাতা চাই, তাদের সত্যি কর্মক্ষম, আর দরদী হতে হবে! ছেলেমেয়েদের জুতো, জামাকাপড়, খাবার সবই চাই, তারও চেয়ে বেশি চাই দরদ, ভালোবাসা আর দয়া। সর্বত্র, কারখানায়, যৌথখামারে, শহরে, গ্রামে শিশুনিকেতন গড়ে উঠতে লাগল, প্রত্যেকেই যুদ্ধে নিহত দেশ-বাসীর সন্তানদের জন্য কিছু না কিছু করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আর আমার কাছে এর এত দাম যে আমি এই কাজে অংশ নিতে পেরেছিলাম।

সেসব দিনে আমাকে অনেক ভ্রমণ করতে হয়েছে। তামবোভ, রিয়াজান, কুর্স্ক, ইভানোভ্ পর্যন্ত গিয়েছি, সেখান থেকে বেইলোরুশিয়া উক্রাইন, আল-তাই, তোম্‌স্ক্,-নোভোসিবিরস্ক. সর্বত্রই কাজের অন্ত নেই, সর্বত্রই অনাথ শিশুর ছড়াছড়ি। তাদের জন্য হয় কোন শিশুনিকেতন, না হয় নতুন কোন পরিবারে আশ্রয় খুঁজে বা'র করতে হবে। আর সর্বত্রই বিশ্বাসভরা ভালোবাসা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করেছে। আমি শিখতে লাগলাম। আমার দেশবাসী আমাকে শেখাতে লাগল সাহস, আর সহিষ্ণুতা।

১৯৪৪ সালের শেষদিকে রেড্‌ক্রশ সোসাইটি আমাকে লেনিনগ্রাদ পাঠাল।

তরুণ ভাস্করের হাতে যেখানে ক্লডের আশ্চর্য অশ্বারোহী মূর্তিগুলি যত্নে গড়ে উঠেছিল, সেই সব স্তম্ভের পাদমূলে আজ ফুলের রাশি সাজানো, যাতে অভ্যস্ত চোখ, সেই মূর্তিগুলির অভাব টের পেয়ে দুঃখ না পায়। দেয়ালে ঝোলানো বিজ্ঞাপনগুলি এখনও পথিককে সাবধান করে দিচ্ছে, "স্থল-বাহিনীর বোমাবর্ষণের সময় এদিকটা আরও বিপজ্জনক।" কিন্তু লেনিনগ্রাদের অধিবাসীরা আরও বহু পূর্বেই গোটা দেশের সহায়তায় তাদের বাড়ি মেরামত করতে, আবার জানালার কাঁচ আঁটতে, রাস্তায় পীচ্ ঢালতে, সমান করতে শুরু করে দিয়েছে।

আমার সংগে একজন বয়স্ক মহিলা ছিলেন, তিনি এলেকট্রোসিনা কার-খানায় ঢালাইয়ের কাজ করেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন অবরোধের সময় তিনি আর তাঁর স্বামী কী করে পাশাপাশি তাদের কাজ করে গিয়েছেন। তাঁরা কাজ করেছেন শরীরের শেষ শক্তিটি ব্যয় করে, ক্ষুধার্ত থেকে, কেবলমাত্র ইচ্ছা-শক্তির জোরে, কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ করব না এই পণ নিয়ে. উপবাস ও সমস্ত দুর্বলতা উপেক্ষা করে তাঁরা কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। একদিন, পাশে ফিরে স্বামীকে দেখতে গিয়ে দেখলেন, তিনি মেঝেতে পড়ে গিয়েছেন, দেহে তাঁর প্রাণ নেই। তিনি মুহূর্তের জন্য তাঁর কাছে গেলেন, দাঁড়িয়ে দেখে আবার নিজের কাজে ফিরে এলেন। তিনি কাজ করে চললেন, আর তাঁর পাশে পড়ে রইলেন তাঁর স্বামী, জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত যে লোহা কুঁদবার যন্ত্রটি থেকে তিনি হাত সরান নি সেই যন্ত্রটির গোড়ায়। কাজ থামানো মানে, শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তিনি আত্মসমর্পণ করতে চান নি, তাই কাজ চালিয়ে তাঁকে যেতে হবেই।

লেনিনগ্রাদের একটি রাজমিস্ত্রীর কথা শুনেছি। অত্যন্ত দুঃসময়েও,

যখন নাকি সমস্ত শহর শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ তখনও সে বিজয়তোরণের নক্সা তৈরি করে চলেছে। যেসব মায়েদের সন্তান লেনিনগ্রাদের আত্মরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে, সেসব মেয়েরা অন্যের সন্তানকে উপবাস থেকে বাঁচাবার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করেছেন এমন কথাও আমি শুনেছি। এসব গল্প শুনতে শুনতে আমি নিজের মনে মনে ভাবলাম—"আমার নিজের দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করার তো কোন অধিকার নেই। এইসব লোক যাদের দুঃখ বিপদ আমারই মতো ভয়াবহ, যারা দারুণ দুঃসময়ের ভিতর দিয়ে এসে কাজ করে যাচ্ছে, বেঁচে আছে, আমারও তাদেরই মতো বেঁচে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে।"

আর আমি আর একটা জিনিস জানতাম--জয়াকে দেশবাসীরা ভালোবাসে। তারই নাম মুখে নিয়ে আমাদের ভাইবোনেরা, তার বন্ধুরা, যুদ্ধে গিয়েছে। কারখানায় কাজ করেছে, মাঠে কাজ করেছে। ক্রাসনোদনের একটি ছোট ছেলে ওলেগ কোশেভয়, বন্ধুদের কাছে জয়ার কথা বলেছে, সকলে মিলে তার কাজ তুলে নিয়েছে তাদের কাঁধে। ভাইবোনের মতো, বন্ধুর মতো, আমার প্রিয় মহান্ মাতৃভূমির সন্তানরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে!

জয়ার স্মৃতি অমলিন হয়ে বেঁচে আছে, সে কেবলমাত্র আমারই প্রিয় নয়, দেশবাসী তাকে মনে রেখেছে বীর হিসাবে, সাহসী হিসাবে, অনমনীয় হিসাবে।

আর তাই আমার বাঁচার সহায়তা করেছে।

চিঠিপত্র

যুদ্ধের প্রথমদিন থেকেই আমার ভাইপো স্লাভা লড়াই করছিল। সে প্রায়ই চিঠিপত্র লিখত আমাকে।

জয়ার সমাধিক্ষেত্রে দেখা হওয়ার পর থেকে পিওতর্ লিদভও চিঠি লিখতেন। প্রায়ই তিনি অভিনন্দন জানিয়ে কয়েক কথা লিখতেন, কিন্তু সেগুলো আমার বড়ো ভালো লাগত। খবরের কাগজ পড়ার সময় প্রায়ই খোঁজ করতাম লিদভ্-এর কোন লেখা বেরিয়েছে কিনা। তিনি খুব সহজভাবে, ঠাণ্ডামাথায়, সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতেন। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। এই সরলতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকত অমানুষিক শক্তি। আর যদি অনেকদিন ধরে তাঁর নামের কোন লেখা না থাকত প্রাভদায় তাহলে আমি চিন্তিত হয়ে পড়তাম। এমন চিন্তা হতো যেন তিনি আমার সন্তান বা ভাই।

প্রতি সপ্তাহে শুরার চিঠি আসত।

"আমরা প্রত্যেকেই বেশ আনন্দে আছি, বিশেষ করে গত আক্রমণটা চালানোর পর। সে যুদ্ধে আমাকে আটচল্লিশ ঘন্টারও বেশি সময় ট্যাঙ্কের উপর থাকতে হয়েছিল। আমাদের চারপাশের সবকিছু জ্বলছে, বোমা ফাটার আওয়াজে কান বধির হয়ে যাচ্ছে, ট্যাংকটা দেশলাইয়ের খোলের মতো ধাক্কা খাচ্ছিল, তার মধ্যে আমরা যে কি করে অক্ষত রইলাম সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমার জন্যে ভেবো না, মা।"

"...এবার আমি একজন নতুন সহকারী আর নতুন একটা 'কে, ভি' ট্যাংক পাব। তবে এটা হবে আমার তৃতীয় ট্যাঙ্ক। একটা যুদ্ধে নষ্ট হয়েছে, একটাতে আগুন ধরে গিয়েছে, আমারই তার থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় ছিল না প্রায়...! আমার পুরনো সহকারীদের মধ্যে দ্ঝিগারিস্ মারা গিয়েছে বাকিরা আহত হয়েছে...আমি দাদুর কাছে চিঠি লিখেছি. তুমিও লিখো, তিনি বুড়ো অসুস্থ আর নিঃসঙ্গ।"

"...আমি আহত হয়েছিলাম, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাই নি। ক্ষতগুলো বেঁধে আবার কাজে ফিরে যাই, এখন সব সেরে গিয়েছে। একটা ঘটনায় উচ্চ-পদস্থ অধিনায়ক আহত হয়েছেন। আমি নিজেই কর্তৃত্ব নিয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ চালাই, সকালবেলা ওরশা গ্রাম আমাদের হাতে আসে। আমাদের সব যোদ্ধা আর কর্মচারীরা সুস্থ, অক্ষত আছে...। দাদুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, তাঁর বড়ো দুঃসময় যাচ্ছে, তিনি সারাক্ষণ জয়া আর দিদার কথা ভাবেন। আমি তাঁর চিঠির জবাব দিয়েছি যতটুকু সম্ভব মিষ্টি করে।"

"স্থানীয় লোকেরা আমাদের দেখে খুব খুশি। তাদের সবকিছুতেই উৎসাহ, সবকিছুই তাদের কাছে নতুন মনে হয়। একটা কুটিরে আমি জয়ার সম্বন্ধে লেখা একখানা বই দেখিয়েছি, তারা আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে। বইটা তাদের কাছে রেখে যেতে বলেছে। আমার তো আর নেই, এই একখানাই মাত্র কপি, তাই তোমাকে বলছি, যদি পার তো ওদের একখানা পাঠিয়ে দিও—৬৯নং পেরেকোপস্কায়া স্ট্রীট, ওরশা।"

"...বেইলোরাশিয়াতে বহুপ্রতীক্ষিত মুক্তির দিন এসে পৌঁছেছে। লোকেরা আমাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে দুধ খেতে দিল। বৃদ্ধরা সজল চোখে যে কষ্ট তাদের সহ্য করতে হয়েছে তার বিবরণ দিল আমাদের কাছে। কিন্তু সে সবই তো অতীত। বাতাস যেন বিশেষ রকম ঝরঝরে, সূর্য বিশেষভাবে উজ্জ্বল। মামণি, শীগগিরই জয় হবে আমাদের।"

"...সার্জিমামাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। তাঁকে বোলো তিনি যা বলেছেন সবই আমার মনে আছে। দাদু কি তোমার কাছে চিঠি লিখছেন? কতদিন হয়ে গেল তাঁর কাছ থেকে কোন চিঠি পাই নি আমি।"

"...তুমি জানতে চেয়েছ আমার পদটা কী, আমি কী কাজ করি। একজন প্রধান অফিসারদের কথা উদ্ধৃত করে আমি তোমার কথার জবাব দিচ্ছি—'ও কোন পদের জন্য তৈরি হয় নি, হয়েছে যুদ্ধের জন্য'।"

"...অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। আমি সত্যিই—'অর্ডার অব দি পেট্রিওটিক ওয়ার', প্রথম শ্রেণীর, পুরস্কার পেয়েছি। এটা সোনার পদক। খবর পেয়েছি যে অর্ডার অব দি রেড ব্যানারও পেয়েছি আমি। তোমার কি মনে হয় আমি অনেক বদলে গিয়েছি! আমার চরিত্র ঠিক আগেরই মতো আছে, খালি গায়ে জোর বেড়েছে, মনে সাহস বেড়েছে।"

"...মাগো, পিওতর্ লিদভ নিহত হয়েছেন। চূড়ান্ত জয়ের এত অল্পদিন আগে তিনি মারা গেলেন, কী ভয়ানক, বিজয়মুহূর্তে মরে যাওয়া কী দুঃখের! পোলতাভা বিমানবন্দরে তিনি নিহত হন : কী করে আমাদের সৈন্যরা শত্রুর বিমানাক্রমণ প্রতিহত করেছে দেখবার জন্য তিনি আশ্রয়স্থল থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সে সম্বন্ধে লিখবেন মনে করে নিজের চোখে সব

দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃত যুদ্ধের সংবাদদাতা, তিনিই খাঁটি মানুষ...।"

"...আমরা পশ্চিমদিকে শত্রুর রাজ্যের দিকে এগোচ্ছি। গত পনরদিন ধরে আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করে যাচ্ছি বলে চিঠি লিখতে পারি নি। তোমার চিঠি পেয়ে আমি এত খুশি হয়েছি, চিঠিটা এসেছে আমার জন্মভূমি থেকে, আমার মায়ের কাছ থেকে।...আমি তোমার কাছে চিঠি লিখছি, বাতাসে ঘর্ঘর শব্দ, আমার ট্যাংকটা কাঁপছে, মাটি যেন বোমাবিস্ফোরণের শব্দে নেচে উঠছে। কয়েকমিনিটের মধ্যেই আমাদের ছেলেরা একেবারে জার্মান রাজত্বের ভিতরে আক্রমণ করতে যাবে।" (এই চিঠিটা কোনরকমে তাড়াতাড়ি অস্পষ্ট হস্তাক্ষরে পেন্সিল দিয়ে লেখা, শত্রুরাও তাড়াতাড়ি যুদ্ধে যাচ্ছে।)

"...হ্যালো মামণি, প্রায় একমাসের উপর হলো আমি ভীষণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত। শুধু যে চিঠি লেখার সময় পাই নি তাই নয়, যে-চিঠিগুলো পেয়েছি সেগুলো খোলার পর্যন্ত সময় হয় নি...। রাত্রে মার্চ করে যেতে আমরা বাধ্য হয়েছি। ট্যাংকযুদ্ধ, শত্রুর পশ্চাদভাগে উদ্বেগপূর্ণ বিনিদ্র রজনী, —জার্মান ট্যাংক থেকে আগুনে বোমার তীক্ষ্ন চিৎকারে খান খান হয়েছে রাত্রির প্রশান্তি...। আমার সঙ্গীদের মরতে দেখতে হয়েছে চোখের সামনে ; আমার পাশের ট্যাংকটা, তার সবকজন কর্মী, অফিসার সমেত, উড়ে গেল আকাশে, আমি শুধু নীরবে দাঁতে দাঁত পিষলাম। দারুণ পরিশ্রম আর অনিদ্রায় লোকেরা ট্যাংকগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে মাতালের মতো টলতে টলতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বেশ উৎফুল্ল আছি, ছুটির আনন্দে আছি। আমরা এখন শত্রুর রাজ্যে। আমরা ১৯৪১ সালের প্রতিশোধ নিচ্ছি। ফ্যাসিস্তরা যে দুঃখ দিয়েছে, চোখের জল বইয়েছে আমার দেশবাসীর, তার শোধ নিচ্ছি।"

"শীগগিরই তোমার আমার দেখা হবে মস্কোর পরিচিত পরিবেশে।"

"...আমি যুদ্ধ করছি না, আক্রমণ শুরু করার আদেশের অপেক্ষায় আছি। আমরা এখন আত্মরক্ষাত্মক প্রস্তুতি চালাচ্ছি, প্রত্যেকটি দিন বড়ো বিশ্রীরকম একঘেয়ে আর শান্ত। এই প্রতীক্ষা বেদনাদায়ক। আমরা জার্মানদের বাড়িতে বাস করছি। সর্বত্রই ধূসর রঙের বিধ্বস্ত বাড়ি, বোমার বিরাট বিরাট গর্ত-গুলোর ফলে পীচের বিষণ্ণ রাজপথগুলি এড়িয়ে যেতে হয়। বোমার আগুন জ্বলছে দিবারাত্রই, আমাদের বাড়িগুলি নড়ে ওঠে, দোলে। ফ্যাসিস্তরা মরিয়া হয়ে লড়ছে, প্রতিটি ইঞ্চি জমি তারা কামড়ে রয়েছে। এখন তারা নিজেদের গ্রামেই বোমা ফেলতে আরম্ভ করেছে...গত যুদ্ধে আমি সামান্য একটু আঘাত পেয়েছি, সেরে গিয়েছে এখন, আমার বুকে এখনও ব্যথা হয় মাঝে মাঝে..."

"...বৃষ্টি, বৃষ্টি। সমুদ্র ধূসর রঙ ধরেছে, ঠাণ্ডা পড়েছে, খারাপ আব-হাওয়া দেখা দিয়েছে। এখানে বড়ো মেঘলা আর ঠাণ্ডা। আমি বাড়ি যেতে চাই, শীগগিরই আসছি। তোমার শরীরের যত্ন নিও, স্বাস্থ্য ভালো রেখো। আরও শীগগির শীগগির চিঠি লিখো আমার জন্য ভেবো না—তোমায় চুমো দিচ্ছি মাগো...

তোমার একমাত্র ছেলে
আলেক্সান্দার"

এই চিঠিটার উপর ছাপ ছিল—"পূর্ব প্রুশিয়া"। তারিখ ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫।

পরের চিঠিটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম—সেটা এসে পৌঁছল না। ভাবতেও আমার ভয় করছিল, আমি শুধু প্রতীক্ষায় ছিলাম! সর্বনাশের জন্য আমার ভয় করছিল না—আমার ছেলে এত প্রাণবন্ত, জীবনের উপরে এত মমতা, এখনও আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছি, আত্মপ্রত্যয়ভরা সে কথাগুলো "আমি ফিরে আসব।"

বীরের মৃত্যু

২০শে এপ্রিল চিঠির বাক্সে একটা চিঠি পেলাম। খামের উপরে শুরার রণক্ষেত্রের পোস্টঅফিসের ছাপ, কিন্তু ঠিকানার হাতের লেখাটা তার নয়। অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, খুলতে ভয় করছিল আমার। তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে প্রথম লাইনটা পড়তেই ঘরটা আমার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে উঠল, গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে আমি আবার পড়তে আরম্ভ করলাম। আবার চিঠিটা অস্পষ্ট হয়ে গেল, এবার আমি শক্ত করে—দাঁতে দাঁত চেপে ধরে পড়তে আরম্ভ করলাম শেষ পর্যন্ত পড়লাম—

১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৫

প্রিয় লিউবোভ্ তিমোফিয়েভ্না—

"আপনার কাছে চিঠি লেখা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। কিন্তু আপনাকে সমস্ত শক্তি আর সাহস সঞ্চয় করতে অনুরোধ করছি। আপনার ছেলে সিনিয়র লেফটেন্যান্ট অব দি গার্ড—আলেক্সান্দার এনাতোলিয়েভিচ্ কসমোদেমিয়ানস্কি জার্মান আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে! মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সে তার তরুণ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

"আমি শুধুমাত্র একটি কথাই বলব। আপনার ছেলে বীর, আপনি তার জন্য গর্বিত হবেন। তার দেশরক্ষার কর্তব্য সে ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছে, প্রমাণ করেছে যে, সে তার বোনের উপযুক্ত ভাই।

"দেশের জন্য আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, আপনার ছেলেমেয়েদের—আপনি দিয়েছেন।

"৬ই এপ্রিল ক্যোনিংস্‌বার্গ-এর যুদ্ধে আলেক্সান্দার কসমোদেমিয়ানস্কির স্বয়ংচালিত কামানই সর্বপ্রথম ৩০ মিটার চওড়া একটি খালের ওপারে শত্রু-সৈন্যের উপর অগ্নিবর্ষণ করে, একটি পদাতিকবাহিনী ধ্বংস করে গোলা-বারুদের গুদাম উড়িয়ে দেয়—প্রায় ষাটজন হিট্‌লারপন্থী সৈন্য ও অফিসারকে নিহত করে।

"৮ই এপ্রিল সে-ই সর্বপ্রথম ক্যোনিগিন লুইসেন দুর্গে প্রবেশ করে ৩৫০ জনকে বন্দী করে, নয়টি অক্ষত ট্যাঙ্ক, ২০০ লরি আর একটি পেট্রলগুদাম দখল করে। যুদ্ধের সময় আলেক্সান্দার কসমোদেমিয়ানস্কি স্বয়ংচালিত কামানের অধিকর্তা থেকে কামানবাহিনীর অধিনায়কের পদে উন্নীত হয়। বয়সে সে তরুণ হলেও কামানবাহিনীকে সে কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করে যুদ্ধের সব কাজই সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন করে।

"গতকাল আমাদের অধিকৃত ক্যোনিংসবার্গের পশ্চিমে ফিয়ারব্রুদেনক্রুগ দখলের সংগ্রামে সে নিহত হয়। আপনার পুত্রই আরও কয়েকজনের সঙ্গে সর্বপ্রথম ফিয়ারব্রুদেনক্রুগ-এ প্রবেশ করে প্রায় চল্লিশটি হিটলারপন্থীকে নিশ্চিহ্ন করে, চারটি ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ধ্বংস করে। শত্রুর একটি বিস্ফোরক আমাদের প্রিয় সাথী আলেক্সান্দার এনাতোলিয়েভিচ্ কসমোদেমিয়ানস্কির জীবনকে অকালে শেষ করে দিল।

"যুদ্ধ আর মৃত্যু অবিচ্ছেদ্য. কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তের মৃত্যুকে মেনে নেওয়া বড়ো শক্ত।

"সাহস সঞ্চয় করুন, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে

লেগেজা গার্ডের লেফটেন্যান্ট কর্নেল"

৩০শে এপ্রিল আমি বিমানে ভিলিনিয়াস-এ উড়ে গেলাম. সেখান থেকে মোটরে ক্যোনিংসবার্গ। চারদিকের সবকিছুই ভগ্ন, পরিত্যক্ত। একটি গুদামও আস্ত নেই। আশেপাশে কোথাও কেউ নেই, কতগুলি জার্মান ইতস্তত চলা-ফেরা করছে, ঠেলাগাড়িতে করে ঘরকন্নার জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে. তাদের মাথা তুলতে বা আমাদের চোখের দিকে চাইতে সাহস হচ্ছে না...

এইবার আমরা স্রোতের মতো বয়ে আসা মুক্ত স্বাধীন আমাদের দেশবাসীর দেখা পেলাম। তারা এখন দেশে ফিরছে। তারা ঘোড়ায় চড়ে, লরিতে করে. পায়ে হেঁটে আসছে। সকলেরই কি হাসিখুশি মুখগুলো। সবকিছুতেই মনে হচ্ছিল বিজয় সমাগত, আর বেশি দেরি নেই. এই এল বলে।

কতবার যে শুরা জিজ্ঞেস করেছে—"মা তোমার কি মনে হয় বিজয়ের দিনটা কী রকম হবে? কখন আসবে সেদিন ; বোধহয় বসন্তকালে। নিশ্চয়ই বসন্তকালেই আসবে। আর যদিই বা শীতকালেই আসে, বরফ গলতে আরম্ভ করবে। ফুল ফুটতে শুরু করবে।"

এখন বিজয় আসছে, এই তো জয়ের মুহূর্ত, আনন্দের সময়, আর আমি বসে আছি আমার ছেলের কফিনের পাশে। ও শুয়ে আছে যেন জীবিত মুখটা পরিষ্কার প্রশান্ত। কখনও ভাবি নি যে এমনি করে ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে, মানুষের হৃদয় যতটুকু সহ্য করতে পারে তার চেয়েও অনেক বেশি...

শুরার মুখের উপর থেকে চোখ তুলতে আর একটি তরুণ মুখের উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। চেয়ে চেয়ে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় একে দেখেছি. চিন্তা করা—মনে করা বড়ো শক্ত হয়েছিল আমার—

তরুণ যুবক শান্তস্বরে বলল—"আমি ভলোদিয়া তিতভ।" সেই মুহূর্তেই আমার মনে পড়ল সেই এপ্রিলের সন্ধ্যা, যেদিন আমি বাড়ি ফিরে শুরাকে তার বন্ধুদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত দেখতে পাই। আর আবার আমি আমার ছেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"অধিনায়ক নিজে আমাদের সিগারেট দিয়েছেন।...আমরা উলিয়ানভ্ ট্যাঙ্ক বিদ্যালয়ে যাচ্ছি..."

আমি চেষ্টা করে উচ্চারণ করলাম—"বাকিরা কোথায়?" ভলোদিয়া বলল "য়ুরা ব্রাউদো আর ভলোদিয়া য়ুরিয়েভ দুজনেই মারা গিয়েছে, শুরার মতো বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে...কত তরুণ যে সেই উজ্জ্বল দিনটি দেখতে পেল না!"

ক্যোনিংসবার্গ-এ সে দুদিনের বর্ণনা আমি দিতে পারব না। কিন্তু

প্রত্যেকেই যে খুব ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে শুরার নাম উচ্চারণ করত সেকথা আমার বেশ মনে আছে।

শুনলাম..."সাহসী...বিনয়ী...আর কী চমৎকার বন্ধু! তরুণ, কিন্তু প্রকৃত নেতা...তাকে কোনদিন ভুলব না..."

আর তারপর—ফেরার পথ। শুরার কামানদলের সাশা ফেসিকভ আমার সঙ্গে এল। সে আমাকে এত যত্ন করল যেন আমি অসুস্থ। ছেলের মতো সে আমার যত্ন নিত—জিজ্ঞেস করার আগেই সে জানত আমি কী চাই।

পাঁচই মে, নোভোদেভিচি কবরখানায়, শুরার দেহ সমাহিত করা হলো। জয়ার সমাধির বিপরীতদিকে আর একটি স্তম্ভ খাড়া হয়ে উঠল—জীবনেও যেমন মরণেও তেমনি তারা রইল একসাথে।

ঘটনাটা ঘটে বিজয়ের চারদিন আগে।

নয়ই মে আমি আমার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বন্যার স্রোতের মতো মানুষের পথচলা দেখছিলাম। আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দ করছে, উৎসব করছে এক পরিবারের লোকের মতো। দিনটা এত উজ্জ্বল, এত আশ্চর্য।

আর কখনও আমার সন্তানরা নীল আকাশ দেখবে না। আর তারা বসন্তের ফুলকে অভিনন্দন জানাবে না। তারা অন্য ছেলেমেয়ের জন্য জীবন দিয়েছে, যারা এই বহুপ্রতীক্ষিত মুহূর্তটিতে বিজয়োৎসব করছে।

ওরা সুখী হবেই

আমি এখানে আসতে ভালোবাসি। এটা আমার ছেলেমেয়ের স্কুল—প্রিয় পুরনো সেই দালান দিয়ে আমি হাঁটি, স্কুলটা এখন জয়ার নামে পরিচিত। আমি ক্লাশঘরগুলো দেখি, চারতলায় যে দরজার উপরে লেখা আছে "সোভিয়েত-দেশের বীর সন্তান জয়া কসমোদেমিয়ানস্কায়া আর শুরা কসমোদেমিয়ানস্কি এই ঘরে পড়াশোনা করত"—সেইখানে এসে দাঁড়াই।

ঘরে প্রবেশ করে দেখি, দেয়ালে ঝোলানো ছবি থেকে জয়া আর শুরা আমার দিকে চেয়ে আছে। ঐ যে মাঝের সারিটায় দ্বিতীয় ডেস্ক—জয়া ঐখানে বসত! এখন আর একটি মেয়ে এখানে বসে, জয়ার মতো তারও চোখ দুটি স্বচ্ছ। আর ঐ যে তার পিছনের সারিতে ডেস্কটা, ঐখানে শুরা বসত। যে মেয়েটি এখন সেখানে বসে সে আমার দিকে তাকাল, একটি সাদা কলারওয়ালা বাদামী রঙ-এর কোট আর কাল বহির্বাস পরেছে। তার মুখখানি কি গভীর চিন্তান্বিত।

নীচের তলায় ছোটদের ঘরেও যাই। নীচু একটি ডেস্কের পাশে বসে ছোট একটি প্রথমশ্রেণীর শিশুর বইটা তুলে ধরি, বইটার মলাটে সোনালী ধানের শীষ, নীল আকাশ আর পাইন গাছের সারি, আমাদের শান্তিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলের প্রিয় ছবি একটি। ছবিখানা যেন গোটা বইয়ের বক্তব্যটা তুলে ধরল। প্রত্যেকটি পাতায় আমাদের শান্তিপূর্ণ শ্রম, আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের বন, আমাদের

নদীনালা, আমাদের দেশবাসীর স্তবমাত্র। আমাদের দেশ আবার কাঁধ সোজা করে দাঁড়িয়েছে, সৃষ্টি আর গঠনের উন্মাদনায় মেতেছে, বীজবপন করছে, ইস্পাত তৈরি করছে, ভস্মরাশির ভেতর থেকে শহর গ্রাম গড়ে তুলছে। আর আশ্চর্য সব মানুষ গড়ে তুলছে।

এই যে মেয়েটি আমার পাশে বসে আছে, আর তার সব বন্ধুরা, সোভিয়েত-ভূমির যত ছেলেমেয়েরা, তাদের আজ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, মানুষকে ভালোবাস, মাতৃভূমিকে ভালোবাস। মানুষের শ্রম আর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে শ্রদ্ধা করতে শিখছে এরা, পৃথিবীর মানুষ যত কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান্ জিনিস সৃষ্টি করেছে তাদের শ্রদ্ধা করতে শেখানো হচ্ছে এদের।

তাদের সুখী করতে হবে, তারা সুখী হবে।

এত রক্তপাত হয়েছে, এত আত্মত্যাগ হয়েছে এজন্যই যে তারা সুখী হবে, নতুন আর কোন যুদ্ধ এদের ভবিষ্যৎকে পঙ্গু করবে না।

হাঁ, অনেক পবিত্র সৎ তরুণ জীবন দিয়েছে, জয়া আর শুরা মারা গিয়েছে, ২০১নং স্কুলের আর একজন ছাত্র চমৎকার বৈমানিক ওলেগ বালাশভও বীরের মৃত্যু বরণ করেছে, আমাদের যে মাতে জালকার কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল সেই ভানিয়া নোসেনকভও মারা গিয়েছে। দারুণ তর্কবাগীশ পেতিয়া সিমোনোভ্‌ও মৃত। ভলোদিয়া য়ুরিয়েভ্ আর য়ুরা ব্রাউদো তাদের প্রাণ হারিয়েছে। লেখক আর্কাদি গাইদার যুদ্ধের প্রথমদিকেই নিহত হয়েছেন, বিজয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে প্রাভদার যুদ্ধ সাংবাদিক পিওতর লিদভকে মৃত্যু ডেকে নিয়েছে...এতসব প্রিয় প্রাণ, এত দুঃখ বরণ করা হয়েছে, তাদের কাজ, তাদের সাহস, তাদের মৃত্যু, রণক্ষেত্রে যারা প্রাণ দিয়েছে তারা বিজয় আর আনন্দের পথ রচনা করেছে।

জীবিত যারা তারা—কাজ কর, গড়, সৃষ্টি কর।

এই যে একটি তরুণী অমায়িক হাসিভরা মুখ নিয়ে দালান পার হয়ে আমার সংগে দেখা করতে আসছে সে যা করতে চেয়েছিল তাই সে এখন করছে—তার পুরনো স্কুলে যেখানে সে শুরা আর জয়ার সংগে পড়াশোনা করেছে সেখানে সে এখন শিক্ষিকা হয়েছে।

আমার ছেলেমেয়ের ক্লাশের বন্ধুরা কেউ এখন ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষাদাতা। যার জন্যে তাদের বন্ধুরা প্রাণ দিয়েছে—সে কাজ তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিচিত রাস্তা ধরে আমি এগিয়ে যাই, লাইব্রেরির দরজাটা খোলা। তাকের পর তাক, দেয়াল পর্যন্ত ঠাসা শুধু বই।

কাতিয়া বলল—"যুদ্ধের আগে আমাদের ছিল কুড়ি হাজার বই, এখন আছে চল্লিশ হাজার।"

বাইরে বেরিয়ে যাই, স্কুলটা এখন সবুজ গাছে ঘেরা। ঐ যে গাছগুলো—ছেলেমেয়েরা পুঁতেছিল—জয়ার গলা ভেসে এল—

"মনে রেখো মা, তৃতীয় গাছটা হলো আমার।"

বাফেলো স্টেডিয়াম

পারি, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস। বাফেলো স্টেডিয়াম, শান্তির সমর্থকদের সভা।

শান্তিকংগ্রেসে ফ্রান্সের প্রতিটি জায়গা থেকে "শান্তিবাহিনী" আসতে লাগল। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চড়ে, মোটরে করে, নৌকাযোগে নদী দিয়ে, মানুষ পারিতে আসতে লাগল শুধু এই কথা বলার জন্য আমরা শান্তিরক্ষা করব। আমরা যুদ্ধ চাই না। রবিবার, কংগ্রেস শেষ হবার কিছু আগে বিরাট এক জনতা বাফেলো স্টেডিয়াম-এর চারদিকে জড়ো হলো। উপরে ফুলের মেলার উপরে ছেড়ে দেওয়া হলো শান্তি পারাবত। শান্তি আর তৃপ্তির চিহ্ন।

শান্তিযোদ্ধাদের এই অসাধারণ প্যারেডের আশ্চর্য শক্তি। ফরাসী খনি-মজুর, মার্সাই-এর নাবিক, লিয়োর তাঁতী, উত্তর ফ্রান্সের কৃষক সবাই আছে এর মধ্যে। একটি বাহিনী গেল ফরাসী মায়েদের। হাতে তাদের বিরাট এক পোস্টার। তাতে লেখা—"ফরাসী মায়েরা তাদের ছেলেদের রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাবে না।"

যাঁদের ছেলেমেয়েরা ফ্যাসিস্ত জেলে মারা গিয়েছে—তাঁরাও এগিয়ে এলেন, তাঁদের হাতের কাগজে লেখা—"আমরা শান্তি চাই, আমরা বাঁচতে চাই।"

কে যেন উত্তেজিত হয়ে বলছে শুনলাম—"পৃথিবীতে সোভিয়েতভূমি আছে বলেই বেঁচে থাকা সম্ভব।"

আর একটি বাহিনীর কথা কোনদিন ভুলব না—প্রতিরোধ বাহিনীর সভ্যরা, হিটলারের ভয়াবহ মৃত্যু-শিবিরে এককালে বন্দী ছিল তারা। এই চমৎকার দিনটিতে বসন্তের আশ্চর্য ফুলের মধ্যে লাইলাক্, পিওনি আর গোলাপের সমারোহের মধ্যে তারা বন্দীর লম্বালম্বা দাগকাটা পোশাকে এসেছে—যে দিনগুলির কথা তাদের স্মৃতি থেকে কোনদিন মুছে যাবে না—সেই দিনের স্মৃতি বয়ে এনেছে এই পোশাকগুলি। যেন বলছে—"মনে রেখো, কী ঘটেছে! মনে রেখো ফ্যাসিবাদ মানুষকে কী লজ্জা, কী নীচতা, কী অসহ্য কষ্ট আর দুঃখের মধ্যে নিয়ে যায়। ফ্যাসিবাদ মানে যুদ্ধ, মনে রেখো কী ঘটেছিল, কী আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। আর যেন কখনো এটা ঘটতে দিও না।"

আবার আমি ভাবলাম—"আমাদের উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গিয়েছে, তা নিজেরাও মনে রাখব, অন্যদেরও মনে করিয়ে দিতে হবে।"

আর সেজন্যই, দুঃখকে পরাজিত করে আমি এই বই লিখতে চেষ্টা করেছি। যারা কবরে শুয়ে আছে তারা মৃত নয় ; যারা যুদ্ধের বিভীষিকা ভুলে গিয়েছে, যারা আবার একটা যুদ্ধ বাধাতে চায় তারাই মৃত। আমাদের ভুলে যাবার অধিকার নেই, আমাদের ভুলে যাবার সাহস নেই, মানবসমাজ যদি ফ্যাসিবাদের রক্তাক্ত নরকবহ্নি ভুলে না গিয়ে থাকে, তাহলে তারা আবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সে নরকের পথে পা বাড়াবে না। কিন্তু আমার দেশ নয়, আর কোন দেশ পৃথিবীতে সে কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে? আমার দেশবাসীর কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কার কণ্ঠস্বর পৃথিবীর প্রতিটি কোণে গভীর সুরে বাজে মানুষের হৃদয়ে?

যারা দৃঢ়ভাবে আমার করমর্দন করেছিল কংগ্রেসে দেখা সেইসব লোকের কথা আমার মনে আছে, যাদের চোখে আমি সহানুভূতির, হৃদয় আদানপ্রদানের ভাষা দেখেছিলাম তাদের আমি ভুলি নি। যে নিগ্রো মহিলাটি আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কাঁধ চাপড়ে বোঝাতে চেয়েছিল সেও আমার সমদুঃখের ভাগী তার কথাও আমি ভুলি নি। ভারতের যে মহিলা আমার কানের কাছে কেবল আস্তে আস্তে 'জয়া'...'জয়া'...বলেছিলেন তাঁর কথাও আমার মনে আছে, সেই কথাটির মধ্যে কেবল আমার দুঃখের প্রতি সমবেদনাই ছিল না, আমার দেশবাসীর মনোভাবের উপর শ্রদ্ধাও ছিল তার সঙ্গে।

মানবসমাজকে নীচতা, লজ্জা, দাসত্ব থেকে বাঁচাবার জন্য সোভিয়েতভূমি তার সোনামাত্র ঢালে নি, দিয়েছে তার শোণিত। তার সন্তানদের রক্ত আর জীবন —এই সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার, বাঁচবার অধিকার উদ্ধার করে দিয়েছে মানবসমাজকে।

আর এখন, আগের মতো যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, মুক্তিপ্রিয় সবই এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আমাদের মাতৃভূমির সঙ্গে, স্তালিন নামের সঙ্গে বাঁধা।

আমি জানি লক্ষ লক্ষ সাহসী আর সম্মানিত হৃদয় হলো মহান্ অপরাজেয় শক্তি। এর কাছে তুচ্ছ হলো ভাড়াটে বন্য পশুদের শক্তি, যা সারা পৃথিবীকে নতুন ভয়াবহ যুদ্ধের হুমকি দেখাচ্ছে।

মায়েদের আহ্বানে, সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির আহ্বানে পয়লা জুলাইকে আন্তর্জাতিক শিশু-দিবস হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। সর্বত্র সাধারণ মানুষ লড়ে যাচ্ছে শান্তির জন্য। সুখ ও আনন্দের জন্য, তাদের সন্তানদের সুখী জীবনের জন্য। ছেলেমেয়েদের রক্ষায়, শান্তিরক্ষায় পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠস্বর আরও জোরে ধ্বনিত হোক্।

হাঁ, আমাদের সভামঞ্চের উপর থেকে যে সব প্রতিনিধিরা এত চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁদের কথায় গভীর মহান্ সত্য আছে, আজকের দিনে প্রতিটি নরনারীকে প্রশ্ন করতে হবে—"শান্তির জন্য আমি কী করেছি", আর যদি প্রত্যেকেই সত্যি শান্তি চান্, যদি সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একত্রিত হন—আমরা শান্তির প্রহরায় নিযুক্ত থাকব, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য সুখের ভিত্তি দৃঢ় করব, মানবজাতির সুখের বনিয়াদ দৃঢ়তর হবে।